স্বর্গ-মর্ত্ত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

দাম সাড়ে চার টাকা

শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক ডি-এম, লাইব্রেরী ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকতা ৬ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীসুকুমার চৌধুরী—বাণী-শ্রী প্রেস, ৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত। আশু বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রচ্ছদপট চিত্রিত। ভারত ফটো টাইপ ষ্টুডিও কর্তৃক ব্লক প্রস্তুত ও মুদ্রিত।

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত

অনুজপ্রতিমেষু.

স্বর্গ-মর্ত্ত

এক

বেলপুরে গোপাল ঠাকুরের আখড়ায় জন্মাষ্টমীতে খুব সমারোহ।

গোপাল ঠাকুর—নাড়ুগোপাল মূর্ত্তি। আখড়ার সেবায়েৎ ব্রজদা

যেমন ঠাকুরটি সুন্দর—তেমনি শ্রীমতী সেবায়েৎটি। ব

পঁয়তাল্লিশ হইয়াছে, পনেরো ষোল বৎসরের একটি সন্তা

—তবু তাহার শান্ত স্নিগ্ধ শ্রীতে মালিন্যের ছাপ স্পর্শ করে নাই

মনে হয় তিরিশ বৎসরের একটি যুবতী মেয়ে লালপেড়ে অথ

পাড়ওয়ালা কাপড় পরিলে লক্ষ্মী ঠাকুরুণটির মত মনে হইত; গ্রা

বলে এ-কথা।—ব্রজদাসী তাহাতে লজ্জা পায়। বলে-

বন না। আমাকে শুনতে নাই। আমি বষ্টুমী।

পড় পরিয়া কপালে তিলক নাকে রসকলি কাটিয়া ব্রজদা

ব ঘেরা আখড়াটিতে ঘুরিয়া বেড়ায় আখড়াটি যেন

ক। তেমনি চমৎকার মানুষ। গোপালজীর সে

আছে।

শুধু ছেলে দুলালকে লইয়া।

মা—তাহার এমন ছেলে! লোকে আড়ালে বিস্ময় প্রকা

বিস্ময়ের কথাই বটে; সব দিক দিয়াই মায়ের সঙ্গে ছেলে

মিল দেখা যায় না।

সুন্দর মায়ের শ্রী, এমনি ছোটখাটো গড়নের মা—তাহা

হারা যেমন কর্কশ তেমনি কালো, আকারেও তেমনি স্থূল এ

পনের ষোল বছরের ছেলেটাকে বিশ বছরের, জোয়ান, বলিয়

রুক্ষ হয়। স্বভাবে মা এমনি স্নিগ্ধ এমন ভালো মানুষ—আর দুলাল এমন রূঢ়—এমন দুর্দ্দান্ত এমন উদ্দাম যে মা ও ছেলেকে একসঙ্গে দেখিবামাত্র লোকের মুখে-চোখে সবিস্ময় প্রশ্ন জাগিয়া উঠে কপালে সারি সারি জিজ্ঞাসার রেখা দেখা দেয়—ভাবে এই মায়ের এই ছেলে? পরমুহূর্ত্তেই আপন মনেই তাহারা হাসে—তাহাদের মনই উত্তর দেয়—অদৃষ্ট! গোটা গ্রামের লোকে তাহাকে ভয় করে আড়ালে কেহ বলে—দানো, কেহ কেহ বলে—কালাপাহাড়!

কালাপাহাড়ই তাহাতে সন্দেহ নাই। নহিলে বষ্টুমের ছেলে এমন সুন্দর আখড়ায় মানুষ হইয়া মোটর বাসের ড্রাইভারি শিখিতে যায়।

ব্রজদাসী সবই জানে সবই তাহার কানে আসে কিন্তু সে চুপ করিয়া থাকে। কি বলিবে সে? তাহার নিজের অন্তরেই যে এ দুঃখ জমিয়া জমিয়া পাহাড় হইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে আপনই আক্ষেপ করিয়া অতি মধুর মৃদুস্বরে গুণ গুণ করিয়া মাথুর পদাবলীর একটা কলি গাহিয়া নিজেকে বোধ হয় সান্ত্বনা দেয় সৃষ্টির রহস্যতত্ত্ব স্মরণ করিয়া মনে মনে ম্লান হাসি হাসে—'সুখের ভাই!' কখনও গায় সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু—, তারপর হঠাৎ উঠিয়া চুপ করিয়া যায়। মনে মনে বলে—হে গোপাল গোবিন্দ —ক্ষমা কর প্রভু! আমায় এ ঘর দুঃখে ভরিয়া দিয়াছ—আর যেন আগুনে পুড়াইয়া দিও না। একবার ঘর পুড়িয়াছে—আর না।

জন্মাষ্টমীর আগের রাত্রে ভোর বেলা ব্রজদাসী গোবিন্দ স্মরণ ভুলিয়া এই সবই ভাবিতেছিল। তাহার অদৃষ্ট আর হতভাগা দুলালের--।

হঠাৎ একটা অমানুষিক ক্রুদ্ধ চীৎকারে ভোর রাত্রির নিথর স্তব্ধতা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

আখড়ার ঘন বৃক্ষপল্লবের মধ্যে কয়টা পাখী পাখা ঝটপট করিয়া

উঠিল সেই শব্দে ; ব্রজদাসীর ঘরের চাল হইতে একটা টকাটাক সন্ত্রস্ত চকিত হইয়া মাটিতে ঝপ করিয়া পড়িয়া গেল। ব্রজদাসী চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল—দুলাল !

আখড়ার ঠিক নিচে ডাহুকী নদীর নালাটায় সাঁতার জল ; সেখানে একটা প্রচণ্ড আলোড়নের শব্দ উঠিতেছে। ওই ছোট নালাটার মধ্যে যেন সমুদ্র মন্থন চলিতেছে। ঘরের কোণে হারিকেন আলোটা দুলাল জ্বালিয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে ; ব্রজদাসী লণ্ঠনটা তুলিয়া দম বাড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।—দুলাল !

নালাটায় নামিবার জন্য আখড়ার একটি ছোট বাঁধানো ঘাট আছে ঘাটের মাথায় গিয়া ব্রজ দাঁড়াইল। কিছুই দেখা যায় না, জলটা উথল-পাতাল চলিতেছে। হঠাৎ জলের উপর মাথা তুলিয়া দুলাল আলোর ছটা দেখিয়াই বোধ করি চীৎকার করিয়া বলিল—ছোরা ছোরাটা আন মা। জলদি।

—দুলাল—

—আঃ। ছোরা, আমার ছোরাটা জলদি। কুমীর। ধর্মো বেটাকে আমি কায়দা ক'রে।

দুলাল ঘাটে আসিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঁধে কুমীর কামড়াইয়া আছে। দুলাল তাহাকে চিৎ করিয়া বগলে চাপিয়া ধরিয়াছে। ছোট মেছো কুমীর। কিন্তু তবুও কুমীর। ব্রজ কাঁপিতে কাঁপিতেই ছুটিয়া গিয়া দুলালের ছোরাটা আনিয়া ঘাটে নামিয়া গেল। দুলাল তখন সেটাকে মাটিতে চিৎ করিয়া ফেলিয়া হাঁটু ও হাত দিয়া টিপিয়া ধরিয়া আছে ; সরীসৃপগুলো চিৎ হইয়া পড়িলেই শক্তিহীন হইয়া পড়ে, লেজটা দিয়া আছাড় মারিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে।

দুলাল হাত বাড়াইয়া বলিল—দে।

ছোরাটা লইয়া সরীসৃপটার গলার নিচে বসাইয়া দিয়া লম্বা করিয়া পেটের দিকে টানিয়া দিয়া দুলাল লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া—আ—প্ বলিয়া আবার একবার হাঁক মারিয়া উঠিল। মাথাটা ঝাঁকড়িল লম্বা চুলগুলা ছোট ছোট জটার মত ঝাপট খাইয়া দুলিয়া উঠিল। কাঁধের ক্ষতস্থান হইতে গাঢ় লালরক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে।

ব্রজর হাত-পা যেন অবশ হইয়া গিয়াছে।

দুলাল ব্রজর হাত হইতে লণ্ঠনটা লইয়া তুলিয়া ধরিয়া কি যেন দেখিল তাহার পর বলিল—ঠিক আছে। ওই গিয়ে লেগেছে বাঁকের মাথায়।

একটা বাঁকের বাঁশের দুইপ্রান্তে সরু দড়িতে গাঁথা গোটা বিশেক পাকা তাল। জন্মাষ্টমীর দিন আখড়ায় উৎসব। এ আখড়ার শ্রেষ্ঠ উৎসব। দুলাল রাত দুপুরে উঠিয়া তাল কুড়াইতে গিয়াছিল। ফিরিবার পথে এই বিপদ। সাধের বিপদ।

লোকেও বলিল—ব্রজদাসীও অস্বীকার করিতে পারিল না। নিজেকেও ব্রজদাসী ধিক্কার দিল। কেন সে দুলালকে তালের জন্য তিরস্কার করিয়াছিল। আগের দিন ভোরবেলা দুলাল মটরবাসের কাছে বাহির হইবার জন্য সাজিতেছিল—সেই সময়টিতে ব্রজ স্নান সারিয়া দাওয় উঠিয়া বলিয়াছিল—আচ্ছা দুলাল, আমার কি সব পণ্ডশ্রম হ'লরে, আমার জীবনের সব ঘিটাই আগুন মনে করে কি ভস্মে ঢাললাম রে!

ভ্রূ কুঁচকাইয়া দুলাল বলিল—কেন? কি হ'ল কি?

—কাল না জন্মাষ্টমী? তোকে না বলেছিলাম—দুলাল বারোটা মাস তিরিশ দিন যা করিস বাবা বৈষ্ণবের ছেলে হয়ে জন্মাষ্টমীর সময় দুটো দিন ওসব লোহালক্কড় ঘাঁটতে যাস না। কত লোক আসবেন ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ভক্ত মহান্ত সন্ন্যাসী আসবেন এখানে, তার উদ্যোগ আছে আয়োজন আছে—

—বাজে বকিস না বাপু। উদ্যুগ তো গোটাকত তাল আর তেল ময়দা চালগুঁড়ো। তেল ময়দা দোকানে মিলবে—তালও চাইলে লোকে দেবে, চাল গুঁড়ো করে নে। ব্যাস—ভারি জন্মাষ্টমী—তাতে আবার কাজ কামাই!

—দুলাল! কি বলছিস? জিভে তোর আটকাচ্ছে না?

—না।

—ওরে হতভাগা, ওরে পাষণ্ড, ওরে নাস্তিক! আমি মরলে যে তোকেই এসব করতে হবে রে!

—না। ও সব আমি করব না। কুড়োজালি নিয়ে—বাঘা ছাপ কেটে-ও আমার দ্বারা হবে না।

—মরে যা। মরে যা। তুই মরে যা।

—তুই মরে যা। তুই মরে যা। তুই মরে যা। আমি মরব কেন?

—তাই মরব।

—হ্যাঁ—তাই মরে থাকিস। আমি ফিরে এসে রাতে তোকে সামাজ দেব—দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে বেরিয়ে যাব। নিশ্চিন্দি।

—চলে যাবি? আমার গোপালের কি হবে?

—হবে—ওই মাটির ডেলা নাড়ু হাতে ধরে যেমন আছে—তেমনি ধরে থাকবেন আর মহান্তর অভাব হবে না। জমি আছে আখড়া আছে—গাঁয়ের লোকে ভোগ দেয় ভক্তি করে—কত জনা ছুটে আসবে।

সে আর কথা না বলিয়া কাঁধে হাল ফেশানী ঝোলাটা ঝুলাইয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। ঝোলাটার মধ্যে দুলালের হরেক রকম জিনিষ থাকে। ঝোলাটায় হাত দিতে দুলালের নিষেধ আছে। সে বলে তোর ভাঁড়ারে আমি তো হাত দিই না, আমার ভাঁড়ারে তুই হাত দিবি কেন? হাত দিতে যাস না—বলে দিলাম।

—কি বললি? দুলালের মুখের দিকে ব্রজদাসী একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, সে দৃষ্টি বাহ্যত প্রশান্ত স্থির—কিন্তু অতল জল দহের মত গভীর; দুলাল না হইয়া অন্য কেহ হইলে দৃষ্টির সে গভীরতা অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিত। দুলাল শিহরিয়া উঠে না—সে বলে—এমন ক'রে তাকিয়ে থেকে কি হবে বল?

ব্রজদাসী নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায় দেবপূজার কাজে। থাক, জানিয়া তাহার কাজ নাই, জানিতে সে চায় না. কখনও জানিতে চাহিবে না। মধ্যে মধ্যে সে ক্ষোভের হাসি হাসে; তোর টাকা কড়ি যাহা আছে তোরই থাক, সে ব্রজদাসী চায় না! গোপালের অনুগ্রহে তাহার অভাব কিছুর নাই!

সে দিন সন্ধ্যায় দুলালের ফিরিবার কোন লক্ষণ না দেখিয়া ব্রজ খানিকটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। রাত্রি প্রথম প্রহর পার হইলেই—দুলালের কর্কশ কণ্ঠের গানের সাড়া মাঠ হইতে ভাসিয়া আসে। প্রায় পোয়াখানেক দূরে মোটা কর্কশ গলায় দুলাল গান গাহিলে ব্রজ আখড়ায় বসিয়া শুনিয়া উনান ধরাইয়া ভাতের জল বসাইয়া দেয়। দুলাল বাড়ী ফিরিয়া ওই নালার ঘাটে বসিয়া সাবান মাখিয়া স্নান করে—আধঘণ্টা ধরিয়া লম্বা চুলগুলি আঁচড়ায়, তারপর মায়ের হাতের তৈয়ারী খাঁটি ঘি মাখিয়া গরম ভাত খায় আর বলে—এইটি পৃথিবীতে আর কেউ করবে না, এই গরম ভাত আর ঘি—আঃ এ যেন অমৃতি!

ব্রজদাসী বলে আমার কর্ম্মফল আর তোর কপাল, বুঝলি! নইলে ঘরে যার মাখনচোরা ননীগোপাল—তার ঘরের ছেলে হয়ে তুই এক কড়ি ঘি ভাত খেয়ে বলছিস—অমৃতি। তোর যদি সুমতি হ'ত—তবে গোপালের প্রসাদ ছানা ক্ষীর-মাখন—এ যে তুই দু'বেলা খেতিস বাবা!

থাক্ সে সব কথা।

ব্রজদাসী দুলালের গানের সাড়া না পাইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সময় পার হইয়া গেল, ব্রজ আসিয়া আখড়া ঢুকিবার পথের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ কৃষ্ণা সপ্তমী, চৌদ্দদণ্ড পরে চাঁদ উঠিবে। এই দণ্ড দুয়েক আগে প্রথম প্রহরের শেয়াল ডাকিয়াছে, পেঁচাগুলা চেঁচাইয়া একপাক উড়িয়া গাছ বদল করিয়াছে, এখন রাত্রি সাড়ে আটদণ্ড কি নয় দণ্ড হইবে; চারিদিকে এখন গাঢ় অন্ধকার; তাহার উপর আকাশে মেঘ করিয়া রহিয়াছে! দুয়ারে দাঁড়াইয়া ব্রজ নিরুপায় হইয়া অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মনে মনে আপসোষ করিতেছিল—মহেশমণ্ডলকে কেন বলিল না! আখড়ায় সন্ধ্যায় গ্রামের প্রবীণেরা আসে অল্পবয়সীও আসে; আখড়ায় নাম গান হয়; প্রথমে হয় নাম সংকীর্ত্তন, তারপর গ্রামের প্রধান ব্যক্তি এই আখড়ার সব চেয়ে বড় ভক্ত বড় সহায় মহেশ মণ্ডল খোল লইয়া বসিয়া বলে আজ মা-জী একখানি নয় দুখানি পদ গাইতে হবে।

ব্রজদাসী বোষ্টুমীর যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি পদাবলী সঙ্গীতে পারদর্শিতা। বড় বৈষ্ণব ভক্তের কাছে তাহার গান শিখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

মহেশ মণ্ডল খোল বাজায়, ব্রজদাসী পদাবলী গায়।

এই কিছুক্ষণ আগে—দণ্ড তিনেক আগে মজলিস ভাঙিয়াছে—তাহারা উঠিয়া গিয়াছে; মণ্ডল তাহার পরেও কিছুক্ষণ ছিল। জন্মাষ্টমীর আয়োজনের কথা বলিয়া সমস্ত কিছুর ভার লইয়া বাড়ী গিয়াছে।

মণ্ডল একবার জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল—দুলাল ফিরবে কখন?

—পহর পার হবে—আর ফিরবে। গানে সাড়া উঠলে বলে। ষাঁড়ের মত চেঁচাতে চেঁচাতে আসবে। ব্রজ হাসিয়াছিল। সম্ভবত বেদনার হাসি

মহেশ মণ্ডলও একটু লজ্জিত হইয়া হাসিল।

ব্রজ বলিয়াছিল—আপনি মিথ্যে লজ্জা পাচ্ছেন মোড়ল। আমার অদৃষ্ট

মহেশ বলিয়াছিল—আমি বুঝিয়ে বলব ওকে একদিন।

—না। দৃঢ় কণ্ঠে ব্রজ জবাব দিয়াছিল।

মহেশ মণ্ডল আর ও কথাই তুলিল না, জন্মাষ্টমীর কথায় ফিরিয়া আরও দুই চারিটা কথা বলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

আঃ—ব্রজ যদি তখন মণ্ডলকে বলিত সে আসুক—একটু বসুন আপনি! তাহা হইলে আর এমন উৎকণ্ঠার বোঝা বুকে লইয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত না।

ঠিক এমনি সময়ে একটা বোঝা মাথায় করিয়া দুলাল ফিরিয়াছিল।

ঘি-তেল-ময়দা-চালগুঁড়া দোকান হইতে কিনিয়া মাথায় করিয়া লইয়া আসিয়াছে। সমস্ত লইয়া ওজন পনের বিশ সের হইবে। ষোল বছরের দুলাল দুই তিন ক্রোশ পথ এই বোঝা বহিয়া আনিয়াছে। মানগোবিন্দপুরের বাজার এখান হইতে পাকা দুই ক্রোশ পথ।

বোঝাটা নামাইয়া দুলাল বলিয়াছিল—এই নে। তোর গোপাল কত খাবে খাক। এক ঘুমের পর উঠে ওই চাঁদ রায়ের দীঘির পাড়ের তাল এক বোঝা কুড়িয়ে এনে দোব।

ব্রজ খুসী হইয়াছিল।

দুলাল তাহার উপার্জ্জন করিয়া গোপালের ভোগের জন্য এত সামগ্রী কিনিয়া আনিয়াছে—ইহাতে তাহার আনন্দ হৃদয় ছাপাইয়া উপছাইয়া পড়িতেছিল। ইচ্ছা করিতেছিল সকলকে ডাকিয়া দেখায়। মহেশ মণ্ডল মহাশয়কে ডাকিয়া দেখাইবার ইচ্ছা যেন কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সম্বরণ করিতেই হইল।—দুলাল

বলিল—ঘাড়টা একটু টিপে দে—ত মা। ওঃ—অভ্যেস নাই, বুইতে গিয়ে দম বেরিয়ে গিয়েছে।

চাঁদ রায়ের বাঁধের তাল এ অঞ্চলে বিখ্যাত। কিন্তু গ্রামের বাহিরে মাঠের মধ্যে চাঁদ রায়ের বাঁধে রাত্রে কেহ তাল কুড়াইতে যায় না। ওখানে যাইতে হইলে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে এই ভরা নালাটা পার হইতে হয়, তাহার উপর চাঁদ রায়ের বাঁধের দক্ষিণ পাড়ের জঙ্গলটার নামই হইল বাঘতলার জঙ্গল; গত একশত বৎসরের মধ্যে দুই-দুইবার এ অঞ্চলে বাঘ আসিয়াছিল এবং দুইবারই ওই একই জায়গায় বাসা গাড়িয়াছিল। বাঘ অবশ্য রোজ আসে না এবং আসিলে মানুষের অজানা থাকে না, ডাক দিয়া সে জানাইয়া দেয়, গরু ছাগল মারিবার সময় দেখাও দেয়; রাত্রে ফেউ ডাকে, বাঘের গায়ের বোট্‌কা গন্ধ বেশ খানিকটা দূর হইতেই পাওয়া যায়; তবুও গ্রাম্য মানুষেরা বলে—"সাবধানের বিনাশ নাই। কাজ কি গিয়ে রাত্রিকালে? মনে কর, সনদে পর্য্যন্ত বাঘ আসে নাই, কিন্তু সনদের পর যে আসবে না তা কে বললে? এই তো আট কোশ তফাতে গঙ্গা আর ময়ূরাক্ষী মিশেছে, সেখানে ঝাউবনে বাঘের তো বার মাসের বাসা; বর্ষার সময় ঝাউবন জলে ডুবলে এ দিকে ওদিক ছটকে বেরোয়। সনদে পর বেরিয়ে আট কোশ রাস্তা আসতে কতক্ষণ ওদের কাছে? এক লাফে কমসে কম দশ হাত তো মারবেই!"

বাঘের পর সাপের ভয়ও আছে। কিন্তু রাঢ়ের এ অঞ্চলটায় মানুষ সাপকে ভয় করে না; প্রাচীন কাল হইতেই মানুষ এবং সাপে প্রায় এক সঙ্গেই বাস করিয়া আসিতেছে। গ্রামে যেমন কুকুর বিড়াল থাকে গৃহস্থের আঙিনায় ঘুরিয়া বেড়ায়, সাপও ঠিক তেমনি। ভয় করে না—কিন্তু তা বলিয়া রাত্রে বন-জঙ্গল মাঠের মধ্যে লোকে সাধ করিয়া যায় না।

চাঁদ রায়ের বাঁধের বিখ্যাত তালগাছটা তালের চারিটা আঁটী; প্রকাণ্ড বড়—যেমন তার মিষ্টতা—তেমনি প্রচুর মাড়ি—অর্থাৎ রস। ভোর না হইতেই চারি পাশের পাঁচ ছয় খানা গ্রামের ছেলেরা ছুটিয়া আসে। এবং প্রতিদিনই ছোট হোক বড় হোক—একটা মারামারি কাণ্ড ঘটিয়া থাকে। সেই কারণে দুলাল তৃতীয় প্রহর রাত্রে উঠিয়া চাঁদ রায়ের বাঁধে তাল কুড়াইতে গিয়াছিল। ব্রজদাসী তাহাকে বার বার বারণ করিয়াছিল—এই দেখ, চাঁদ রায়ের বাঁধে যেন যাবি না।

দুলালের মধুমাখা বাক্য! সে তাহার মোটা নাকটা তুলিয়া দাঁতগুলা বাহির করিয়া অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলিয়াছিল—আচ্ছা!

—আচ্ছা নয়, মনে থাকে যেন!

উত্তরে আর একবার আগের মত মুখভঙ্গি করিয়া টর্চ এবং বাঁকটা লইয়া সেই মধ্যরাত্রে গোটা গাঁয়ের লোকের ঘুম ভাঙাইয়া মোটা গলায় গান গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল! যেমন দুলাল—তেমনি তাহার গান; কি যে ঐ গানের অর্থ ব্রজদাসী তাহা বুঝিতে পারে না। শুধু আতঙ্কিত হইয়া শরীর মন শিহরিয়া উঠে। দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া একটা কলি নিস্তব্ধ রাত্রিকে আলোড়িত করিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল, একটা কলি গাহিতে গাহিতেই দুলাল চলিতেছিল—

আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা!

শুনিয়া ক্লান্ত হইয়া ব্রজ হাসিয়াছিল—আগুন জ্বালাইয়া ব্রজদাসীকে পুড়াইয়া খাক করিলি—আর কেন? আরও আগুন জ্বালাইতে সাধ? কাহাকে পোড়াইবি হতভাগা? নিজেই পুড়িয়া মরিবি। থাক—আর থাক, আর আগুনে কাজ নাই। তার পর বিছানায় শুইয়া ভাবিতেছিল দুলালকে লইয়া তাহার দুর্ভোগের কথা। হঠাৎ চীৎকার উঠিল, একটা

অমানুষিক ক্রুদ্ধ চীৎকার। ব্রজ মুহূর্ত্তে উঠিয়া বসিল। চীৎকার করিয়া উঠিল—দুলাল!

* * * * *

লণ্ঠনের আলোয় দুলালের দিকে আতঙ্ক এবং বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে চাহিয়া দেখিতেছিল। রক্তাক্ত দেহ দৈত্যের মত দুলাল দাঁড়াইয়া আছে। নিজের ক্ষতের দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই—পেট চেরা কুমীরটার মৃত্যু-আক্ষেপ দেখিয়া হি-হি করিয়া হাসিতেছে। ছোট একটা মেছো কুমীর! কিন্তু ছোট হইলেও কুমীর! তাহার শক্ত মোটা কাঁটা ভরা লেজটা আছড়াইয়া ঘাটের বাঁধানো ঠাঁই টুকুকে যেন চুরমার করিয়া দিবে। গলা হইতে লেজের গোড়া পর্য্যন্ত পেটটা চিরিয়া দিয়াছে দুলাল। রক্তে ঘাটটা লাল হইয়া গিয়াছে কতক্ষণ পরে ব্রজদাসীর মনের সাড় ফিরিয়া আসিল। সে আসিয়া দুলালের হাত ধরিয়া বলিল—দেখি-দেখি!

—কি?

—তোর কাঁধ বেয়ে যে রক্ত গড়াচ্ছে, পিঠটা যে ভেসে যাচ্ছে।

তাচ্ছিল্যভরে দুলাল বলিল—বেটা আমাকে কাতলা মাছ মনে করেছিল। শা—লা বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! বেটার ময়ূরাক্ষীতে পেট ভরে নি, 'ডাউকিতে' এসেছিল, সেখানে সুবিধে হয় নি, এসেছ—এই 'বাউকি'তে—তাও দুলালের ঘাটে! হুঁ—হুঁ বাবা হামারা নাম বিরিঞ্চ নন্দন—ডাণ্ডা চলে মেরা দনাদন্—দনাদন্! খচ্ করে কামড়ে ধরলে বেটা। ওপারে যেই জলে পড়েছি—অমনি বেটা কোথা ছিল—শুঁসিয়ে এসে ধরলে কাঁধে। ছামনে পড়েছিল—তাই, পিছন থেকে পায়ে ধরলে কায়দা করত আমাকে!

—উঠে আয়।

—দাঁড়া। এ বেটাকে নিয়ে যাব। বেটার চামড়া ছাড়িয়ে নিতে হবে—

—দুলাল—ওসব অনাচার করিস না। রাত পোয়ালে জন্মাষ্টমী, গোপালের সেবার আখড়া—

—আচ্ছা—আচ্ছা। বাইরে রেখে দোব। সকালে দুই গাঁয়ের বাইরে নিয়ে গিয়ে—যা করবার করব।

সে দুই হাতে কুমীরটাকে ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িল।

ব্রজদাসী শঙ্কিত হইয়া প্রায় চীৎকার করিয়া ডাকিল—কি হ'ল? দুলাল?

দুলাল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল কিছু না। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতখানা বাড়াইয়া দিয়া বলিল—ধর দিকিনি!

কোন মতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বেটা বেশ জখম করেছে। খুব রক্ত পড়েছে নয়? চল উপরে চল! আখড়ায় উঠিয়া আসিয়া দাওয়ার উপরেই সে শুইয়া পড়িল।

ব্রজদাসী শুকনা কাপড় আনিতে ঘরের ভিতর গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল—দুলাল!

দুলাল সাড়া দিল না।

—দুলাল! ব্রজদাসী তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিল।

দুলাল তখন জ্ঞান হারাইয়াছে।

দুই

রাঢ়ের উত্তরাঞ্চল। ময়ূরাক্ষীর একটি শাখানদী নাম ডাহুকী; ডাহুকীর ক্রোশখানেক উত্তরে একখানি চাষীর গ্রাম। গ্রামের মধ্য দিয়া ডাহুকীর চেয়েও ছোট একটি প্রবাহিনী বহিয়া গিয়া পড়িয়াছে ডাহুকীতে। ওটার নাম 'বহুকী' লোকে বলে বউকী। বউকীর একেবারে কূলের উপর আখড়াটি।

পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—কালই বলবান। কালের গ্রাসে সবই বিলুপ্ত হইয়া যায়। যদুপতির সে সমৃদ্ধ মথুরাপুরীও নাই, রঘুপতি রামচন্দ্রের সে অযোধ্যাও আজ মাটির তলায়, মাটির সঙ্গেই মিশাইয়া গিয়াছে।

মানগোবিন্দপুরের বৈষ্ণব সাধক নরোত্তম দাস বাবাজী [illegible] [illegible]িয়া বলেন—আছে বাবা আছে। মথুরাপুরীও আছে ব্রজধামও আছে, অযোধ্যাও আছে। বাইরে নাই ভিতরে আছে। মানুষের মনের পৃথিবীতে আছে বাবা। আমি তো বাবা যখন ব্রজদাসীর এই ধামটিতে ঢুকি—আমার মনে হয় নন্দমহারাজের পুরীতে এসে ঢুকলাম।

একটু হাসিয়া বলেন—মনে হয় নন্দমহারাজ বুঝি কোথাও গিয়েছেন—হয়তো নবলক্ষ গোধনের গো-শালা তদারক করছেন—কি-বিচুলি কাটাচ্ছেন—যশোমতী একা পুরীর মধ্যে গোপালের ভাবনায় ভোর হয়ে বসে আছেন।

ব্রজদাসী মানুষ জনের সম্মুখে লজ্জা পায়। তাহার সুন্দর মুখখানি রাঙা হইয়া উঠে। কেহ থাকিলে সে হাত জোড় করিয়া বলে—প্রভু[illegible]

বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় আমাকে বলে দেন। আমি বুঝতে পারছি —আমি ডুবছি—

—না ব্রজদাসী তুমি উঠছ।

—না। আমার পরকাল গিয়েছে বাবাজী। ইহকালও যেতে বসেছে। আমাকে আপনি মুক্তির পথ দেখিয়ে দেন। দুলাল আমার কাল—সকল কাল খেয়ে আমাকে অকূল পাথারে ডুবিয়ে দিলে।

জন্মাষ্টমীর দিন নরোত্তম বাবাজীর কাছে এই আবেদন জানাইতে গিয়া সে কাঁদিয়া আকুল হইয়া গেল। বলিল—এই দেখুন! এই দেখুন! এ আমি কি করব বলুন।

দুলাল যন্ত্রণায় এবং জ্বরে বেহুঁস হইয়া পড়িয়াছিল।

—তাই তো ব্রজ; জ্বরে যন্ত্রণায় এযে বেহুঁস। জন্তু জানোয়ারের দাঁতে নখে বিষ আছে। ডাক্তার ডেকে দেখানো উচিত মনে হচ্ছে। আমি [illegible] বলি—সে ডাক্তার ডাকুক, [illegible]পুরের সুধীর ডাক্তারকেই খবর দিক। আর—

ব্রজ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নরোত্তম দাস বাবাজীর মুখের দিকে চাহিল।

বাবাজী বলিলেন—জন্মাষ্টমীর আয়োজন আমরাই পাঁচজনে করে নিচ্ছি। তোমার মন আজ চঞ্চল হয়ে রয়েছে—তুমি দুলালের কাছেই বসে থাক। ওর কাছে একজন কারুর থাকা দরকার। কাজ করবার লোকের তো অভাব নেই।

তা নাই।

জন্মাষ্টমী পর্ব্বে গোবর্দ্ধনপুরের এই গোপালের আখড়ায় সমারোহ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাধু মহান্ত অনেকে আসিয়া থাকেন। বিংশশতাব্দীর এই আমলেও এই অঞ্চলটিতে প্রাচীন

কালো জীবন সঙ্গীত জাগিয়া উঠে খোল করতালের ধ্বনিতে-নাম সংকীর্ত্তনের সুরের মধ্যে। বারো বৎসর এই গোপালের আখড়ার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, বারো বৎসরের প্রতি জন্মাষ্টমীতেই উৎসব হইয়া আসিতেছে। ইহার আগে জন্মাষ্টমীর উৎসব হইত মানগোবিন্দপুরে নরোত্তম দাস বাবাজীর আখড়ায়। নরোত্তমদাস বাবাজীই গোবর্দ্ধনপুরের আখড়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহেশ মণ্ডল বাবাজীর শিষ্য—সেই আখড়ার ঘর দুয়ার করিয়া দিয়াছে—কিছু জমিও দিয়াছে। আখড়ার প্রতিষ্ঠা করিয়া গোপালের সেবা পরিচালনা করিবার জন্য ব্রজদাসীকে আনিয়া আখড়ার সকল ভার অর্পণ করিয়াছেন। ব্রজদাসীই জোড়হাত করিয়া বাবাজীকে [illegible] প্র[illegible]—[illegible] তো নন্দপুরের উৎসব, বংশীবটেরও নয়, কদম্বতলেরও নয়, রাধামাধবের কুঞ্জগৃহেরও নয়, মথুরাপুরের তো নয়ই। আপনার এ আখড়া তো তাই। বংশীধারীর শ্রীমতীকে বামে নিয়ে অধিষ্ঠান এখানে। এখানে মা যশোদা গোপালকে কোলে নিয়ে বসবেন কোনখানে—কোন্ মুখে? শ্যামের কি আমার লজ্জা হবে না?

নরোত্তম দাস বাবাজীর সাধক জীবন বিচিত্র। তিনি জন্ম বৈষ্ণব নন। বৈদ্য ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম;—শিক্ষায় দীক্ষায় প্রথম বয়সে উগ্র আধুনিক, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, হঠাৎ স্ত্রী-বিয়োগের পর তিনি সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া মানগোবিন্দপুরে এক আখড়া করিয়া সেইখানে বৈষ্ণব সাধনায় বসিয়া গিয়াছেন। তিনি এখানে আসিয়া বসিবার পর হইতেই এ অঞ্চলের বৈষ্ণব পর্ব্ব পার্ব্বণগুলি বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। অঞ্চলটাই অবশ্য বৈষ্ণবভাবের দেশ। অজয়ের কূল ধরিয়া পশ্চিমে জয়দেব কেঁদুলী হইতে গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গম স্থল পর্য্যন্ত অঞ্চলটি অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ। আকাশের

চাঁদকে লজ্জা দিয়া নবদ্বীপে শচীমায়ের কোলে গৌরতনু শিশুর আবির্ভাব যেদিন হয়—সে দিনও মানুষ বুঝিতে পারে নাই এই শিশুর পদরেখা ধরিয়া নূতন ভাব ভাগীরথী উদ্ভূত হইয়া গোটা দেশটা ভাসাইয়া দিবে। কিন্তু অজয়ের কূলের এই অঞ্চলের সাধক কবি তাহার বহুকাল পূর্ব্বে ধ্যান কল্পনায় এ প্লাবন যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—দেখিয়াছিলেন মাটিতে চাঁদ নামিয়া আসিল—জ্যোৎস্নায় পৃথিবী সত্য সত্যই ভাসিয়া গেল। শনুরের সাধক কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছিলেন—'আজ কে গো মুরলী বাজায়—এত কভু নহে শ্যামরায়।' শুধু তাই নয় বৈষ্ণবভাবের নব অভ্যুত্থানের পর এখানে মহাজন ভক্ত দলে দলে যেন মিছিল করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। অজয়ের দশকোশের মধ্যে ময়ূরাক্ষী। ময়ূরাক্ষীর উত্তরে একচক্রা মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জন্মস্থান। কাছাকাছি বীরচন্দ্র-পুরকে লোকে বলে গুপ্ত বৃন্দাবন। এ অঞ্চলে প্রতি পাঁচখানি গ্রামে একটি করিয়া বৈষ্ণবের আখড়া। মাটির দেওয়াল, খড়ের চালে ছাওয়ানো আখড়া; যদুপতির পাথরে গড়া বিরাট রাজপ্রাসাদ নয়—যে, কাল ভাঙিয়া দিলে আর গড়া যায় না, সে ভাঙা পাথরের স্তূপই সরানো অসম্ভব হইয়া উঠে। মাটির আখড়া কাল ভাঙে—জলে গলিয়া পড়ে, ইঁদুরে গোড়ায় গর্ত্ত কাটিয়া তলাটা ফোঁপরা করিয়া দেয় তখন একদিন বসিয়া পড়ে, ভূমিকম্পে ফাটে—ভাঙে, মানুষ ওই ভাঙা দেওয়ালেই জল ঢালিয়া কাদা করিয়া আবার দেওয়াল দেয়, লোকের কাছে ভিক্ষা করিয়া খড় বাঁশ মাথায় করিয়া আনে, দেওয়ালের উপর চাল তুলিয়া যত্নে নিজের হাতে রাঙা মাটি দিয়া নিকাইয়া, আল্পনা আঁকিয়া মনোমন্দিরের অধীশ্বরকে হাত জোড় করিয়া বলে—আমার মনোমন্দিরে অধিষ্ঠিত হও। নরোত্তম দাস বলেন—তাই তো বলি বাবা, মথুরাপুরীর ইট-কাঠ-পাথর ভেঙেছে কাল, মাটি চাপা দিয়েছে, আসল মথুরা

শ্রীমন্দির, তেমনি আছে। কালের সঙ্গে কালাচাঁদের খেলা চলে বাবা!

জন্মাষ্টমীর উৎসব লইয়া ব্রজদাসীর কথা শুনিয়া তিনি একটু হাসি বলিয়াছিলেন—তাই হবে। যশোমতী যেখানে গোপালকে নি গরবিনীর মত বসে থাকেন—সেই পুরীতেই হবে জন্মাষ্টমীর পালন।

তিনি একটু হাসিয়াছিলেন! অর্থপূর্ণ হাসি। ব্রজদাসী লজ্জিত হই মাথার ঘোমটা ঈষৎ টানিয়া দিয়াছিল; বলিয়াছিল—ও কথা বল আমি লজ্জা পাই প্রভু।

—না। ঘাড় নাড়িয়া বাবাজী বলিয়াছিলেন—আনন্দ যখন হৃ ছাপিয়ে পড়ে ব্রজদাসী—তখন এমনি-এক একটা মধুর ভাবের রূপ নি বাইরে প্রকাশ পায়। কখনও লজ্জা-কখনও বিনয়—কখনও কিছু। তু ব্রজদুলালের মা যশোদা—তোমার গোপালের আখড়াতেই তো জন্মাষ্টমী সত্য ক্ষেত্র;—তাই হবে।

তখন হইতে এই বারো বৎসর ধরিয়া এই আখড়াতেই জন্মাষ্টমী সমারোহ হইয়া আসিতেছে। বৈষ্ণব মহান্তেরা আসেন—সারাদি থাকেন—সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চলিয়া যান—আপন আপন আখড়ায় পার্ব্ব পালনের জন্য। দুপুরে ব্রজদাসী কীর্ত্তন গায়। এ সজ্জন সমাগমে প্রধান আকর্ষণ ব্রজদাসীর গান।

* * * *

নরোত্তমদাস বাবাজী বলিলেন—তুমি দুলালের শিয়রে ব থাক? কাজ করবার লোকের অভাব হবে না।

ব্রজদাসী বসিয়াই ছিল। দুলাল কাতরাইতেছে।

ভাদ্রমাস, পল্লীগ্রামে বলে পচা ভাদর, এ সময়ে যত মাছি—ত মশা। ভন ভন করিয়া মাছি উড়িয়া বেড়াইতেছে। দুলালের গা

বসিয়া তাহাকে আরও অস্থির করিয়া তুলিতেছে। ব্রজদাসী উঠিয়া গিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। অন্ধকার ঘরে বসিয়া থাকিতে তাহার কান্না পাইল। দুলাল যদি না-বাঁচে!

মাথায় কলঙ্কের পসরা তুলিয়া লইয়া দুলালকে সে কোলে পাইয়াছে। ষোল বৎসর পূর্ব্বের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল।

অপরূপ একটি সুখ নীড়।

হঠাৎ সে নীড় তাহার ভাঙিয়া গেল। তাহার বৈষ্ণব তাহাকে পরিত্যাগ করিল। তখন তাহার বয়স আটাশ। কৈশোরে যৌবনে—যে রূপ তাহার ছিল সে রূপে তখন মালিন্য পড়িয়াছে। এই অপরাধে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন বৈষ্ণবী যুবতী ঘরে আনিয়া তুলিল। লজ্জায়-অভিমানে—ধিক্কারে—ক্ষোভে সেও ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

কোথায় বাহির হইয়াছিল—তাহার কোন স্থিরতা ছিল না। পথে বাহির হইয়া চলিয়াছিল। পথের পর পথ পিছনে ফেলিয়া চলিয়াছিল। গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। গান ছিল মূলধন। গান শুনিয়া লোকে কাঁদিত, তাহাকে ছাড়িতে চাহিত না, বলিত—আর একখানা গাও। ব্রজদাসী না বলিত না, আবার গান ধরিত, গান শেষ করিয়া বলিত—এইবার আসি।

গৃহস্থের গৃহিণী-বধূ-কন্যা সকলে সমস্বরে সস্নেহে নিমন্ত্রণ জানাইত—আবার এসো যেন।

ব্রজদাসী হাত জোড় করিয়া বলিত—আসব, ফেরবার সময় আসব মা।

—কবে? কবে ফিরবে?

—কালও ফিরতে পারি আবার দেরীও হতে পারে।

—বেই ফের, এসো যেন।

—আসব বৈ কি। আপনাদের দোরই যে আমাদের ভাণ্ডার মা।

গ্রাম হইতে বাহির হইয়া মাঠ পার হইয়া গ্রামান্তরে প্রবেশ মুখে এদেশের ছায়াঘন পুষ্করিণীর ঘাটে নামিয়া মুখ হাত ধুইয়া বিশ্রাম করিত দুপুর হইলে কাঠ কুটা কুড়াইয়া ইট বা মাটির ঢেলা দিয়া উনান পাতিয়া ছোট পিতলের বক্‌নো চড়াইয়া দিত। ঝুলিতেই থাকিত ভাণ্ডার। ন্যাকড়ার খুঁটে বাঁধা নুন, কয়েকটা লঙ্কা, শিশিতে তেল ভিক্ষার চাল, দুইটা আলু একটা বেগুন। রান্না চড়াইয়া সে ভাবিত অদৃষ্টের কথা। অতীত কালের কথা স্মরণ করিত—চোখ দিয়া জল গড়াইত। গুণ গুণ করিয়া আপন মনেই গান ধরিত—

সখি বলিতে বিদরে হিয়া

আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙিনা দিয়া!

রাত্রে সজ্জন গৃহস্থ বাড়ীতে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া রাত্রি কাটাইয়া আবার প্রভাতে যাত্রা সুরু করিত। পথে হাট বাজার পড়িলে সেইখানেই আসন পাতিয়া বসিয়া গাইত। চারিপাশে ভিড় জমিত। নানা জনে নানা কথা বলিত। কুৎসিত ইঙ্গিত, অশ্লীল মন্তব্য! কিন্তু সে মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গান ধরিত—

কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন

এ দুটি নয়ন তারা।

গাহিতে গাহিতে সে গানের মধ্যেই নিজেকে ডুবাইয়া দিত।

গঞ্জে গুরুজন বলে কুবচন

সে মোর চন্দন চুয়া

শ্যাম অনুরাগে অঙ্গ বেচিয়াছি

তিল তুলসী দিয়া।

গানের মহিমায় মানুষগুলির মনের উচ্ছৃঙ্খলতা, কুৎসিৎ লালসা আপনিই শান্ত হইয়া আসিত। ভাবান্তর ঘটিত। মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যাহারা কুৎসিৎ ইঙ্গিত করিয়াছিল তাহারাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত, যাহারা অশ্লীল মন্তব্য করিয়াছিল—তাহারাই বলিত—আহা-হা। ভণিতায় আসিয়া মহাজনের নাম উচ্চারণ করিয়া সে যখন কপালে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম জানাইত—তখন তাহারাও তাহার সঙ্গে প্রণাম জানাইত।

কোন কোন শ্রোতা তারিফ করিয়া বাহবা দিত বাঃ—বাঃ! চমৎকার!

মধুর হাসিয়া সে নমস্কার জানাইয়া বলিত—আপনাদের দয়া প্রভু!

রসিক জনে ইহার পরও বলিত—বাঃ—বষ্টুমীর গান যেমন মিষ্টি, হাসিও তেমন মিষ্টি!

সে আরও একটু মিষ্টি হাসিয়া মাথার থান কাপড়ের অবগুণ্ঠন আরও খানিকটা বাড়াইয়া দিয়া বলিত—বৈষ্ণবীর ওই তো সম্বল প্রভু!

বিদায় লইয়া হাসিতে হাসিতে আবার সে পথ চলিত।

হঠাৎ একদিন এক গাছতলায় বসিয়া তাহার কান্না পাইল। এমন করিয়া সে আর কত ঘুরিবে? এমন করিয়া কি ঘোরা যায়? ঘরে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া মনের ক্ষোভে সে পথে বাহির হইয়াছিল—কিন্তু সে পথও যে আর সহ্য হইতেছে না! মনের ক্ষোভ যেন জুড়াইয়া আসিয়াছে। তবে?

কোথায় যাইবে সে?

দিনে বিশ্রামের ক্ষণে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া ভাবিত, রাত্রে অন্ধকারে চোখ চাহিয়া সে ভাবিত—কোথায়—কোথায় যাইবে সে?

অকস্মাৎ একদিন যেন সে ডাক শুনিল; হঠাৎ তাহার মনে হইল—সে

বৃন্দাবন যাইবে! মনে মনে নিজেকেই বলিল—হায় রে পোড়া কপাল আমার! কোথায় যাইব এ কথা না কি ভাবিতে হয়!

জয় রাধা গোবিন্দ! বলিয়া সে সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে সময়টা ছিল—মধ্য রাত্রি! বেশ মনে আছে! গৃহস্থ বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল। ইচ্ছা হইয়াছিল সেই মুহূর্ত্তেই পথে বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা পারে নাই। গৃহস্থ বাড়ী—গৃহস্থ দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইতেছে, সে দরজা খুলিয়া যাইবে কি করিয়া? চোর বদমাসের কথা দূরে থাক—দরজা খোলা পাইয়া কুকুর বিড়াল ঢুকিলে অনিষ্ট হইবে—সে অপরাধের দায় যে পড়িবে তাহার উপর! সমস্ত রাত্রিটা বসিয়া কত কল্পনা করিয়াছিল।

পদব্রজেই সে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবে!

দেবতার চরণে গিয়া গড়াইয়া পড়িবে। জয় রাধা গোবিন্দ! নিজেকে সে বিসর্জ্জন দিবে। গুণগুণ করিয়া গাহিয়াছিল—

কি আর বলিব আমি!
তোমার চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি।

কথা মনে করিতে করিতে হাসি পাইল ব্রজদাসীর! উপহাসের হাসি! নিজেকেই উপহাস করিল সে! যেমন তাহার সংকল্প তেমনি তাহার কপাল! পায়ে হাঁটিয়াই যাত্রা সুরু করিয়াছিল। কি সে তাহার উৎসাহ! সকল দুঃখই যেন সে ভুলিয়া গিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে অবশ্য ভাঙা ঘরের জন্য ক্ষোভ জাগিত। কেন জাগিত কেমন করিয়া জাগিত সেদিন বুঝিতে পারিত না—আজ পারে। মনের পাপ! মনে পড়ে—একদিন এক গৃহস্থ বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। অপরূপ সুখের সংসার। কর্ত্তা গিন্নী ছেলে বউ নাতিতে

জমজমাট, হাসি কান্না রসিকতা তামাসা ঝগড়ায় বাড়ীটা অহরহ যেন সুখে কল্ কল্ করিতেছে। হাসিতে তো সুখ থাকেই, রসিকতা তামাসাও সুখেরই. কথা—কান্না ঝগড়াও এ বাড়ীতে সুখের। মায়ে ছেলেতে, স্বামী স্ত্রীতে ছলনার কলহ, ছোট শিশুগুলিকে ধমক দিয়া কাঁদানো দেখিয়া সুখে আনন্দে তাহারও অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মনে আছে—ছেলের মুখখানি দুইহাতে নিজের মুখের সামনে ধরিয়া মা-কে ধমক দিতে দেখিয়াছিল—এ—রে ছে—লেঃ! এঃ—!

শিশুটি ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে মা হাসিয়া সারা হইয়া গোটা বাড়ীর সকলকে ডাকিয়া দেখাইয়াছিল—দেখ গো—আমার ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না দেখ!

ঠিক এই সময়টিতেই গিন্নী উপর হইতে চীৎকার করিতে করিতে নামিয়া আসিতেছিলেন—না—না—না! এ বাড়ীতে আমি জন্মগ্রহণ করব, বাবুর করব না।

পিছনে পিছনে ছেলে আসিতেছিল—সমান চীৎকার করিয়া সে বলিতেছে—জল খাবে না?

—না।

—খাবে না?

—না। না—না—না।

—আচ্ছা। আমার দোষ নাই তা' হলে।

—বড় খোকা! খবরদার।

—কিছুতেই না। আমি কোন কথা শুনব না।

—না। ভালো হবে না। বড় খোকা!

—তোমার ও চোখ রাঙানিকে আর আমি ভয় করি না। বলিয়াই মাকে ছোট মেয়ের মত কোলে তুলিয়া লইল।—গোটা পাড়ায়

তোমাকে ঘুরিয়ে আনব আমি, চীৎকার ক'রে বলব—"খুকী আমার রাগ করেছে—জল খাবে না গো! পথে ব'সে মাখবে ধূলো ঘর যাবে না গো!"

মা হাসিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিল—ওরে দুষমণ—ওরে দুষ্টু—ছাড়্ ছাড়্। নামিয়ে দে; নামিয়ে দে! পড়ে যাব! মাথা ঘুরচে আমার!

ছেলে মায়ের কথা না মানিয়া পাক কয়েক বন বন করিয়া ঘুরিয়া লইয়াছিল—আনি-মানি জানি না, পরের ছেলে মানি না!

নামাইয়া দিতেই মা ছোট্ট মেয়ের মত হাসিয়া সারা!

সেদিন রাত্রে তাহাদের দাওয়ায় শুইয়াছিল, সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই। সারা রাত্রি নিজের দুঃখের কথাগুলি আপনি জাগিয়া উঠিয়াছিল, খাতকের ঘরে মহাজনের মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ডাকিতে হয় নাই, তাড়াইয়া দিতেও পারে নাই।

পরদিন সকালে বিদায় লইবার সময় বধূটি বলিয়াছিল—কাল থেকে যাও!

—না-মা!

—কেন? কাল কি কষ্ট পেয়েছ? অসুবিধে হয়েছে?

—কষ্ট? অসুবিধে? আমার? হাসিয়া ব্রজদাসী বলিয়াছিল—পৃথিবী যার অন্ধকার মা—তার আবার কষ্ট! না—কষ্ট নয়। কিন্তু অন্ধকারে আর থাকতে পারছি না।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া একমুহূর্ত্ত পরে আবার বলিয়াছিল,—অকারণে বলিয়াছিল নিজের দুঃখের কথা—না বলিয়া যেন স্বস্তি পায় নাই, বলিয়াছিল,—চাঁদে গ্রহণ লাগে, রাহু এসে চাঁদকে গেলে, চাঁদ আবার মুক্ত হয়, কিন্তু যার কপালে চাঁদ নিজেই হয়ে যায় রাহু—তার কি আকাশ পানে তাকিয়ে থাকলে চলে? তাকে তখন খুঁজতে হয়—কোথায় কোন্ জগতে আছে নতুন চাঁদ। আমি তাই চলেছি।

কথায় বাধা দিয়া এবার গৃহিণী নথ নাড়িয়া বলিয়াছিলেন—কিছু মনে করো না বষ্টুমী, তোমার মুখের হাসি দেখে মনে হচ্ছে মা—চাঁদকে তুমিই গিলে খেয়েছ—তোমার ঠোঁটের হাসিতে যেন প্রতিপদের চাঁদ উঁকি মারছে! সকলে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণবী লজ্জা পাইয়াছিল। তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তবু সে দমে নাই। উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই দিয়াছিল। বলিয়াছিল—ও মা তোমার চোখের ভুল। চাঁদের হাটে তুমি বাস কর মা—কর্ত্তা চাঁদ, ছেলে চাঁদ, নাতি চাঁদ—তোমার কপালে চাঁদ—কোলে চাঁদ—আশে চাঁদ—পাশে চাঁদ; আমার ঠোঁটের হাসিতে যদি চাঁদের ফালিই দেখতে পেয়ে থাক মা—তবে সে চাঁদ নয়—তোমার চাঁদের ছটা বেজেছে সেখানে।

আমার প্রভু তোমার চাঁদের হাট অক্ষয় করুন মা, তোমার চাঁদের হাটের ছটা আমার হাসিতে ফুটে উঠেছে—সে আমার মহাভাগ্য মা। ওরই আলোতে পথ দেখে আমি চলে যাব—সেই চাঁদের চরণ তলে—যে চাঁদে গ্রহণ লাগে না, যে চাঁদের ক্ষয় বৃদ্ধি নেই। কপালে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল—আমার শ্যামচাঁদ—বৃন্দাবনের অক্ষয় পূর্ণিমার চাঁদ!

স্বামী পুত্র নাতি বধূ কন্যা লইয়া ভরা সংসার তুলিয়া কথা—রহস্যচ্ছলে বলিলেও বাংলা দেশের মেয়েদের সহ্য হয় না। কথাটা বলিয়া ব্রজ পর মুহূর্ত্তেই শিহরিয়া উঠিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গেই সে খঞ্জনীতে ধ্বনি তুলিয়া বলিয়াছিল—যাবার সময় গান গেয়ে যাই মা শোন!

"ও কাল কালিন্দী কূলে—ও কেলি কদম্ব মূলে—
ও সই—! এ কি অপরূপ কাল শশী!"

গান শেষ করিয়া—মার্জ্জনা চাহিয়া—ভিক্ষা লইয়া সে উঠিয়া পড়িয়াছিল। পাছে আরও কথা বাড়ে তাই বলিয়াছিল—যেতে যে হবে অনেক দূর মা!, তার ওপর সময় নষ্ট করা বারণও বটে।

—কোথায় যাবে? কত দূর?

—কত, তা জানি না। তবে অনেক দূর। যাব বৃন্দাবন।

—বৃন্দাবন! সে কি?

—হ্যাঁ মা। সেই তো একমাত্র অক্ষয় চাঁদের পুরী! অন্ধকারে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি মা। সংসার আমার অন্ধকার!

মনে আছে বিদায় লইয়া সে সেদিন যতখানি তাহার শক্তি ততখানি দ্রুতপদে চলিতে সুরু করিয়াছিল। ঠিক যেন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছিল।

আজ সে বেশ বুঝিতে পারে সেই সুখের সংসারটি দেখিয়া ঈর্ষার তাড়নায় এমন নিজের দুঃখে কাতর হইয়াছিল, বৃন্দাবনের মুখে এমন করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যায় নাই, ওই গৃহস্থ বাড়ীটি হইতে ছুটিয়া পলাইয়াছিল। হয় তো ছুটিতে ছুটিতে একদিন বৃন্দাবনেই গিয়া উঠিত। কিন্তু—। মর্ম্মান্তিক দুঃখের হাসি ফুটিয়া উঠিল ব্রজদাসীর মুখে!

পথের মধ্যে দুলাল তাহার বুক জুড়িয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

ঝাঁপ দিয়া পড়াই বটে।

তাহার মনে আছে একবার একটা গিরগিটী তাহার গায়ে পড়িয়াছিল। সন্ধ্যার সময় গাছতলা দিয়া চলিবার পথে অতর্কিতে একেবারে গাছের উপর হইতে ঝপ্ করিয়া তাহার কাঁধের উপর পড়িয়াছিল। সে কি আতঙ্ক—সে কি অন্তরাত্মার চমক! যাহার গায়ে এমন ভাবে কখনও কিছু পড়ে নাই সে মর্ম্মান্তিক মুহূর্ত্তের অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। ঠিক এমনি করিয়াই দুলাল তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সে কি দিন!

জংসন ষ্টেশনের লম্পট বাঙালী সাহেবকে মনে করিলে তাহার সমস্ত শরীর আজও হিম হইয়া যায়!

ভাবনায় ছেদ পড়িল ব্রজদাসীর।

ঘরের দরজা ঠেলিয়া নরোত্তমদাস বাবাজী প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক রৌদ্র আসিয়া ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। ব্রজদাসী চমকিয়া উঠিল। মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া সচেতন হইয়া বসিল।

বাবাজী বলিলেন মৃদঙ্গ নোব। বরাবরই তো এ সময়ে কীর্ত্তন হয়। এবার একবার নিয়ম রক্ষাও তো করতে হবে। সুবলপুরের মহান্ত গাইবেন, ওকেই বললাম।

দেওয়ালের গায়ে সযত্নে কাপড় ঢাকিয়া খোলখানি তোলা থাকে। বাবাজী খোলখানি নামাইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। দরজা বন্ধ করিয়া দিতে ভুলিলেন না।

অন্ধকার হইয়া গেল ঘরখানা।

দুলাল একবার নড়িয়া চড়িয়া শুইল। সম্ভবত আলোর ছটায় তাহার ঘোর ভাঙিয়াছিল। ব্রজ আবার দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে চঞ্চল হইয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিল। আজ জন্মাষ্টমী! এই আখড়া প্রতিষ্ঠার প্রথম বৎসর হইতেই এই দিনটিতে সে দুপুরে পদাবলী গান করে। ভক্ত রসিকেরা শুনিয়া থাকেন। তাহার গোপাল শোনেন। এ বৎসর—। না সে হইবে না। শুধু তো তাহার নিজের অপরাধের কথাই নয়, দুলালের মঙ্গল অমঙ্গলও আছে যে। যে দুলালের মুখ চাহিয়া এই ভাবে সে বসিয়া থাকিবে—এই অপরাধের শাস্তি তাহাকে দিতে, যদি শাস্তি দাতা দুলালের উপর আঘাত হানেন। দুলালই যে তাহার জীবন মন্দিরের চূড়া! সোনার নয় পিতলের নয় কলঙ্কবর্ণ লোহার চূড়াই বটে, কিন্তু বজ্রাঘাত হইলে যে চূড়ার উপরেই হয়!

ব্রজদাসী শিহরিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দুলালের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া সন্তর্পণে পাটের কাপড়খানি টানিয়া লইয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

আখড়ার উঠানে ছোট একটি আচ্ছাদন ইতি মধ্যেই তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। চারিপাশে বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া মাথায় আটি আটি খড় চাপাইয়া আচ্ছাদন প্রতি বৎসরই তৈয়ারী হয়। মহেশমণ্ডলের তদারকে গ্রামের লোকেরাই এ কাজ করে। শুধু গোবর্দ্ধনপুরের এই আখড়াতেই নয়, এ অঞ্চলের সকল আখড়াতেই এই ব্যবস্থা। আখড়ার সেবাইত মহান্ত যিনিই থাকুন আসলে আখড়ার কর্ত্তা যে গ্রামের লোকেই। আখড়া, শিবতলা, কালীতলা—এ সবের ভার গ্রামের লোকেই স্মরণাতীত কাল হইতে বহন করিয়া আসিতেছে। তাহার উপর মহেশমণ্ডলের মত মানুষ যে গ্রামের মণ্ডল সে গ্রামের এসব কাজ এমন নিখুঁত ভাবে হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! ব্রজ দেখিল, বাঁশের খুঁটি গুলিতে দেবদারু পাতা দিয়া মুড়িয়া দিতে পর্য্যন্ত ভুল হয় নাই। আমের শাখা গাঁথা লম্বা লম্বা দড়ি টাঙানো হইতেছে, উঠান ব্রজদাসী কাল সন্ধ্যাতেই নিকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার উপর আল্পনা দেওয়াও হইয়া গিয়াছে, কে দিয়াছে ব্রজ জানে না, কিন্তু যেই দিয়া থাক—ভালই দিয়াছে।

মৃদঙ্গ লইয়া নরোত্তমদাস বাবাজী বসিয়াছেন, অন্য বৈষ্ণব মহান্তরা একে একে বসিতেছেন। ব্রজ আসিয়া সকলকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

নরোত্তমদাস বাবাজী মৃদঙ্গটি সামনে রাখিয়া হাত জোড় করিয়া গোবিন্দ স্মরণ করিতেছিলেন—তিনি কথা বলিলেন না—শুধু মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সুবলপুরের মহান্ত বলিলেন—আপনি উঠে এলেন মা-জী!

মৃদু হাসিয়া ব্রজদাসী বলিল, এলাম। আপনারা সকলে এসেছেন—তার উপর—এ দিনটি তো বছরে একদিনই আসে!

গোপালপুরের বুড়া বৈরাগী বাউল বলিলেন—দুলাল সুস্থ আছে তো!

—নিঝুম হয়ে পড়ে আছে। রক্তপাত হয়েছে তো অনেক! বেঁচেছে সে শুধু গোবিন্দের করুণা আর আপনাদের আশীর্ব্বাদ!

বাউল বলিলেন—মাগো! তুমি বলছ কি? করুণা হবে না গোবিন্দের? তোমার যে ওই একটি!

সুবলপুরের মহান্তের চোখ সজল হইয়া উঠিল, বলিলেন—আঃ। পিতৃহীন বালক, মায়ের এই একমাত্র ভরসা। হবে না করুণা তাঁর! ঠাঁকুর যে আমার অনাথের—অসহায়ের—দুর্ব্বলের! আঃ!

ব্রজর প্রতিবেশিনী রামকানাইয়ের মা ঝুড়ির পিঠে পাকা তাল ঘষিয়া মাড়ি বাহির করিতেছিল, সে আর থাকিতে পারিল না—বলিয়া উঠিল অনাথ বলছেন বলুন বাবারা—বলুন, দুব্বল বলবেন না, অসহায়ও বলবেন না। বাবা, বাঘের মতন রোক্ ছেলের, তেমনি কি পেচণ্ড জোর গায়ে! বোল-বছরের ছেলে আমার রামকানাইয়ের হামজুটি, রামকানাই ওর কাছে পিঁপড়ে! আর তেমনি কি সাহস বাবা! পিথিমীর কিছুকে ভয় নাই মা! তেমনি কি মারহাত ছেলের। সেই ছেলেবেলা থেকে। আমার রামকানাইয়ের ছামনের দুটো দাঁত কিল মেরে ভেঙে দিয়েছিল বাবা! মুখ ফুলে এই হাঁড়ি হয়ে উঠেছিল। ভাগ্যে দুধে দাঁত তখন—তাই আবার হয়েছে—নইলে ছেলে আমার ছের জনমের মত ফোকলা হয়ে থাকত! হবে না কেনে? মায়ের যে একদম শাসন নাই। শাসন থাকলে বোষ্টুম মহান্ত ঘরের ছেলে, আখড়ায় এমন গোপাল, মা নিজে এমন, গান শুনলে পশুপক্ষী বশ মানে—সেই মায়ের ছেলে—আখড়ার সেবা আখড়ার ধর্ম্ম বউকী জলে ভাসিয়ে দিয়ে ওই মেলেচ্ছ গাড়ী—লরী না নুড়ি—তাতেই কাজ করতে যায়? মা—গো—গাড়ীর ধোঁয়ার গন্ধ কি? একবার আমি চেপেছিলাম সাত কলসী বমি করে অন্নপেরাশনের ভাত তুলে তবে রক্ষে।

ও ছেলেকে দুর্ব্বল ব'ল না বাবা। ও তারপর ছেলে—তারপরের মরুজ্ তালগাছে চড়ে—তা এ আবার নতুন দেখালে বাবা, জলের কুমীর ডাঙায় তুলে—তাকে মেলে। ওই ছেলে দুর্ব্বল! বাবাঃ

মুখরা রামকানাইয়ের মা বলিয়াই চলিয়াছিল, রামকানাইয়ের মায়ের ওই স্বভাব, বলিতে সুরু করিলে থামে না, আগুন দেওয়া তুবড়ীর মত একেবারে বকিবার শক্তি ফুরাইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত বকিয়াই চলিবে। নরোত্তমদাস বাবাজী তুবড়ীর মুখে জল ঢালিয়া দিলেন তাঁহার গোবিন্দ স্মরণ শেষ হইবা মাত্র তিনি বাধা দিয়া বলিলেন—ওগো বাছা রামকানাইয়ের মা, প্রভুর ভোগের জিনিষ মা। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে প্রসাদ পাবেন ও আয়োজন মুখ বন্ধ ক'রে করতে হয় মা। এ সময় বকতে নাই রামকানাইয়ের উপরেও প্রভুর দয়া অনেক। দীর্ঘজীবী হবে তোমার ছেলে। চুপ ক'রে কাজ ক'রে যাও—নইলে কি জানি বকতে বকতে মুখ থেকে আব ছিটকে পড়ে উচ্ছিষ্ট হয়ে যেতে পারে।

রামকানাইয়ের মা অবাক হইয়া গেল—বলিল কি বাবা? কি পড়বে?

'আব' কথাটা এ অঞ্চলে অপ্রচলিত, সোজাসুজি থুথুই বলিয়া থাকে লোকে, নরোত্তমদাস বাবাজী কিন্তু থুথু কথাটা ব্যবহার করিতে পারেন নাই, বিশেষ করিয়া এমন ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভোগের বস্তুতে থুথু পড়িবে এ কথাটা মুখে যেন বাধিয়া গিয়াছে। কিন্তু রামকানাইয়ের মা কথাটা তাঁহাকে না বলাইয়া ছাড়িল না, অপ্রসন্ন মুখেই বলিলেন—কথা বলবার সময় মুখ থেকে আব বেরোয় না। থুথু—থুথু!

রামকানাইয়ের মা এবার শিহরিয়া উঠিল। কথা বন্ধ করিয়া সে কাজ আরম্ভ করিল।

বাবাজী বলিলেন—তবে আরম্ভ কর ব্রজ: বলিয়াই তিনি মৃদঙ্গে ধ্বনি তুলিলেন। প্রথম্ দফা বাজনা শেষ করিয়া তেহাই দিয়া হাত

জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন—জয় রাধে গোবিন্দ জয় গৌর নিত্যানন্দ

তারপরই ব্রজ গান আরম্ভ করিল। প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা তারপর কৃষ্ণলীলা। দীর্ঘ দশকুষীতে মধুর কণ্ঠে গান ধরিল—

পূরব জনম দিবস দেখিয়া
আবেশে গৌর রায়
সঙ্গীগণ লইয়া হরষিত হৈয়া
নন্দ মহোৎসব গায়—

জন্মাষ্টমী দিবসে শচীনন্দনের পূর্ব্বজন্ম স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিয়াছে; তিনি ভাবে বিভোর হইয়া সেই দিনের মহোৎসবের কথা স্মরণ করিতেছেন। স্মরণ করিতেছেন ব্রজপুরের আনন্দ। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী রাত্রি ঘন দুর্যোগে আচ্ছন্ন সমস্ত পৃথিবী সে দুর্য্যোগের বিভীষিকায় আচ্ছন্ন ত্রস্ত, তাহারই মধ্যে কারাগারের অন্ধকার অপার্থিব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, পিতা বসুদেব কারাগার হইতে সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া যমুনার পাথার পার হইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া সদ্যপ্রসূতি মা যশোমতীর কোলের পাশে তাহাকে রাখিয়া গিয়াছেন; যশোমতী প্রভাতে উঠিয়া আপন শিশু জ্ঞানে তাঁহার মুখ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। সমগ্র ব্রজমণ্ডলে পরমোৎসবের সাড়া জাগিয়া উঠিয়াছে। শচীনন্দনের মনে পড়িতেছে মা যশোদার আনন্দবিভোর মুখমণ্ডল। মনে পড়িতেছে মাতৃবক্ষের অমৃত স্বাদের স্মৃতি!

ঘৃত ঘোল দধি গো-রস হলদি
অবনী মাঝারে ঢালি—
কান্ধে ভার করি তাহার উপরি
নাচে গোরা বনমালী।

নিজেই তিনি আজ কাঁধে দই ঘোলের ভার লইয়া নাচিতেছেন, নেচেছিল সেদিন ব্রজপুরের গোপেদের দল।

ব্রজর মনে পড়িতেছিল নিজের কথা।

সেই দুর্য্যোগ রাত্রিতে পথে গাছের তলায় দুলালকে কোলে পাইয়া নির্ণিমেষ নেত্রে সে পূর্ব্ব দিগন্তের পানে চাহিয়াছিল। রাত্রির অবসান হইল, সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া চাহিয়াছিল একরাত্রি বয়স্ক শিশুটির মুখের দিকে। মনে পড়িতেছে সেই ক্ষণের মনের অবস্থার কথা।

ওদিকে বৈষ্ণব মণ্ডলী—গ্রামের শ্রোতৃমণ্ডলী স্তব্ধ হইয়া গান শুনিতেছেন। একটি ভাবাবেশ যেন অন্তরলোক হইতে শেষ প্রত্যুষের পৃথিবীর বুক হইতে জাগিয়া ওঠা কুয়াসার মত ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে।

অকস্মাৎ একটা ক্রুদ্ধ আর্ত্তচীৎকারে সকলে চমকিয়া উঠিল—একটা আগুনের তড়িৎগতি হল্কা বহিয়া গিয়া কুয়াসামণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিল। ব্রজ চমকিয়া উঠিল।

গোপাল টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিয়াছে দাঁতে দাঁত টিপিয়া ক্রুদ্ধ চীৎকার করিয়া সব ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া দিতে চাহিতেছে।

—গান—গান—গান। আমোদ! আমি মরে গেলাম—আর—সর্ব্বনাশী রাক্কুসী—তুমি গান গেয়ে ঠাকুর পুজো করছ!

দুলালের ক্রোধ বুনো মহিষের মত, তাহার কণ্ঠস্বরও বন্য পশুর মত কর্কশ, উচ্চ। রাগ হইলেই তাহার দাঁত বাহির হইয়া পড়ে, দাঁতে দাঁতে ঘষে। দুলালের ক্রোধে ক্ষোভের চেয়ে হিংস্রতার পরিমাণ বেশী।

মহান্ত নরোত্তমদাস বলিলেন, ব্রজ ওঠ তুমি, আমি অনুমতি করছি

ব্রজ উত্তর দিল না, সে গাহিয়াই চলিল। তখন সে নূতন পদ ধরিয়াছে। সমগ্র পৃথিবী নবজাত [illegible]কে বন্দনা করিতেছে—

জয় ব্রজরাজ কোঙর—
গোকুল উদয় গিরি-চান্দ উজোর।
কোটি ইন্দু জিনি মুখ, তনু জলধর—
একত্রে উদয়ে আলা করিয়াছে ঘর।

সে গাহিয়াই চলিল।

দুলাল দাওয়া হইতে একরূপ লাফদিয়া পড়িল, নিচে পড়িয়া বসিয়া পড়িল—আবার উঠিল—সকল শক্তি একত্রিত করিয়া আখড়া হইতে বাহির হইয়া গেল।

—চললাম আমি।

ব্রজ তবু উঠিল না। সুবলপুরের মহান্ত সব চেয়ে বেশী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন—গানের মধ্যে তিনি ব্রজদাসীকে ডাকিতে পারিলেন না—কিন্তু অগ্রসর হইয়া সামনে আসিয়া বসিলেন—মূল গায়কের কাজ তিনিই করিবেন। ব্রজ গান গাহিতে গাহিতেই ঘাড় নাড়িল—না।

বাহির হইবার পথে হরিবোলা পাল দুলালকে ধরিল—দুলাল—বাবা!

এক ঝটকায় তাহার হাত ছাড়াইয়া দুলাল গর্জ্জন করিয়া উঠিল—এ্যাও!

সে চলিয়া গেল।

ব্রজ তবু উঠিল না। সে গাহিয়াই চলিল—

ও থল কমল জিনি চরণ রাতুল
হেরিয়া উদ্ধব পঁহু চিত মন ভুল।

তিন

ব্রজ গান শেষ করিয়া প্রণাম করিল। তারপর উঠিয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেল কাপড় ছাড়িতে। একবার ফিরিয়া দেখিল না, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিল না—দুলাল কোথায় গেল।

যাক্—যেখানে গিয়াছে যাক্। একমাত্র ভাবনা অসুস্থ শরীর, এই ঘণ্টা কয়েক আগে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে—জলের কুমীর—বনের বাঘ—গর্ত্তের সাপ অপেক্ষমান যম। হোক ছোট—তবু তাকে যমই বলিতে হইবে। তাহার পরিচয় তো দুলালের কাঁধের নীচে পিঠের উপর ধারালো দাঁতের চিহ্ন বর্ত্তমান, রক্তপাতে তো সে সত্য লেখা হইয়া রহিয়াছে। ঘরের বিছানায় রহিয়াছে, দাওয়া নিকানো হইয়াছে তবু লাল রক্তের দাগ মুছে নাই। ঘণ্টাখানেক পর হইতে তো অজ্ঞানের মত পড়িয়াছিল। ভাবনা ওইটুকু। কিন্তু সে ভাবনাও আর সে ভাবিবে না। যেখানে গিয়াছে যাক, যা হইবার হোক, সে খুঁজিবেও না, ভাবিবেও না।

এ কি বন্ধন, নাগপাশ; ভগবান তাহাকে নাগপাশে বাঁধিয়াছেন সে পাশ যদি আজ নিজে ছাড়িয়া যায় যাক। কাল নাগের বিষে শরীর তাহার জর্জ্জর হইয়া গেল!

মহেশ মণ্ডল অগ্রসর হইয়া আসিল—বলিল—ভেবো না মা-জী। সে বাগ্দী বুড়ীর বাড়ী গিয়ে উঠেছে। আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি—পথে দেখি টলতে টলতে চলেছে। গিয়ে বাগ্দী দিদির দাওয়ায় শুয়ে বললে—আমাকে মরতে ঠাঁই দিবি একটুকু—বাগ্দী দিদি?

ব্রজ বলিল—থাক মোড়ল। আমাকে আর শুনিও না, ওর নাম

আমি শুনতে চাই না, ওর মুখ আমি দেখতে চাই না। তুমি—। সে আরও কিছু বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

বেচারী মহেশ বিষণ্ণ হাসিয়া মাথা হেঁট করিয়া সরিয়া আসিল।

নরোত্তম দাস বাবাজী হাসিয়া বলিলেন—থাক মহেশ। ব্রজ আজ অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছে। সে বেশ ভালো আছে তো? ডাক্তার দেখানো হয়েছে? না, দেখালে না?

—হ্যাঁ। ওখানেই ডাক্তারকে নিয়ে দেখালাম। আমাকে দেখে ভয়ানক চীৎকার। ডাক্তারবাবুকে দেখে ঠাণ্ডা হল। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে খুব পরিচয় তো। ডাক্তার বললেন—ওর জন্যে দিন একটা দুটো আইডিনের তুলি আমাকে দিতে হয়। কিছু-না-কিছু ক'রে রক্তপাত করবেই ও। বেশ ক'রে ধুয়ে—ভাল করে বেঁধে-ছেঁদে দিলেন। বললেন—ভয় নেই!

—ভাল। সন্ধ্যে বেলা আমি নিজে গিয়ে ফিরিয়ে আনব।

—না। ব্রজদাসী ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

বাবাজী বলিলেন মহেশ মণ্ডলকে, মৃদুস্বরে বলিলেন—তাই তো মহেশ, ব্রজদাসীর জীবনটা—অশান্তিময় করে দেবে বলে মনে হচ্ছে। ও ছেলে আর যে বাগ মানবে বলে মনে হচ্ছে না। তাই তে—আমরা—। বাবাজী কথা শেষ করিলেন না কিন্তু যাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন মহেশের কাছে সে কথা অজ্ঞাত রহিল না।

মহেশ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। মৃদুস্বরেই সে বলিল—আমি কি বলব প্রভু ভেবে পাই না। ভগবান—। আর সে বলিতে পারিল না। কয়েক মুহূর্ত্ত পর গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—মা-জী ছিলেন, ওঁর সামনে আমি বলতে পারি নাই। চণ্ডালের মত কথাবার্ত্তা বাবা। ভগবানকে কটু বাক্য। গোপাল বিগ্রহকে সে—।

চুপ করিয়া গেল মহেশ।

দুলাল চীৎকার করিয়া বলিয়াছে—আমি যাচ্ছি ম'রে—যন্ত্রণায়। ছটফট করছি আর একটা মাটির ঠাকুর নিয়ে মা হ'য়ে যে মাতামাতি কচ্ছে সে রাক্ষুসী। মনে হয় ওই ঠাকুর—।

শিহরিয়া উঠিয়া মহেশ দুলালকে বলিয়াছিল—ম'—ম'—না, ও কথা ব'ল না বাবা। বলতে নাই। ছি!

—ছি! বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া দুলাল বলিয়াছিল—ছি! আচ্ছা—আচ্ছা। ঠাকুর বেঁচে থাক্। খুব ননী মাখন খাক। ওই রাক্ষুসী—ওই মাটির ডেলা বুকে চাপিয়ে যাক স্বগ্গে। আমি ম'রে খালাস পাই!

বিষণ্ণ হাসিয়া উদাস দৃষ্টিতে বাবাজী আকাশের দিকে চাহিলেন। বলিলেন—আমিই দায়ী একরকম মহেশ। ছেলেটাকে যদি আমি—

—না। দায়ী আপনি নন প্রভু। দায়ী আমার অদৃষ্ট—আর দায়ী হতভাগার—।

—না—না—না। ও সব কথা তুমি মুখে এনো না ব্রজ। আর আমি বলছি আর একটু বয়স হ'লেই ও ঠিক হয়ে যাবে। এ বয়সটারই হ'ল ওই ধর্ম্ম।

—না। ঠিক হবে না বাবা। এ বয়সের কথা বলছেন—মানলাম কিন্তু ছেলেবেলায় সেই চার পাঁচ বছর বয়সে—কোন্ ধর্ম্মে ও ছেলে ঠাকুরকে মন্দ কথা বলত—ভাঙতে যেত বলুন তো? জন্ম থেকে ওর ঠাকুরের উপর একটা আক্রোশ!

হঠাৎ ব্রজদাসীর ঠোঁট দুটি অবরুদ্ধ আবেগের তাড়নায় থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সে চোখ না বুজিয়া পারিল না, যেন মানুষের দিকে তাকাইয়া থাকিবার মত শক্তির সম্বল শেষ

হইয়া গিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে চোখ মেলিয়া মাটির দিকে চাহিয়া বলিল—এ কি আমার শাস্তি বলুন গো? আমার গোবিন্দ—আমার গোপাল—তাঁর উপর যার—

আবার তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল—আর সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বাবাজী হাসিলেন। এটুকু যেন তাঁর মুদ্রাদোষ। সুখেও হাসি—দুঃখেও হাসি। চোখে জল পড়ে—মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে। সে হাসি যে দেখে তাহার কান্না পায়।

মহেশ মণ্ডল বোধ হয় আর সহ্য করিতে পারিল না—সে চলিয়া গেল।

ব্রজও চোখ মুছিয়া চলিয়া গেল রাত্রের অনুষ্ঠান আয়োজনের কাজে। উনান ধরিয়া উঠিয়াছে। ময়দা গুড় তালের মাড়ি সবই প্রস্তুত। তালের বড়া গুলি ভাজিয়া ফেলিতে হইবে। সে বুক বাঁধিয়াছে। জয় গোবিন্দ! গোবিন্দ থাকিতে দুঃখ কিসের? যার গোবিন্দ আছেন—তার সব আছে!

রাত্রে নরোত্তম দাস বাবাজী গোপালের পূজা করিয়া জন্মাষ্টমীর কথা পাঠ করিতে বসিলেন। প্রথম প্রহরের পূজা পাঠ শেষ হইয়া গেল। বাবাজী বলিলেন—উপবাস করে আছ ব্রজ, এইবার তুমি একটু বিশ্রাম কর। ঘুমুতে নেই। তবু একবার গড়াও।

—হ্যাঁ।

—আমি সন্ধ্যাতেও লোক পাঠিয়েছিলাম। সে ভাল আছে। একটু সকৌতুক হাসি হাসিয়া বলিলেন—কি বলেছে জান? বলেছে—তোমরা কেন এসেছ হে বাপু? সেই গোপালঠাকুরের সেবায়েত মহন্তিনীকে পাঠিয়ে দিয়ো। তার সঙ্গে বোঝা পড়া হবে—তবে যাব। নইলে

আমি মরি সেও ভাল--কিছুতেই যাব না। কাল সকালে একবার যাবেন, গেলেই চলে আসবে। গাড়ীর জন্যে—

বাধা দিয়া ব্রজদাসী বলিল—না।

বাবাজী হাসিলেন ;

—আমি যাব না প্রভু। আমার বন্ধন কেটেছে—এ আমার উপর গোবিন্দের দয়া, আপনি প্রভু, গোপালের সেবার ভার থেকে আমায় মুক্তি দিন, আমি চলে যাই। পথ চলতে চলতে মাঝপথে বাঁধা পড়েছে, বাঁধন খুলেছে, আমি চলব—আর একবার চলব। এ বন্ধ শাস্তি—এ বড় পাপ ;

—ছি ছি ব্রজ! এ কথা বলো না। বলতে নাই।

—আছে। একশো বার আছে। আমি যে হাড়ে হাড়ে যন্ত্রণা পেয়ে বুঝলাম প্রভু।

—আজ এখন ও কথা থাক। কাল হবে।

—না। আর না। সে অলস অবসাদে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া যেন এলাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পর ভাদ্র মাসের অসহ্য গুমোট গরমে প্রায় অধীর হইয়া দাঁড়াইল। উঠানে নামিয়া পড়িল।

আঃ—ছি ছি! কি ওটা? একটা পাতা। কিসের পাতা? ছি—ছি—আবার স্নান করিতে হইবে!

গামছা খানা টানিয়া ঘাড়ে ফেলিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। বাহিরে আসিয়া সে যেন বাঁচিল। তবু খানিকটা বাতাসের স্পর্শ যেন পাওয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল পাতা ছোঁয়া পড়াটাও যেন ভাল হইয়াছে। ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া দেহখানা জুড়াইবার সুযোগ মিলিয়াছে। সারাটা দেহ যেন জ্বালা করিতেছে। আগুনের

আঁচে সব যেন ঝলসিয়া গিয়াছে! আশ্চর্য! ব্রজদাসী নিজেই একটু হাসিল। এক একদিন কি যে হয়—ভগবান জানেন! নহিলে এ আগুনের আঁচ আর কি এমন আঁচ! বাবাজীর আখড়ায় দোলের সময় যে সমারোহ হয় সে সমারোহকে ধনী জমিদার বাড়ীর বড় বড় যজ্ঞির সঙ্গে তুলনা করা যায়। বড় বড় জোল উনান কাটিয়া রান্না, একটা উনানে আটটা হাঁড়ি চাপে। ময়রার দোকানের উনানের মত উনানে ব্যঞ্জন রান্না হয়। সেই উনানে উদয়াস্ত রান্নার কাজ করে ব্রজদাসী। বাবাজী বলেন—ব্রজ তোমার, হাতের ব্যঞ্জন ছাড়া প্রভু তো ভোগে অমৃত স্বাদ পাবেন না! তুমি যে গোপালের সেবা কর, তুমি যে সাক্ষাৎ যশোমতী গো!

সাক্ষাৎ যশোমতী! নরোত্তম দাস বাবাজী হয় তো রহস্য করেন। এতদিন কথাটা মনে হইলে সে খুসী হইত। মনে মনে শিহরিয়া উঠিত। বারবার বলিত—বাবাজী স্নেহে অন্ধ। তিনি যা বলেন তার অপরাধ যেন তাহাকে স্পর্শ না করে। দুলালের যেন অমঙ্গল না হয়। আজ সে মনে মনে স্থির করিল এবার বাবাজীর কথার প্রতিবাদ করিবে। বলিবে —না—এমন রহস্য আর করবেন না প্রভু!

হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার পায়ে দুইপাশের ক্ষেতের ধান জড়াইয়া যাইতেছে; ভাবিতে ভাবিতে কখন সে মাঠে আসিয়া পড়িয়াছে। এ কি? স্নান করিতে কোথায় চলিয়াছে সে? এ যে গ্রাম পার হইয়া আউশের মাঠে আসিয়া পড়িয়াছে। ওই তো চাঁদরায়ের বাঁধ! বাঁধের ওপারে বাগ্দীপাড়া। কপালে তাহার কুঞ্চন রেখা জাগিয়া উঠিল। দুর্দ্দান্ত লক্ষীছাড়াকে একবার দেখিয়া আসিবে না কি? ওই তো বাঁধের ওপারে খান কয়েক ধান ক্ষেত পার হইয়াই—।

ছিঃ! ছি! না—। কখনই যাওয়া উচিত নয় তার। যে ছেলে

তাহার ইষ্টদেবতার অপমান করে—যে ভগবানকে অবহেলা করে—তাহার মুখ দেখা তাহার উচিত নয়। বন্ধন ছিঁড়িয়া ছেলে ভালই হইয়াছে।

হঠাৎ অন্ধকার নিস্তব্ধ মাঠখানা যেন চমকিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

—ওরে! ওরে!

কে কাহাকে ডাকিতেছে? চেনা গলা!

—ওরে অ দুলালে! শুনছিস?

—আ—প!

—ওরে—এই শরীল নিয়ে যাবি কোথা? তোর মাকে আমি বলব কি?

—বলিস—মরে গিয়েছি!

—ওরে হতভাগা, মরবি তো এইখানে মর না কেনে? মরতে যাবি কোথা?

—আমি চল্লাম—আপনার আস্তানায়। বাসের আড্ডায়। সেইখানেই মরব।

—অ দুলালে—ওরে—অ—।

বাগ্দী বুড়ী চীৎকার করিতেছে। দুলাল বুড়ীর ঘর হইতেও চলিয়া যাইতেছে। বাসের আড্ডায় চলিয়াছে। নিতান্ত দুর্ম্মতি না হইলে এমন ইচ্ছা মানুষের হয় না। ক্রোশ দেড়েক পথ যাইতে হইবে। এত রক্তপাত হইয়াছে তবুও ভ্রূক্ষেপ নাই দুর্দ্দান্তের!

ওই—চাঁদ রায়ের বাঁধের পাশ দিয়া দুর্দ্দান্ত আসিতেছে। ব্রজদাসী শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। পরমুহূর্ত্তেই ধান ভরা ক্ষেতের মধ্যে বসিয়া পড়িয়া আত্মগোপন করিল। যাক। তাহাকে দেখিতে পাইলে দুর্দ্দান্তটা ভাবিবে সে তাহারই খোঁজে আসিয়াছিল।

বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে দুলাল চলিয়াছে।

—যাব, চলেই যাব। যাবার পথে তোর সঙ্গে একবার বোঝা পড়া করে তবে যাব। হাঁ—বোঝাপড়া করব—ভাল ক'রে বোঝাপড়া করব—শেষ বোঝাপড়া করব। হাঁ—তুইও বেজ বষ্টুমী—আমিও বাবা গিরিজ নন্দন—হাঁ—

—কি বোঝাপড়া করবি? বলি, দাঁত কিস্ কিস্ ক'রে বোঝাপড়া করবি বলে—তুই যে ফাকা মাঠে সাপের মত গজরাচ্ছিস—তা' আমার সঙ্গে তোর বোঝা পড়ার আছে কি? ব্রজ আর থাকিতে পারিল না, ধান ক্ষেতের মধ্য হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কথাগুলি বলিয়া উঠিল। রাগে আক্ষেপে অভিমানে কণ্ঠস্বর তাহার বিচিত্র। স্পর্শ তাহার সুস্পষ্ট!

দুলালও চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

ভয় দুলালের নাই। ভয় সে পায় নাই। অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতার বিস্ময়ে সে চমকিয়া উঠিল। এই মাঠের মধ্যে অন্ধকার রাত্রে কোথা হইতে আসিল রাক্ষসী? পরমুহূর্ত্তেই সে বিস্ময় কাটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—যাব না, আমি যাব না তোর বাড়ী। কেন এসেছিস তুই? আমি চলে যাব। যেদিকে মন যায় আমি চলে যাব।

—আমি তোকে নিয়ে যেতে আসি নাই। আমি এসেছি চান করতে।

—চান করতে? আমি বুঝি না কিছু? চান করতে এসেছিস—মাঠে ধান ক্ষেতে চান করতে এসেছিস?

—ধান ক্ষেতে নয় রে মুখপোড়া—চাঁদ রায়ের বাঁধে—

—চাঁদ রায়ের বাঁধে? গাঁয়ে এত পুকুর থাকতে, ঘরের দোরে বউকীর ঘাট থাকতে—চাঁদ রায়ের বাঁধে? যা—যা—তুই চলে যা, আমি যাব না—

পিছনের অন্ধকার হইতে বাগ্দীবুড়ী বলিল—ওই দেখ মা—ওই দেখ। কি বজ্জাত কি নেমকহারাম তোমার ছেলে মা! আমার ঘরে এল—বলে, —'আমাকে মরতে টুকচে ঠাঁই দিবি!' আমি বলি—ষাঠ, ষাঠ, ষাঠ—মরবি কেনে ভাই? বলে অমন মা যার—তার মরণই ভাল। রাক্ষুসী—ডাকিনী —সে মা কত যে বললে—সে আর কত বলব! তা'পরেতে মা—মোড়ল ডাক্তার আনলে—ডাক্তার দেখলে—চলে গেল; হঠাৎ সনদে থেকে আমাকে গাল পাড়তে লাগল। বলে—কি বিছেনা দিয়েছিস আমার সর্ব্বাঙ্গে ফুটছে। বলে—কি গন্ধ তোর ঘরের? খেতে দিলাম—দুধ। তা' বলে—আমি কি গরুর বাছুর যে দুধ খাব আমি? বললাম—হ্যাঁরে যখন ছোট ছিলি তখন আমি ভাত দিয়েছি—খেয়েছিস—এখন বড় হয়েছিস—আজ তোকেও জাত বিচার করতে হবে—আমাকেও করতে হবে। আমি কি বলে ভাত দোব? আর ভাত খেলে—খারাপ হবে যে। ডাক্তার কি বলে গেল? বলে মা—আমাকে যত গালাগাল ডাক্তারকেও তত গালাগাল।

দুলাল আর সহ্য করিতে পারিল না—চীৎকার করিয়া উঠিল—বেশ করেছি—খুব করেছি। তিনকুলখাগী বুড়ী মরণ নাই তোর, আমি বলছি—তোর মরণ কোন কালে হবে না। পঙ্গু হবি—হাত পা পড়ে যাবে, তুই পড়ে থাকবি আর চিঁ চিঁ ক'রে চেঁচাবি—এঁক মুঠো ভাঁত এঁক টুঁকুন জল—

বুড়ীও চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে—ও তিরদশে—ওরে ও বাঁশবুকো —ওরে—ও যমের অরুচি—

ব্রজদাসী আবার ছুটিয়া আসিয়া বুড়ির হাতে ধরিল—আমি তোমার হাতে ধরছি—আমি তোমার কাছে ঘাট মানছি—তুমি আমার মায়ের মত। বড় যত্ন করেছ একদিন—তোমাকে ও ভালবাসে—

—না ওকে আমি ভালবাসি না। এক মুঠো ভাত চাইলাম—তা' দিলে না।

হাসিয়া ব্রজদাসী বলিল—রাত্রে ভাত না হলে ওর পেট ভরে না মা, সে তুমি লুচি পুরি মিষ্টি রাজভোগ দাও না কেন—ঠেলে ফেলে দিয়ে বলবে—ভাত দে—ভাত! দুধ দিলে বলবে—আমি কি গরুর বাছুর? লুচি পুরি দিলে বলবে—আমি কি বামুনের বিধবা?

দুলাল চীৎকার করিয়া উঠিল—তোর কি? তাতে তোর কি? আমার যা রুচি হবে তাই খাব? তোর ওই গোপালের লুচি পেসাদ যদি না খাই আমি? ননী ছানা যদি মুখে না রোচে আমার?

ব্রজদাসী এবার গর্জ্জিয়া উঠিল—দুলাল!

—কি? দুলাল কাউকে ভয় করে না।

বাগ্দীবুড়ি এবার হাত জোড় করিয়া বলিল—হেই মা হেই—ভাই, আর তোমরা রাত দুপুরে ঝগড়া ক'র না। আর আমার বুড়ো বয়সে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকবার ক্ষমতা নাই। দোহাই তোমাদের। যাও বাড়ী যাও। তাই দাও গে মা—একটু একমুঠো ভাত ফুটিয়ে দাও গে।

ব্রজ বলিল—না—মা, ওকে বলতে হবে, ঠাকুরকে এমন কুবাক্য বলবে না। তা নইলে—

'তা' নইলে—

ব্রজ যে কি করিবে সে কথা ভাবিয়া পাইল না, দুলালও তাহাকে ভাবিবার সে সময় দিল না—দাঁত বাহির করিয়া তর্জ্জনী নাড়িয়া আস্ফালন করিয়া বলিল—তোকেও বলতে হবে, ঠাকুরের পেসাদ খা, 'চরণোদক' খা—উপোস কর, এই সব বলে জ্বালাবি না। তুই মা—তোর ঠাকুর,

সেই খাতিরে পেনাম সকাল সনধে করব—এই পয্যন্ত। হ্যাঁ। আর আমি মরব—আর তুই ঠাকুরের ছামনে গিয়ে তে—নে—নে ক'রে গান ধরবি—তা হবে না।

—ওরে হতভাগা—

—খবরদার বলছি রাক্কুসী—খবরদার—হতভাগা আমাকে বলবি না তুই। কিসের লেগে হতভাগা হ'তে যাব আমি ? হতভাগা ! তুই হতভাগী, তুই কপালখাগী ! তুই হতচ্ছাড়ী !

বুড়ী হাসিয়া ফেলিল—বলিল—আচ্ছা ভাই আচ্ছা—তুমি ভাগ্যিমান পুরুষ—তুমি—

—নিশ্চয় ! হতভাগা ! হতচ্ছাড়া ! খবরদার ওসব বলবি না আমাকে।

—বেশ বলব না। চল—বাড়ী চল !

—ভাত দিতে হবে।

—দোব।

—তবে ধর আমাকে।

—ধরতে হবে ? এই যে এখুনি চলে যাচ্ছিলি—বাসের আড্ডায়—পাকা দেড় কোশ পথ !

—না পারিতাম রাস্তায় মরে পড়ে থাকতাম। কাল সকালে খবর পেয়ে গিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদতিস—ওরে দুলাল বাবারে—

—ঠাস ক'রে এক চড় দোব তোর মুখে।

—তবে ধর না কেন আমাকে !

ব্রজদাসী হাসিবে না—কাঁদিবে ভাবিয়া পায় না। সেই রাত্রে আখড়ায় ফিরিয়া ভাত চড়াইয়া দিল। ভাত নামাইয়া সে যখন দুলালকে

রাত্রি হইতে কেমন নিঝুম হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রজ ভাবিতেছিল অন্ত রূপ। বাহিরে মহেশ মণ্ডল শুইয়াছিল, শঙ্কিত হইয়া ব্রজ তাহাকে ডাকিল—মোড়ল!

মহেশ নাড়ী দেখিতে পারে। পল্লীগ্রামে মণ্ডলদের এ বিদ্যাটি অবশ্যই জানিতে হয়। মহেশ এ বিদ্যাটি ভাল করিয়াই শিখিয়াছিল। সে সন্ধ্যা হইতেই ব্যাপারটা অনুমান করিয়াছিল। সাতদিন আজ, জ্বরের মাত্রা ক্রমশ কম হইয়া আসিতেছে। আজ জ্বর অল্পই আছে সমস্ত দিন। হয় তো ডাক্তারী যন্ত্র থারমোমিটারের হিসাবে একশো, কি—কিছু বেশী হইবে।

ব্রজদাসীর শঙ্কিত আহ্বানে বিস্মিত হইয়া সে উঠিয়া বসিল—প্রশ্ন করিল—কি—মা—জী?

—একবার দেখ দিকি। এ যে—শাকগাছটার মত নেতিয়ে পড়েছে।

মহেশ উঠিয়া আসিয়া নাড়ী দেখিয়া—মৃদু হাসিয়া বলিল—ভয় নাই। নাড়ী ঠিক আছে, চমৎকার আছে। জ্বরটা আজ ত্যাগ করবে। ঘুমুচ্ছে—সুস্থ হচ্ছে কি না! কোন ভাবনা করো না।

—ঠিক বলছ?

হাসিয়া মহেশ বলিল—ভাবনার কিছু থাকলে—আমি এমন করে হেসে কথা বলতে পারি মা-জী? কোন চিন্তা নাই। তুমি ঘুমাও; আমি বলছি। আমি বরং থাকি!

—না।

ব্রজদাসী তবুও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। মহেশ মণ্ডল যাহা বলিয়াছে—সে-কথা সে অবিশ্বাস করে না, মহেশের কথা অবিশ্বাস করা যায় না, তবুও দুর্দ্দান্ত দুলাল—এমন নিস্তেজ হইয়া গেল কেন?

বড় রহস্যপূর্ণ ; বিচিত্র তাহার গতি-বিধি ; তাহাকে চেনা যায় না, জানা যায় না, কখন কোন দিক হইতে কেমন ভাবে অতর্কিত একটি ফুৎকারে প্রদীপ নিভাইয়া দেওয়ার মত মানুষের জীবন শেষ করিয়া দেয় কেউ বলিতে পারে না। সে দুলালের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

কার্ত্তিক মাস—শীতের আমেজ পড়িয়াছে, শেষরাত্রে কাপড়খানা ভাল করিয়া টানিয়া গায়ে দিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিল ; বাহিরটা নিস্তব্ধ অতি মৃদু একটা সন্‌সন্‌ শব্দ—আর তাহার সঙ্গে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাইতেছে !

—মা !

ব্রজদাসী চমকিয়া উঠিল ;—দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে—কখন চোখের পাতা দুইটী আপনি নামিয়া আসিয়া জুড়িয়া গিয়াছে ; তন্দ্রা আসিয়াছিল। ক্ষীণ দুর্ব্বল কণ্ঠে দুলাল—এই মুহূর্ত্তটিতেই ডাকিল—মা !

ব্রজদাসী বিস্ফারিত নেত্রে দুলালের দিকে চাহিল—বুকের ভিতরটায় যেন পাহাড়ের চূড়া হইতে পাথর খসিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে—সব গুঁড়াইয়া দিতেছে। দুলাল আবার ডাকিল—মা !

দুলালের চোখ দুইটি শরতের আকাশের মত ঘোর মুক্ত—পরিচ্ছন্ন, মালতী ফুলের পাপড়ির মত শুভ্র প্রসন্ন ; ব্রজদাসীর মুখের পানে—গাঢ় অনুরাগে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকার মধ্যে চৈতন্য প্রদীপ শিখার মত জলিতেছে। ব্রজদাসী দুলালের কপালের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া গাঢ় আবেগে আপনার ঠোঁট দুটি চাপিয়া ধরিল ! শীতল স্নিগ্ধ কপালখানি ! সে ডাকিল—দুলাল !

দুলাল এবার দুই হাত তুলিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল।

ব্রজদাসী অঝোর ঝরে কাঁদিতেছিল।

দুলাল বলিল—কাঁদিস না। বড় অসুখ করেছিল আমার—না?

ব্রজদাসী শুধুই কাঁদিল, কথার উত্তর দিতে পারিল না।

দুলাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—সেই আমাকে কুমীরে ধরেছিল, জন্মাষ্টমীর দিন! সেই আমি বাগ্দীবুড়ীর বাড়ী গিয়েছিলাম রাগ ক'রে। হুঁ। ওঃ! আচ্ছা—সেই কুমীরটাকে মেরেছিলাম—সেটা কি হ'ল? তার চামড়াটা?

তার চামড়াটা? এবার ব্রজ চোখ মুছিয়া হাসিল।

দুলাল বলিল—তার চামড়াটা যদি নষ্ট হয়ে থাকে তো ভাল হবে না।

—আচ্ছা পাগল তুই কিন্তু দুলাল।

—কেন?

—তোর এই অসুখ—যমে-মানুষে টানাটানি—আমি তোকে দেখব—না—তোর কুমীরের চামড়ার ব্যবস্থা করব? তা ছাড়া বাবা—বৈষ্ণবের ঘর—গোপালের আশ্রম, এখানে কি ওসব চামড়া-টামড়া নিয়ে—অনাচার করতে পারি?

দুলাল আজ কিন্তু ফোঁস করিয়া উঠিল না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—যঃ—বেটার মেছো কুমীর—আমার পিঠে দাগ করে দিলে, আর—

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গভীর আক্ষেপ করিয়া বলিল—কুমীরের চামড়ায় আচ্ছা জুতো হয়! মিলিটারী বেটাদের কাছে বিক্রী করলে—ওঃ—সে মেলাই টাকা হত।....আচ্ছা—পচে-খসে একটুকুও পড়ে নাই? বেটার দাঁতগুলো কি হ'ল? দাত গুলো?

—সে আমি জানি না দুলাল, আমাকে আর জ্বালাস না।

—সকাল হোক, আমি দেখব—কিছু মিছু পড়ে আছে কি না।

ব্রজ শিহরিয়া উঠিল। —তুই উঠবি? উঠতে পারবি?

—তা পারব। তুই ধরাব আমাকে। তা—পারব। সে কনুইয়ে ভর দিয়া তখনই উঠিবার চেষ্টা করিল।

তাহার বুকে চাপিয়া ধরিয়া ব্রজ বলিল—খবরদার তুলাল। ওরে—. আজ তু মাস তুই বিছানায় শুয়ে আছিস। জ্ঞান ছিল না।

—তু—মা—স! তুলালের চোখ তুইটা বড় হইয়া উঠিল। লে—বাবাঃ! আঃ— তা' হ'লে আমার চাকরীমাকরী কিছুই নাই আর।

—না থাকে নাই—তার জন্যে তুঃখু করেও কাজ নাই। তুই এখন সেরে ওঠ!

একটু নীরব থাকিয়া ব্রজ আবার বলিল—নিজে এত তুঃখ পেলি বাবা, আমাকে এত তুঃখ দিলি—আজ তুমাস ঠায় তোর শিয়রে বসে আছি—প্রতিক্ষণে মনে হয়েছে আমার চন্দ-স্থয্যি যেন এই নিভে গেল, এতেও যদি তোর জ্ঞান না হয় তুলাল—তবে আর তোকে কি বলব আমি, বল? তুই বৈষ্ণবের ছেলে, ঘরে গোপালজীর সেবা, তুই তাঁকে মানিস না, তাঁর সেবাতে তোর মন নাই; কল কারখানা, কোথায় মটর, কোথায় হাঙ্গামা হুজ্জোত—এই নিয়ে তোর মাতামাতি! ওরে—এসব তোর সইবে কেন? তুই ভাল হয়ে ওঠ,—নিজের ধম্মে থাক বাবা, আমার প্রাণটা জুড়োক—তোর মঙ্গল হবে—ভাল হবে!

ব্রজদাসীর কণ্ঠস্বরে সে কি কাকুতি! তুলালের মনে হইল মান-গোবিন্দপুরের বাজারের ভিক্ষুক মেয়েগুলার ভিক্ষা চাওয়ার মধ্যে এমন কাকুতি থাকে না, তাহাদের কণ্ঠস্বরও এমন সকরুণ নয়! কালাপাহাড় তুলাল, দাঙ্গা তুলাল তাহার চোখও সজল হইয়া উঠিল—সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া চোখ বুজিল।

ব্রজদাসী তাহার কপালে হাত বুলাইতে লাগিল।

সকাল বেলা চোখে আলো লাগিয়া তুলালের ঘুম ভাঙ্গিল। আবা সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ব্রজদাসী উঠিয়া স্নান সারিয়াছে; তুইমাস পর আজ পরিপাটী করিয়া গোপালের ঘর মার্জ্জনা করিয়া ধুইয়া মুছিয় একটি প্রসন্দী করবী ফুল লইয়া দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে তুলালের ঘুম ভাঙ্গিল। মাথার শিয়রে বসিয়া ব্রজ বলিল—মনে মনে গোপালকে প্রণাম কর বাবা! আশীর্ব্বাদী দোব।

তুলাল মায়ের মুখের দিকে চাহিল। এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

এমন নিষ্পলক দৃষ্টি দেখিয়া ব্রজদাসী শঙ্কিত হইয়া ডাকিল—তুলাল তাহার ভয় হইল, আবার রোগের কোন নূতন উপসর্গ দেখা দি না কি!

তুলাল ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে উত্তর দিল—কি?

—এমন ক'রে চেয়ে রয়েছিস কেন বাবা?

—তোর কি চেহারা হয়েছে! তোরও জ্বর হচ্ছে না কি?

ব্রজ কাঁদিয়া ফেলিল—সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট তুইটির প্রান্তে প্রান্তে বিচিত্র হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

তুলাল বলিল—এঃ মুখখানা কালী মাখা হয়ে গিয়েছে!

—হোক। নে, এখন আশীর্ব্বাদী নে। গোপালকে মনে মনে প্রণাম কর।

তুলাল প্রতিবাদ করিল না। হাতত্বইটি কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। ব্রজদাসী ফুলটি কপালে ঠেকাইয়া দিয়া বলিল—মনে মনে বল—আমার অপরাধ হয়ে থাকলে—তুমি মার্জ্জনা কর!

—এই দেখ! এত সব আমি বলতে পারব না।

—না—তোকে বলতে হবে! জানিস—উনিই তোকে বাঁচিয়েছেন ডাক্তার বদ্যির সাধ্যি ছিল না।

—একটু দেখ !

—নইলে আমি মাথা খুঁড়ব তোর পায়ে !

—মাথা খুঁড়বি ? আমার পায়ে ?

—হ্যাঁ। আমার যে কথা সেই কাজ ! বল—

—আচ্ছা। তাই বলছি।

—বল।

—বলেছি। মনে মনে বলেছি !

—না—আমাকে শুনিয়ে বল।

—সে—আমি পারব না। কক্ষনো না।

ব্রজদাসী বলিল—তোকে পারতে হবে দুলাল। আমাকে জিজ্ঞেসা করছিলি—আমার চেহারা এমন হ'ল কেন ? আমার জ্বর হচ্ছে কিনা ? জ্বর নয়—জ্বালা, তোর শিয়রে দুমাস জেগে বসে থেকেছি আর দুশ্চিন্তার জ্বালায় জ্বলে আমার এই অবস্থা হয়েছে। তুই বিশ্বাস কর—ঘরের কোণে কোণে, আমার মনে হ'ত, কালো-কালো কি দাঁড়িয়ে থাকত, ভয় পেতাম, গোপালকে ডাকতাম আর কাঁদতাম ; —সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি—ছায়াগুলো মিলিয়ে যেত। তোকে বলতে হবে। বল।

দুলাল কেমন হইয়া গেল। সে হাত জোড় করিয়া মৃদুস্বরে কথাগুলি বলিয়া গেল। শেষ করিয়া সে লজ্জায় সারা হইয়া গিয়া বলিল—ধেৎ ! বললাম—মনে মনে বলেছি। তা মানবে না। এইসব আবার মুখ ফুটে বলা যায় না কি ?

সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

ব্রজদাসী হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অন্ন-পথ্যের দিন ব্রজদাসী প্রথমেই দুলালের হাতে তুলিয়া দিল—

গোপালের নৈবেদ্যের একটি আতপ কণিকার প্রসাদ। বলিল—আগে প্রসাদ মুখে দে! প্রসাদী হাত মাথায় বুকে পেটে বুলিয়ে নে।

দুলাল ভক্তি সহকারেই প্রসাদ কণিকা লইয়া—ভাতের থালা টানিয়া লইল। পুরানো মিহিচালের ভাত, নিরামিষ ঝোল একটু দুলালের মনে হইল অমৃত।

ব্রজদাসী ছোট একটি পাথর বাটীতে একটু আমসত্ত্ব গুলিয়া নামাইয়া দিল। বলিল—বাতাস দেব ভাতে? গরম রয়েছে অনেকটা!

দুলাল চোখ বুজিয়া রসাস্বাদন করিয়া খাইতেছিল। সে এ কথার জবাব না দিয়া হঠাৎ বলিল—বুঝলি মা, অনেক ভাবলাম এ—ক'দিন।

—কি?

—তোর কথাই শুনব। বুঝলি!

ব্রজদাসী কথাটা ঠিক ধরিতে পারিল না, তবুও তাহার মন এ কথায় যেন আনন্দে ডগমগ করিয়া উঠিল। ছোট এতটুকু কথা, কিন্তু আজ ব্রজদাসীর কাছে কথাটা অনেক। দুলাল আজ অন্নপথ্য করিতেছে মন তাহার প্রসন্ন হইয়াই ছিল, সেই প্রসন্নতার উপরে আনন্দের স্পর্শ যেন দিঘীর স্থির শান্ত কালো জলে দক্ষিণা বাতাসের প্রবাহে হিল্লোল বহাইয়া দিল। আলোর ছটার একটা ঝিকিমিকি তুলিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। কৌতুক চঞ্চল হইয়া ব্রজদাসী কথাটা সঠিক না বুঝিয়াও ছেলেকে ঠাট্টা করিয়া বসিল—বলিল—আঃ—হায়—হায়—রে! সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলিতেও ভুলিল না।

দুলাল সবিস্ময়ে ভ্রূ কুঁচকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি?

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ব্রজদাসী বলিল—আর আমি বাঁচব না! বুঝতে পারছি দিন আমার ফুরিয়েছে! এইবার আমি মরব।

—কেন? মরবি কেন? হ'ল কি যে মরবি?

—তুই যে আমার কথা শুনবি। আর আমি বাঁচি! এত সু আমার ভাগ্যে ভোগ করা আছে?

দুলাল রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল। সে কোন কথা না বলি গ্রাসের পর গ্রাস মুখে তুলিয়া চলিল।

ব্রজদাসী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে দুলাল বলিল -যা—তবে তোকে আমি বলব ন কথাটা!

—কথা শুনবি মায়ের তার আর বলবি কি?

—বলতাম। তা' আর বলব না। তোর ভারী বাড় বেড়েছে সব তাতেই ঠাট্টা।

—আচ্ছা—আচ্ছা। আর ঠাট্টা করব না। কি বলছিলি বল।

—না। কিছুতেই বলব না।

ব্রজদাসী খুব গ্রাহ্য করিল না। এ কথা দুলালের মুখে তো নূতন নয়। রাত্রি করিয়া বাড়ী ফেরা লইয়া মায়েপোয়ে ঝগড়া দুই চারিদিন অন্তর নিয়মিতই হইয়া থাকে। ব্রজ যেদিন কাঁদে—সে দিন দুলাল ওই কথাই বলে—আচ্ছা—আচ্ছা। তোর কথাই শুনব। সকাল-সকালই বাড়ী ফিরব। দিন তিনেক বড় জোর চার পাঁচ দিন সকাল সকাল ফিরিয়া আবার সেই যথা নিয়মে এক প্রহর রাত্রি শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতে সুরু করে দুলাল। ব্রজদাসী এঁটো বাসন লইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। দুলাল রাগ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরেই চেঁচামেচি সুরু করিয়া দিল।—আমার পকেটে যে সিগারেট ছিল কি হ'ল? নতুন বাক্স ছিল। জন্মাষ্টমীর দিন ঘরে থাকব বলে কিনে এনেছিলাম। কি হ'ল?

ব্রজ আসিয়া কুলুঙ্গী হইতে ন্যাকড়ার একটা মোড়ক খুলিয়া কল্কটা বাহির করিয়া দিয়া বলিল—এই নাও বাবা। ও জিনিষ তোমার নেবে কে ? বর্ষার বাতাস লেগে মিইয়ে যাবে বলে—আমি ন্যাকড়ায় জড়িয়ে রেখেছিলাম।

দুলাল এবার খুসী হইয়া উঠিল। রাগটাও তাহার খুব অকৃত্রিম ছিল না। রাগের কথাও কিছু ব্রজদাসী বলে নাই, তবে দুলালকে লজ্জা দিয়াছিল, লজ্জা পাইয়াই দুলাল রাগ করিয়া সে লজ্জা ঢাকিতে চাহিয়াছিল। এবার সে খুসী হইবার সুযোগ পাইয়া—খুব বেশী রকমে খুসী হইয়া উঠিল, মায়ের হাতখানা ধরিয়া টানিয়া বলিল—লক্ষ্মী মা—রে আমার লক্ষ্মী মা।

—ছাড়—ছাড়!

—ব'স্—ব'স্—। শোন সেই কথাটা।

—বল্।

—অনেক ভেবে দেখলাম—এ—কদিন। বুঝেছিস! তোর কথাই ভাল। বোষ্টুমের ছেলে—নিজের জাত-ধম্ম মেনেই চলা উচিৎ। ও ভগবান বল্ ভূত বল্ বুঝলি কিনা—আছে বললেই আছে—নাই বললেই নাই।

ব্রজ ছেলেকে আর বলিতে দিল না, গভীর আবেগে তাহার মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিল।

—আঃ আমাকে বাঁচালি বাবা, আমাকে বাঁচালি দুলাল!

দুলাল আনন্দে হাসিল। স্বভাব মত হা—হা করিয়া হাসিল না, নিঃশব্দে হাসিল।

ব্রজ বলিল—দেখবি, তোর ভাল হবে। পরে বুঝতে পারবি।

আবার বলিল—ভগবান—গোবিন্দ—শ্যাম—ওঁর চরণ ছাড়া আশ্রয় আছে আর?

আবার বলিল—ভগবান আছেন। নাই,—একথা যে বলে তার চেয়ে দুর্ভাগা আর নাই দুলাল!, মা-মরা ছেলেও তো সংসারে বাঁচে। সংসারে যারা ভগবান মানে না—তাদের বাঁচা ওই মা-মরা ছেলের মত বাঁচা!

কথাটা বলিয়াই ব্রজদাসী শিহরিয়া উঠিল। বলিয়া উঠিল—গোবিন্দ গোবিন্দ! জয় রাধে গোবিন্দ!

দুলাল বলিল—তুই তা হলে মরেছিলি এতদিন? আজ বাঁচলি!

দুলাল ব্রজদাসীর মুখের দিকে চাহিল।

—আমি তো জানতাম না এতদিন ভগবানকে! এতদিন তা হ'লে ভুত হয়েছিলি। আজ আবার বাঁচলি।

ব্রজ হাসিল। বলিল—হ্যাঁ রে নামের যে গুণই ওই। 'নামের গুণে গহন বনে মৃততরু মুঞ্জরে।'

দুলাল হঠাৎ বলিল—আমি কিন্তু সিগরেট খাব। বলতে পাবে না বষ্টমের ছেলে খেতে নাই।

—না রে না। তা বলব না। বৈষ্ণব মহান্ততে গাঁজা খায়। খেতে বারণ শুধু মদ।

—তা জানি। তবে তোমার ওই গুরুটি ওই নরোত্তম দাস বাবাজী ওটি যে কঠিন লোক। উনি যে পান পর্য্যন্ত খান না। তার চেলা হয়েছ—বিশ্বাস কি তোমাকে—কোন দিন—বলতে পার।

—না তা বলব না। ব্রজ হঠাৎ ছুটিয়া গেল, চড়ুই পাখীর ঝাঁক নামিয়া পালংশাকের কচি পাতাগুলি কাটিতে সুরু করিয়াছে। ওরে বাপ্‌রে—বাপ্‌রে।

ব্রজ ছুটিয়া ছুটিয়া ছোট চঞ্চলা মেয়েটির মত চড়ুই পাখী তাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। মনের আনন্দ আজ তাহার আগুন দেওয়া তুবড়ির

ফুলের মতই উচ্ছ্বসিত বেগে, উপরে উঠিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে রূপালী সোনালী ফুলের মত।

সন্ধ্যায় দুলালকে সে আসরে নিজের পাশে লইয়া বসিল। আরতির সময় তাহার হাতেই দিল কাঁসর। দুলাল বিপদে পড়িল। ব্রজদাসীর ছেলে হইয়াও তাহার তাল জ্ঞান নাই। কোন মতেই ঠিক সময় সমান রাখিয়া ঘা মারিতে পারে না।

মহেশ হাসিল। কাঁসরখানা দুলালের হাত হইতে লইয়া গোবিন্দ পালের হাতে দিল।—বাজাও। ও আমারই মত তালকাণা।

আরতির শেষে কীর্ত্তন গানের সময়ও ব্রজদাসী তাহাকে পাশে লইয়া বসিল। গানের সময় দুলাল মায়ের পাশে থাকিতে ভালবাসে। গান তাহার আসে না, কণ্ঠস্বর কর্কশ, তাল জ্ঞান নাইই—তবু ব্রজদাসী গান গাহিলে সে নীরব হইয়া শোনে—আর আপন মনেই দোলে, এ দোলাটা কিন্তু ঠিক তালে তালে দুলিয়া যায় সে, বিন্দুমাত্র ভুল হয় না।

গান শেষ হইলে ব্রজদাসী মহেশ মণ্ডলকে বলিল—তুমি একটু থেকে যেয়ো মোড়ল। আমার ক'টা কথা আছে।

সকলে চলিয়া গেলে ব্রজ গোপালের মন্দিরের দরজায় বসিয়া বলিল—দুলাল আমার কাছে কথা দিয়েছে মোড়ল—সে আর ওসব বাস টাঁসের চাকরী করবে না।

মহেশ বলিল—আমি তো অনেক আগেই বলেছি মা-জী, ওই দিকেই যখন ওর মতি তখন চাকরী না-করে—একখানা বাস কিনে—

—না মোড়ল। দুলাল আমার ভগবানের সেবাই মাথায় তুলে নেবে। ওসব চাকরী ছেড়ে দেবে, এখন আখড়াতে আমার কাছেই কিছুদিন সেবার খুটি নাটি শিখুক, তারপর মানগোবিন্দপুর পাঠিয়ে দেব—কি

নবদ্বীপে পাঠিয়ে দেব—সেখানে দীক্ষা নিয়ে পড়াশুনা করে ফিরবে। কিন্তু তার আগেই আমি ওর বিয়ে দিতে চাই মোড়ল—

বিয়ে ?, দুলালের—। মহেশ যেন কথা বলিতে গিয়াও পারিল না ! একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। ভগবান তোমার ইচ্ছাই সব।

ব্রজ বলিল—না ওসব কথা শুনব না আমি। ভাল একটি মেয়ে দেখে মালাচন্দনের ব্যবস্থা কর। ওকে আমি ভাল করে বাঁধব।

মহেশ চুপ করিয়া রহিল।

ব্রজ বলিল—না, চুপ ক'রে থাকলে হবে না। তুমি যা ভাবছ তা আমি জানি। কিন্তু যে ক'রে হোক এটি করতেই হবে।

—বাবাজীকে আমি শুধাব ব্রজ।

—আমি কলঙ্কের পশরা মাথায় তুলে নিয়েছি মোড়ল। আবার ওর জন্যে যে জাতের মেয়ে হোক, তাকে বউ ক'রে ঘর করতে রাজী আছি। টাকা দিয়ে কিনে আনতে হয় কিনে আন তুমি। সংসারে দুলালের মত আরও অনেকেই তো জন্মায় মোড়ল। শুধু মেয়েটি একটু সুশ্রী হলেই হ'ল। এ আমি করবই। বাবাজী বারণ করলেও আমি শুনব না। আর তুমি যদি না এগিয়ে এস এ কাজে, তবে আমিই পা পাড়াব। আমিই খুঁজে আনব মেয়ে।

মহেশ মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। এত কথার পরেও হাঁ—না, কিছু বলিল না—অথবা বলিতে পারিল না। ব্রজদাসী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল—আজ আমার ইচ্ছে হচ্ছে কি জান? পরমুহূর্ত্তেই সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিল—থাক্ পৃথিবীতে আমাকে যে যত দুঃখ দেয় দিক, আমি কাউকে দুঃখ দেব না। আচ্ছা তুমি এখন এস মোড়ল। দুলাল একা আছে আমি যাই।

সে উঠিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

পাঁচ

ব্রজদাসী মহেশ মণ্ডলকে বলিল—কলঙ্কের পসরা মাথায় লইয়া সে দুলালকে কোলে পাইয়াছে, কিন্তু সে কলঙ্কের সত্য মূল্য কি সে কথা ব্রজদাসী জানে; লোকে সত্য জানে না—তবে অনুমান করে। অনুমান কেন ব্রজ নিজেই বলিয়াছিল একদিন—"বৈষ্ণবীর দেহ-মন প্রভুর চরণে উৎসর্গ করতে হয়; এ দেহ শুধু গন্ধপুষ্প ফুটে ভক্তির চন্দনে লিপ্ত হয়ে তাঁর চরণ তলে পড়ে শুকিয়ে যায়। এতে তো ফল হবার কথা নয় বাবা। কিন্তু"—বিচিত্র হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল... বলিয়াছিল—"কিন্তু আমার ভাগ্য অদ্ভুত আর প্রভুর লীলা অদ্ভুত—তাই সেই পূজো করা ফুলেও ফল ধরল! কি করব বলুন বাবা! তবে হ্যাঁ—মানুষকে দেখলাম—মানুষই দেবতা—আপনাদের মাঝেই আমার প্রভুর বাস—তাই করুণার অভাব হল না. কোনদিন দুঃখ পেলাম না; কোনদিন আপনারা জিজ্ঞাসা করলেন না, ওগো বোষ্টমের মেয়ে এ তোমার কেমন ধারা, এ কি আচরণ, প্রভুর চরণে সকল ফল সমর্পণ হ'ল তোমাদের ধর্ম্ম কিন্তু তোমার কোলে ফল? ছি—ছি ফল সঁপতে গিয়ে ফল চুরি করেছ তুমি।" আবার বলিয়াছিল—"শুধু তাই নয় বাবা—ধিক্কার দেওয়া দূরের কথা, পাপের ফল বিষ ফল ব'লে—দূরে ফেলে দেওয়া দূরের কথা, আপনারা সমাদর ক'রে মাথায় ক'রে নিলেন। আপনারাই আমার দেবতা। শুধু যার পাপে আজ আমার—।" বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়াছিল, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল—"না, আজ কাউকে দোষ দেব না বাবা, নিজেকেও গাল দেব না, ভুল—পাপ হয় মানুষের মনের ভুলে; সে ভুলের সাজা ভগবান মানুষকে

দেয় না—সে সাজা মানুষ নিজেই নেয় ; আমি যেমন নিচ্ছি, সেও তেমনি নিচ্ছে। আমার প্রভু তাকে মার্জ্জনা করুন। হে গোবিন্দ—তুমি তাকে মার্জ্জনা করো।" হাত জোড় করিয়া সে প্রণাম জানাইয়াছিল প্রভুর চরণে।

ব্রজদাসী তাহার ধর্ম্ম অনুযায়ী তাহার অন্তরের উপলব্ধি মত কথাটা সত্যই বলিয়াছিল। এ গ্রামে গোপালের আখড়া স্থাপন করিয়া যেদিন নরোত্তম দাস বাবাজী তাহাকে আখড়ার সেবার ভার ও সর্ব্বময় কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন সে দিন ব্রজদাসী মনে মনে শঙ্কিত হইয়াছিল ; ভাবিয়াছিল এই লইয়া গ্রামে এবং গ্রামান্তরের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা কুৎসিৎ আন্দোলন হইবে। বাবাজীকে এবং মহেশ মণ্ডলকে সে ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছিল—না কাজ নাই। আমি বরং আখড়ার দাসীর মত থাকব! আমার কলঙ্ক আমি সইতে পারব। কিন্তু ওই দুগ্ধপোষ্য শিশু ও যদি মনে দুঃখ পায়—ব্রজদাসী কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

নরোত্তম দাস বাবাজী হাসিয়া বলিয়াছিলেন—তুমি মিথ্যে ভয় করছ ব্রজ। একটা কথা তুমি জান না। কিম্বা ইচ্ছে করে ভুলে যাচ্ছ। তুমি এখানকার লোকের চিত্ত জয় করে বসে আছ। প্রভু আমার শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ব্রজদাসী, কলঙ্ক তোমার মাথায় দিয়েছেন—তোমাকে আরও মনোরমা করবার জন্যে। চাঁদের অঙ্গে কলঙ্কের জন্যই চাঁদকে লোকে বেশী ভালবাসে। তোমার রূপ আর কণ্ঠ দিয়ে তুমি মানুষের মন জয় করেছ—তোমার কলঙ্ক নিয়ে লোকে কথা কয় আড়ালে—কিন্তু তার জন্যে ঘৃণার চেয়ে করুণা পাও বেশী। দু চার জন আপত্তি হয়ত করবে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই খুশী হবে। তুমি দেখো।

বাবাজীর কথাই সত্য হইয়াছিল। গ্রামান্তরের দুই চারজন

মহান্ত আসেন নাই প্রতিষ্ঠা উৎসবে, তা ছাড়া সকলেই আসিয়াছি।। খুশী হইয়াছিল!

ব্রজদাসী সেই সাহসে বলিল—'আমি নিজে খুঁজে আনব মেয়ে। দুলালকে সে বাঁধিবে। বৈষ্ণবী ব্রজদাসীর চোখে একটা ছবি ভাসিয়া উঠে। তাহার বাপের আখড়ায় উঠানের মধ্যস্থলে একটি বকুল গাছ ছিল, সেইগাছটার দুই পাশে ছিল দুইটি লতা, মাধবী আর মালতী। বকুলের কাঠ শক্ত কাঠ, ওই শক্ত কাঠের কাণ্ডটায় ওই লতা দুইটী এমন পাকে পাকে জড়াইয়াছিল যে গাছটা লোহার শিকলে বাঁধা মানুষের মত আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সারাটা কাণ্ডের উপরের মোটা ডালগুলিতে লতার পাক কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া গিয়াছিল। সে শুধু লজ্জা পায় নিজের কাছে, ধিক্কার দেয় নিজেকে, মনে হয় সে জড়াইয়া ধরিতে পারে নাই—তাই তাহার পাক খসিয়া পড়িয়াছে; তাহাকে পথে বাহির হইতে হইয়াছে। সে তাই মনে মনে সংকল্প করিল—শক্ত মেয়ে যে মেয়ে পাক দিয়া জড়াইয়া ধরিতে পারিবে এমন মেয়ে সে খুঁজিয়া আনিবে। যাহার রূপে থাকিবে মাধবী ফুলের মাধুরী—বেষ্টনে থাকিবে মাধবীলতার পাকের দৃঢ়তা। একবার জড়াইয়া দিতে পারিলেই ব্রজদাসী নিশ্চিন্ত। ইহাতে নরোত্তম দাস বাবাজী নিষেধ করিলেও সে শুনিবে না। মহেশ মণ্ডলের উপর তাহার রাগ হইয়া গেল—তাহার কথা সে মনেই আনিল না।

দুলাল সম্পর্কে তাহার একটি কল্পনা আছে। সন্তান সম্পর্কে বৈষ্ণব মায়ের অতি স্বাভাবিক—অতি সাধারণ কল্পনা একটি।

জাতিধর্ম্ম, কৌলিক সাধনা, নিজের জানা-ও-চেনা পৃথিবীর সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ মানুষের ছবি—এই সমস্তের সঙ্গে মিলাইয়া সে রচনা করিয়াছিল তাহার সাধ। দুলাল তাহার গুরুগিরি করিবে। এক জন গোস্বামী

মহান্ত হইবে। নরোত্তম দাস বাবাজী তাহার গুরুতুল্য, কিন্তু নরোত্তম দাস বাবাজী তাহার আদর্শ নয়। নরোত্তম দাস বাবাজীর খানিকটা সে যেন বুঝিতে পারে না, ধরিতে পারে না। ইংরাজী লেখাপড়া জানা এতবড় চাকুরে মানুষ সব ছাড়িয়া মনে প্রাণে বৈষ্ণব হইয়াছেন—বেশ ভূষায় কথায় বার্ত্তায় ভাবে ভঙ্গিতে সে আমলের সব কিছু পরিত্যাগ করিয়াছেন—তবুও যেন কোথায় খানিকটা কিছু আছে সেটুকু ব্রজদাসী তাহাদের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। সেইটুকু বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠে যখন বাবাজীর ছেলে বাপের সঙ্গে দেখা করিতে আসে। তখন আর একটা মানুষ বাহির হইয়া আসে বাবাজীর ভিতর হইতে। বাবাজীর আখড়াতে তখন ঢুকিতে ভয় হয় ব্রজদাসীর! তাই নরোত্তম দাস বাবাজী তাহার কল্পনা নয়।

বহুদিন পূর্ব্বে নবদ্বীপ ধামে সে দেখিয়াছিল এক তরুণ গোস্বামীকে। কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ, সুস্থ সুন্দর দেহ, তেমনি কমনীয় কান্তি, বড় বড় চোখে প্রশান্ত দৃষ্টি, কামানো মুখ, কামানো মাথা, গলায় মোটা তুলসীর কণ্ঠী, কপালে তিলক, নাকে রসকলি—সে যেন মানুষটি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে পৃথিবীতে কলহ-কোলাহলের মধ্যে ভাষার মধু বিলাইয়া দিতে। সে কি মধু—কণ্ঠস্বরে মধু—উচ্চারণে মধু—ভঙ্গিতে মধু—তেমনি কি বাছাই করা মধুর প্রতিটি শব্দ। এক সন্তানহারা মাকে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে দেখিয়াছিল, তাঁহারও চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, মধ্যে মধ্যে দুই-চারিটি কথা বলিতেছিলেন পরের দিন দেখিয়াছিল—জননীটির কোলে মাথা দিয়া তিনি শুইয়া আছেন; সন্তানহারা মা—হারানো সন্তানকেই যেন ফিরিয়া পাইয়াছেন, সস্নেহে হাত বুলাইতেছেন গুরুর সর্ব্বাঙ্গে। বৈষ্ণবের মেয়ে সে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে এই তত্ত্বে। বুদ্ধি দিয়া বিচার

বা যাচাই করিতে কোন দিন যায় নাই, এক জনকে সাধনার সঙ্গী করিতে গিয়া সে ঠকিয়াছে, তবু সে বিচার করে নাই, হৃদয় দিয়া বিশ্বাস করিয়াছে—যে তাহাকে ঠকাইয়াছে, ঠকিয়াছে সেই; ঠকিয়া যে দুঃখ সে পাইয়াছে, সে দুঃখ সোনা হইয়া জমা হইয়া আছে তার বুকে। ওই হৃদয়ের বিশ্বাস—বলেই ওই গুরুটিকেই তাহার সুন্দর মনে হইয়াছে—পবিত্রতম মানুষ মনে হইয়াছে—কতবার নিজেকেই শুনাইয়া বলিয়াছে—যে ছেলে-হারানো মায়ের খালি বুক ভরিয়া দিতে পারে—পুত্রশোকের শূল-বিদ্ধ চোখের অশ্রুধারার ছিদ্র পথ অমৃত-কাজল পরাইয়া নিরাময় নিরশ্রু করিয়া তুলিতে পারে, তাহার চেয়ে বড় কে—এর চেয়ে মধুর মানুষ কে?

তাহার দুলাল এমনি একটি মানুষ হইবে। এমনি গুরু গোস্বামী! দুলালের রং কালো। রূপের দিক দিয়া তাঁহার সঙ্গে তুলনা করা যায় না, কিন্তু এমনি শিক্ষা—এমনি স্বভাব—এমনি হৃদয় যদি তাহার হয়, তবে ওই কালো মানুষের মধ্যেই রূপ ফুটিয়া উঠিবে নীল কাচের বাতিদানের স্নিগ্ধ শান্ত শিখার মত। সে হইবে বর্ষার সতেজ দুর্ব্বা ঘাসের মত। শ্যাম স্নিগ্ধ কোমল, এমনি নমনীয় এমনি কমনীয়—মাড়াইয়া গেলেও ফুটিয়া ব্যথা দিবে না; অথচ আসল স্থান হইবে তাহার মানুষের মাথার উপর। কল্যাণের আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবে সে অজস্র ধারায়। লেখাপড়া শিখিবে, চরিতামৃত পড়িবে, ভাগবত পাঠ করিবে, লোকে মুগ্ধ হইয়া শুনিবে। দুলালের কণ্ঠস্বর ভাল নয়, গানের গলা তাহার হইবে না এটা সে বুঝিয়াছে—কিন্তু পদাবলী কণ্ঠস্থ থাকিবে, গাইতে না পারুক, সুরের রেশ গলায় আনিয়া আওড়াইয়া যাইতে তো পারিবে! দুঃখী জনকে বলিতে তো পারিবে—মহাজনের বাক্য মা, সংসারের এই তো সার সত্য। চণ্ডীদাস প্রভু দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া

প্রণাম করিয়া বলিবে—সব মহাজনের সেরা মহাজন বলেছেন ।ক জান ?

সুখ দুখ—দু'টি ভাই।
কহে চণ্ডীদাস—শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দু'টি ভাই।
সুখের লাগিয়া—যে করে পিরীতি
দুখ যায় তারই ঠাঁই ॥"

তাহার পর নবদ্বীপের সেই গোস্বামী প্রভুর মতই বিচিত্র হাসি হাসিয়া বলিবে—মা গো, অন্ধকারে মানুষ থাকতে পারে না। রাত্রে ভাবে কখন দিনমণির উদয় হবে। আলো ফোটে—পৃথিবীতে জীব-জন্তু কীট-পতঙ্গ মানুষ কলরব করে ওঠে কি আনন্দ—কি আনন্দ বলে, বৃক্ষ-লতায় ফুল ফুটে ওঠে। মা, ভেবে দেখ, অন্ধকার তখন সকলের দেহকে ঘিরে জড়িয়ে ধরে, দেখো মা, তুমি চলবে—তোমার পিছনে পাশে চলবে তোমার ছায়া, গাছের তলায় দাঁড়াবে ছায়া—সে তো ওই অন্ধকারই মা। আরও ভেবে দেখ—ওই আলোই তাকে ফোটায়। সুখ আর দুখ—আলো আর অন্ধকার—যমজ দু'টি ভাই। এড়ানো যায় না মা। কথাগুলি সেই নবদ্বীপের গোস্বামীর কথা—ব্রজদাসীর আজও কণ্ঠস্থ হইয়া আছে।

এমনি কল্পনা সে করে তাহার দুলাল সম্পর্কে। গোস্বামী হইলে কি নাম হইবে দুলালের সে পর্য্যন্ত সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে—'গোপালদাস গোস্বামী।

ব্রজদাসীর সেই পুরানো কল্পনা আজ আবার নূতন করিয়া মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। চোখে তাহার জল আসিল। বৈষ্ণবী সে-সে তো জানে বহুভাগ্যের এই মানব জন্ম সার্থক—অসার্থক হয় জীবনের

কর্ম্মফলে। হতভাগ্য দুলাল। এই বহুভাগ্যের মানব জন্মে সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে পাপের পথে। পাপ তাহার রক্তের কণায় কণায় বন্যার জলের আবিলতার মত মিশিয়া রহিয়াছে। প্রবল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই বেগের মুখে বাঁধ দিয়া ব্রজদাসী তাহাকে সরোবরের মত বাঁধিবে। ধীরে ধীরে সমস্ত আবিলতা ময়লা—মাটি থিতাইয়া নিচে বসিয়া যাইবে, জীবনের রক্তধারা হইবে নির্ম্মল—কাজল দীঘির জলের মত শান্ত স্নিগ্ধ স্বচ্ছ, তখন তাহাতে ফুটিবে—ওই যে পাপ—ওই পাপের পাঁক হইতে ফুটিয়া উঠিবে পদ্ম। এই প্রবল বন্যার মুখে সে দিবে মাটির বাঁধ। মনে পড়ে তাহার প্রথম জীবনের গুরুর কথা। বাউল বলিত—জান গো—এই মাটি আর তোমরা কোন প্রভেদ নাই! প্রভু আমার বৈকুণ্ঠ থেকে নেমে এলেন প্রেম—শান্তি—মুক্তির ধারার মত। ধরবে কে তাকে? মা গঙ্গা স্বর্গ থেকে নেমে এলেন—মাথা পেতে তাকে ধরলেন—ভোলা মহেশ্বর। আমার প্রভুকে ধরবে কে? তাঁকে ধরলেন—মা যশোদা, কোল পেতে দিলেন। তারপর? কোলেই তো তিনি বাঁধা থাকবেন না? তাঁকে দুই হাত বাড়িয়ে দুই তীরের মত ধরবে কে? ধরলেন—শ্রীমতী। জয় রাধা! জয় রাধা! জয় রাধা! গোবিন্দ আমার মুক্তি শান্তি প্রেমের স্রোত—রাধা আমার তীর। তাই তো যত ভাঙনের দুঃখ আমার শ্রীমতীর বুকে গিয়ে লাগে।

দুলালকে সে কোল পাতিয়া ধরিয়াছে। এইবার চাই তাহাকে বাঁধিবার মত দুখানি হাত। একটি কিশোরী মেয়ে! কণ্ঠস্বর হইবে মিষ্ট। রূপসী মিলিবে না—কিন্তু শ্রীমতী মেয়ে খুঁজিলে মিলিবে। মাজিয়া ঘষিয়া সে তাহার রূপকে বাহির করিবে।

নিজের যৌবন কালের কথা মনে পড়ে।

রাধা গোবিন্দকে কেন্দ্র করিয়া সে কি আনন্দ, সে কি লীলা মাধুরীর

রসের তন্ময়তা! দোল যাত্রায়—বাসন্তী পূর্ণিমায়। পুষ্পসজ্জা—রঙের পিচকারী লইয়া খেলা, ঘোর বর্ষায়—শ্রাবণ পূর্ণিমায় মেঘ ঢাকা চাঁদের কুয়াসার মত জ্যোৎস্নায় ঘরের মধ্যে ঝুলনা ঝুলাইয়া খেলা—সে সব এক স্বর্গ সুখের স্মৃতি! ভাবিতে গেলে আজও শরীর যেন আবেশ বিবশ হইয়া যায়, চোখে জল আসে। সেই রসাস্বাদনের মধ্য দিয়া দুলালকে সে রাধাশ্যামকে চিনাইয়া দিবে। একবার চিনাইয়া দিতে পারিলে—আর ভয় নাই। মানুষের মন ভ্রমরের মত—পদ্মের সন্ধান যতক্ষণ না পায় ততক্ষণ সে ছুটিয়া বেড়ায় ফল ফসলের ক্ষেতে-ক্ষেতে। কিন্তু পদ্মের সন্ধান পাইলে সে আর ফেরে না। ওই পদ্ম বনেই গুণ গুণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—ক্লান্ত হইলে ওই পদ্মপাতায় ঘুমাইয়া পড়ে। পদ্ম তুলিতে গিয়া কত পদ্মদলের মধ্যে মরা ভ্রমর ব্রজ দেখিয়াছে।

পরদিন হইতেই সে মেয়ের খোঁজ সুরু করিল।

দুলালকে খাওয়াইয়া সে বলিল—তুই থাক বাবা, নিজেই একটু চা করে খাস। আমি আজ একবার ঘুরতে যাব।

—ঘুরতে যাবি? কোথা?

ব্রজ কথাটা ভাঙিল না। বলিল—এই বাবা, পাঁচটা গেরস্ত বাড়ীতে মায়েদের সঙ্গে ভাবসাব আছে; ভালবাসেন, দয়া করেন;—তোর আজ দুমাসের ওপর অসুখ—যেতে পারি নাই। একবার যাই ঘুরে আসি—দেখা ক'রে আসি।

দুলালের ভুরু দুইটা কুঁচকাইয়া উঠিল—মায়ের এই ধরণ এই প্রবৃত্তিটা সে মোটেই বরদাস্ত করিতে পারে না। 'ভালবাসেন'—বেশ কথা, দয়া করেন কি? দয়ার কি ধার ধারে তাহারা? কি প্রয়োজন দয়ার? কি অভাব আছে তাহাদের? আর অভাবই যদি থাকে—তবে সে অভাবের

জন্য পরের কাছে হাত পাতিবে কেন? এইজন্য—এইজন্যই তাহার মাথা ন্যাড়া করিয়া তিলক কাটিয়া কণ্ঠী পরিয়া মহান্ত হইতে ঘোরতর আপত্তি! এই করিয়া—এমনই অভ্যাস হইয়াছে তাহার মায়ের—যে—অভাব না থাকিলেও ভিক্ষা না করিলে তাহার তৃপ্তি হয় না। হরি বলিলেই এক মুঠা চাল,—ওই একমুঠা চালের জন্য তাহার মায়ের লোভের অন্ত নাই!

ব্রজ হাসিয়া বলিল—খোকনের আমার মা দু'দণ্ড বাইরে গেলেই সব অন্ধকার। বেশী দেরী করব না আমি। বিকেলেই ফিরব। এসে সন্ধ্যে জ্বালব, আরতি আছে—

—না—না। দুলাল গর্জ্জন করিয়া উঠিল।—তার জন্যে নয়।

—তবে কি?

—আমার মাথা—আর তোর মুণ্ডু। যেতে পাবি না তুই। ভিক্ষে করবি কি? কিসের জন্যে ভিক্ষা করবি? অভাব কি তোর?

—ভিক্ষে বৈষ্ণবের ধর্ম্ম দুলাল। অভাবের জন্য নয় বাবা। রাজা রাজ্যপাট ছেড়ে ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে প্রভুর নাম নিয়ে পথে বের হন। ও না হ'লে তাঁকে বুকের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁরও দয়া হয় না।

—যা—যা বাপু যেখানে যাবি। যা করবি কর গে। কানের কাছে তত্ত্বকথা বকিস না।

সে একটা সিগারেট ধরাইয়া টানিতে সুরু করিল।

ব্রজদাসী ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিল, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

দুলাল একা বসিয়া ওই কথাই ভাবিতে লাগিল। গোটা আখড়াটা যেন রাত্রির পৃথিবীর মত স্তব্ধ, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে যেন! গরমিলের মধ্যে দুই চারিটা পাখী কল কল করিতেছে আর গোটা চারেক কাঠবিড়ালী

চিক্ চিক্ শব্দ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। মধ্যে মধ্যে দুইটা কাক সুযোগ মাফিক ছোঁ মারিয়া কাঠ বিড়ালী গুলিকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে! আশ্চর্য্য চাতুর্য্যের সঙ্গে কাঠবিড়ালীগুলি আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছে; কাক ছোঁ মারিবার সঙ্গে সঙ্গেই খানিকটা সরিয়া গিয়া কোন গাছের আড়ালে বা লাফ দিয়া গাছটার কাণ্ডের উপর উঠিয়া পড়িয়া লেজ ফুলাইয়া দাঁত দেখাইয়া খানিকটা নাচিয়া ছুটিয়া পলাইতেছে।

দুলাল ভাবিতেছিল—বৈষ্ণব মহান্ত হওয়ার কথা। ন্যাড়া মাথায় এক গোছা টিকি, গলায় তুলসীর মালা, নাকে কপালে তিলক সমেত নিজের রূপ কল্পনা করিতে গিয়াই তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। পরনে খাটো থান কাপড়ের বহির্বাস! দূর! কিম্বা মাথায় লম্বা চুল রাখিয়া দাড়ি গোঁফ রাখিয়া আলখাল্লা পরিয়া কিম্ভুত-কিমাকার চেহারা করিয়া;—দূর!

আর এই বিনাইয়া বিনাইয়া কথা বলা—যাহার সঙ্গে দেখা হইবে তাহাকেই সবিনয়ে প্রণাম করিয়া প্রভু বলিয়া সম্বোধন করা;—দূর!

এক একবার এক একটা ছবি কল্পনা করিল—আর সরবে দূর—দূর করিল—পাগলের মত। তাহাতে কাক দুইটা পলাইয়া গেল।

দুলালের কল্পনা—মায়ের কল্পনার বিপরীত।

সে বাসের ড্রাইভার হইবে। মোটর চালানো—ইতিমধ্যেই সে শিখিয়া ফেলিয়াছে। আজ চার বৎসর ধরিয়া গাড়ীর কাদামাটি ধুইয়াছে, ড্রাইভার মহাবীর প্রসাদের কত সেবা করিয়াছে, এঁটো বাসন ধুইয়াছে, পা টিপিয়াছে, তবে মহাবীর তাহাকে মোটর চালানো শিখিবার সুযোগ দিয়াছে। মনে আছে তাহাদের বাস্ একবার দুমকা রিজার্ভ গিয়াছিল। ফিরিবার পথে সাঁওতালপরগণার সুন্দর নির্জ্জন পথে মহাবীর খালি বাস্‌খানা প্রথম তাহার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ওঃ সে কি আনন্দ—

সে কি ফুর্ত্তি। বিলকুল ভুলিয়া যেন লাটুর মত তাহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল! হু—হু করিয়া পাশের মাঠ পিছনে ছুটিয়া চলিল! অদ্ভুত একটা আনন্দ।

এ সব ছাড়াও আছে।

এই আখড়া হইতে বাহির হইয়া ডাহুকী বহুকী পার হইয়া ক্রোশ খানেক মাঠের পরে এক বিচিত্র পৃথিবীর সন্ধান সে পাইয়াছে, চঞ্চল-দুরন্ত-কোলাহল-মুখর-উগ্র যুদ্ধমান এক পৃথিবী। কিছু না-কিছু সেখানে অহরহই লাগিয়াই আছে। এই শান্ত নির্জ্জীব দীনতায় নত ভীরু গ্রাম-গুলি হইতে সে সম্পূর্ণ রূপে স্ব-তন্ত্র: একেবারে পৃথক পৃথিবী।

সেখানে প্রায় প্রত্যেকটি আবর্ত্তের মধ্যে দুলাল আছেই। সেখানে দুলাল—দুলাল নয়, সে সেখানে বিরিজনন্দন;—নামটা সে নিজেই লইয়াছে। ব্রজদাসীর বেটা সে বিরিজনন্দন!

—মা—জী। মা—জী রয়েছেন? মহেশ মণ্ডল আসিয়া আখড়ায় প্রবেশ করিল।

দুলাল চমকাইয়া উঠিল।—কে? পরক্ষণেই মহেশ মণ্ডলকে দেখিয়া সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই লোকটাকে সে দু চক্ষে দেখিতে পারে না। এই মহেশ মণ্ডলকে আর ওই নরোত্তমদাস বাবাজীকে!

এক এক সময় মনে হয়—দুই জনকেই সে খুন করিয়া ফেলে।

লোক দুইটাকে লইয়া তাহার সম্পর্কে লোকে কুৎসিৎ কথা বলে বলে, উহাদের একজন কেহ তাহার জন্মদাতা!

কথাটা শুনিলে—কি মনে হইলে তাহার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। একবার এই গ্রামের জগৎ মণ্ডলের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়াছিল, লোকটা কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিল—মটরের ডাইভারি শিখে একটা মটর কিনে ফেলবি—দুলাল!

দুলাল বলিয়াছিল—চাট্টিখানি কথা নয়? মটর কেনা সোজা ব্যাপার বুঝি? দাম জান? ধান বেচে হয় না।

—হয় রে হয়। মহেশ মণ্ডলের ধান কত দেখেছিস তো? মোড়লকে বললেই মোড়ল দেবে একটা বাথার ছেড়ে, তোর মাকে বলিস—বলবে মোড়লকে—

সঙ্গে সঙ্গে দুলাল তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরিয়াছিল।

দুলাল এই কারণেই ওই বাবাজীকে আর মণ্ডলকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না। মনে হয় উহারাই তাহার জীবনের সব চেয়ে বড় শত্রু।

ব্রজদাসী ভাবে—মুখেও সে সকলের কাছে বলে মানুষেরা এত ভাল যে সমস্ত জীবন তাহাদের দাসীত্ব করিলেও তাহার জীবনের ঋণ মিটিবে না। দুলালকে কোলে লওয়ার মত এত বড় অপরাধ—দুলালের জন্মের অপরাধ—ক্ষমা করিয়াছে মানুষেরা।

ব্রজদাসীর কথা আংশিক ভাবে সত্য।

ক্ষমা করিয়াছে, ব্রজদাসীকে স্নেহ সকলেই করে—তবু কথাটা তাহারা মধ্যে মধ্যে বলে।

ব্রজদাসী জানে সে কথা। জানিয়াও ঐ কথা বলে।

দুলাল কিন্তু ভাবে বিপরীত কথা। সে বলে—হারামজাদার দল সব। শূয়ারের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা! সামনে বলতে সাহস নাই কিন্তু আড়ালে অহরহ ঐ কথা—ঐ চিন্তা ওদের। ক্ষমা! ক্ষমা না—ওই বোষ্টমী বেটীর মুণ্ডুপাত। বেটী মুণ্ডু ধূলোয় লুটিয়েই আছে। লাথি মেরে যায় লোকে—বেটী ভাবে—আশীর্ব্বাদ করছে। আমার কাছে কিন্তু ওসব চলবে না বাবা। হাম হ্যায় ব্রিজনন্দন মারে গা ডাণ্ডা—দনাদন্, দনাদন্! দুনিয়া ছোট লোকের দুনিয়া, শেয়ালে ভরা জঙ্গল; এখানে যারা বাঘ তাদেরই বিপদ। শেয়ালদের ভাল বাসলেই

সর্ব্বনাশ'। ফেলবে ফাঁদে, তারপর হুক্কাহুয়া করে মনের আনন্দে চেঁচাবে আর ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। মারো থাবা শেয়ালদের ব্যাস ঠাণ্ডা রহেগা। হাম ব্রিজনন্দন—হাম—বাঘ—কেয়া নাম হ্যায়—শের—হ্যায়!

এ অহঙ্কার দুলাল করিতে পারে।

দেহে তাহার প্রচণ্ড শক্তি। ষোল বছরের দুলালকে বিশ বাইশ বছরের জোয়ান বলিয়া ভ্রম হয়।

মনে তাহার ভয় বলিয়া কোন উপলব্ধি নাই। শৈশব হইতে সে অন্ধকার ঘরে একা পড়িয়া থাকিত। ব্রজদাসী যাইত ভিক্ষায়। বাল্যকালটা তাহার বাগ্দীদের ছেলেদের সঙ্গে ডাহুকীর তীরের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া কাটিয়াছে। বাগ্দী বুড়া রতন ক্ষ্যাপার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়াছে। বাগ্দীবুড়ার ক্ষ্যাপা মায়ের আশ্রমে মড়ার খুলি ছড়ানো থাকিত; সে তাহারই মধ্যে বসিয়া থাকিত, মড়ার খুলি লইয়া খেলা করিত, কতদিন ওইখানেই ঘুমাইয়া পড়িত।

দেহে যাহার প্রচণ্ড শক্তি, মনে যাহার ভয়-লেশহীন—সে নিজেকে বাঘের সঙ্গে তুলনা করিলে—আত্মগৌরবের জন্য নিন্দনীয় হইতে পারে কিন্তু মিথ্যা গৌরব করার জন্য উপহাসের পাত্র হয় না। লোকে দুলালের অহঙ্কারে ক্ষুব্ধ হয়—বিরক্ত হয় কিন্তু হাসিতে পারে না।

মহেশ মণ্ডল আসিতেই দুলাল ভুরু কুঁচকাইয়া ফিরিয়া চাহিল—বলিল বাড়ীতে নাই।

মহেশ যেন একটু বেশী রকমে নিরাশ হইল। বোধ হয় খুব বেশী উৎসাহ লইয়া কোন কথা বলিতে আসিয়াছিল। একটুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল বেচারা; তাহার পর বলিল—গেলেন কোথা?

—কে জানে! ভিখারীর বেটী ভিখিরী, 'স্বভাব যায় না মলে, ইল্লোত যায় না ধূলে'—ভিখ মাগতে বেরিয়েছে।

মহেশ আসিয়া দুলালের কাছে বসিল। সস্নেহে বলিল—আঃ—কি দেহ কি হয়ে গিয়েছে! বড় ফাঁড়া গেল তোর! যাক্—প্রভুর দয়ায় বেঁচে উঠেছিস—এই ভাগ্যি।

দুলাল শুধু বলিল—হুঁ।

মহেশ আবার একটু হাসিয়া বলিল—মা-জী তা'হলে কন্যের খোঁজে বেরিয়েছেন।

—কিসের খোঁজে?

—কন্যের খোঁজে। কাল রাত্রে আমাকে বললেন—দুলালের আমি মালা চন্দন দোব—মোড়ল—আপনি একটি কন্যে দেখে দেন। আমি নিজেও খুজব—আপনিও দেখুন।

দুলাল ক্রোধে এবং বিস্ময়ে চোখ দুইটাকে বিস্ফারিত করিয়া এক-দৃষ্টে মহেশ মণ্ডলের দিকে চাহিয়া রহিল।

মহেশ বলিল—তা' আমি ভেবে দেখলাম—মা-জীর এ সংকল্প—ভাল,—খুব ভাল—

দুলাল অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল—এ্যাই—ও, তুমি চুপ কর বলছি।

মহেশ চমকিয়া উঠিল। মহেশ মণ্ডল বিশাল পুরুষ, তাহার দুর্দ্দান্ত সাহস, ভয় পাইয়া চমকায় নাই সে, অতর্কিতে এমন চীৎকার শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল।

দুলাল আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—চলে যাও, চলে যাও—আখড়া থেকে তুমি চলে যাও বলছি।

—কি হ'ল কি তোর?

—কিছু হয় নি।—

—তবে এমন চেঁচাস কেন?

—বিয়ে আমি করব না। খবরদার ওসব কথা বলবে না।

—বিয়ে করবি না? অবাক হইয়া গেল—মহেশ মণ্ডল।

—না—না—না!

পরক্ষণেই সে উঠিয়া পড়িল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া নিজের ঝোলাটা ঝুলাইয়া জামাটা গায়ে দিতে-দিতেই সে আখড়া ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

মহেশ বিস্মিত বিব্রত দুইই হইল—জিজ্ঞাসা করিল—তা' চললি কোথারে বাপ্?

—মানগোবিন্দপুর।

—ওই। এই রোগা শরীর নিয়ে, দুলাল ওরে—

—এ্যা র্ত্ত্। পেছন থেকে মেলা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করো না বলছি!

দুলাল আর দাঁড়াইল না। সে মাঠের পথে বাহির হইয়া গেল।

বিয়ে! বিয়ে একটা তিলক ফোঁটা কাটা বোষ্টম মেয়েকে? সে দুলাল কখনও করিতে পারিবে না। কখনও করিবে না! দুরন্ত, দুর্দ্দান্ত প্রচণ্ড, অবুঝ দুলাল। মানগোবিন্দপুরের ওই বিচিত্র পৃথিবীতে দিবানিদ্রার অবসরে ওই পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিতে সুরু করিয়াছে।

প্রথম দিকে মানগোবিন্দপুরের বাস ড্রাইভার মহাবীর প্রসাদের চঞ্চলা মেয়েটাকে দেখিয়া তাহাকেই বিবাহ করিবার কল্পনা করিয়াছিল। তারপর মানগোবিন্দপুর হইতে বাসের সঙ্গে জেলার সহরে যাইতে সুরু করিল। সেখানে দেখিল মেয়েরা বেণী ঝুলাইয়া ইস্কুলে চলিয়াছে। অপরূপ মনে হইল। মনে হইল এ মেয়েরা বুঝি চাঁদের দেশ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। দুলাল নিজের যোগ্যতা বিবেচনা করিল না, তাহার

জাতি কুল মান মর্য্যাদা কোন কিছুরই বিচার করিল না, মনে মনে সংকল্প করিল এমনই একটি মেয়েকে সে বিবাহ করিবে। কেমন করিয়া এমন একটি মেয়েকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর তাহাও সে ভাবিল না! শুধু সে মাথায় লম্বা চুল রাখিল, তেল না দিয়া সে চুলের বোঝাকে রুক্ষ করিল, মধ্যে মধ্যে মাথা ঝাঁকি দিয়া চুলগুলাকে নাড়া দিয়া বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়া নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনোহর মনে করিল! এবং প্রকৃতিতে সে আরও উগ্র হইবার চেষ্টা করিল; প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল পৃথিবীতে সেই শ্রেষ্ঠ সাহসী।

তারপর একদিন ওই মেয়েগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিতকর হইয়া গেল তার দৃষ্টিতে। সেদিন তাহার দৃষ্টিপটে এক নূতন ছবির ছাপ পড়িয়া গেল।

শোভা দিদি কলিকাতার ট্রেণে নামিয়া বাসে আসিয়া উঠিলেন। রুক্ষ চুলে এলো খোঁপা বাঁধিয়াছেন, দীর্ঘ ট্রেণের পথে চুলগুলি অবিন্যস্ত হইয়া হাওয়ায় উড়িতেছে। মুখে কোন প্রাসাধন মার্জ্জনা নাই, তবু সে মুখে যেন কিসের একটি দীপ্তি ঝলমল করিতেছে, চোখে নীল চশমা। পরণে খদ্দরের ব্লাউস, খদ্দরের শাড়ী, কাঁধে একটা রঙীন খদ্দরের ঝোলা, পায়ে ফিতা বাঁধা চপ্পল। মেয়েটিকে দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেল। এ মেয়ে কোথা হইতে আসিল? এ কেমন মেয়ে! গল্পে আছে রূপ সরোবরের কথা। গাঁয়ের মেয়ে বনের ধারে কাঠ কুড়াইত, সেখানে ছিলেন এক মুনি; তপস্যামগ্ন মুনির চারিদিকে উই পোকায় ঢিপি বাঁধিয়াছে, চুলে জটা বাঁধিয়াছে—সে জটার উপর মাকড়সায় জাল বুনিয়াছে, তবু তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। গাঁয়ের মেয়ে তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমটা অবাক হইল তারপর ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চারিপাশের আবর্জ্জনা ঘুচাইয়া, আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া উইপোকার মাটি ছাড়াইয়া মুনির অঙ্গ

ধুইয়া মুছিয়া দিল, মাথার-জটার উপর হইতে ছাড়াইয়া দিল মাকড়সার জাল। তারপর প্রণাম করিয়া কাঠ কুড়াইয়া বাড়ী ফিরিল। পরদিন আবার আসিয়া আবার সব মার্জ্জনা করিয়া প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। এমনি নিত্য সেবা করিতে লাগিল গাঁয়ের মেয়ে। তারপর একদিন মুনির ধ্যান ভাঙিল। প্রসন্ন হাসি হাসিয়া মুনি বলিলেন "তোমার সেবায় আমি বড় সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি বর দিলাম তুমি হবে দেশের রাজরাণী।" কালো গাঁয়ের মেয়ে লজ্জা পাইল। নিজের কালো রঙের দিকে চাহিয়া দিঘীর জলে দেখা নিজের মুখের ছবি মনে করিয়া বড় দুঃখেও হাসিল। মুনি বুঝিলেন তাঁহার মনের কথা। বলিলেন "রূপের জন্য দুঃখ তোমার। যাও এই পথে নিবিড় বনে চলে যাও, দেখবে এক সরোবর। সেখানে গিয়ে স্নান কর। একবার স্নানে চাঁদের মত লাবণ্য ঝরে পড়বে তোমার রূপ থেকে। সে রূপ যদি তোমার মনোমত না হয় তবে তুমি দ্বিতীয়বার স্নান করবে তোমার অঙ্গ থেকে সূর্য্যের আলোর দীপ্তি ঝরে পড়বে।" হইয়াছিলও তাই। তবে এ মেয়েও কি সেই মেয়ে? শ্যামলা রঙ —সামান্য সাধারণ বেশভূষা, কিন্তু এ কি দীপ্তি!

দুলাল বারবার মাথার চুলে ঝাঁকি দিয়া প্রচণ্ড উৎসাহে হাঁক দিতে সুরু করিয়াছিল—চলো—মানগোবিন্দপুর। চলে তুফান মেল!

একটা মনখানেক ওজনের ঝুড়ি লইয়া বাসের মাথায় তুলিতে ষ্টেশনের কুলিটা হিমসিম খাইয়া মাটিতে নামাইয়া বলিয়াছিল একলা লারব বাপু! এই বোঝা কি আলগোছে উঁচু করে একলা তোলা যায়?

দুলাল ছাদের উপর হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া বলিয়াছিল—যায় না? এই দেখ! বলিয়া দাঁতে দাঁত টিপিয়া হেঁচকা টান মারিয়া বোঝাটা দুই হাতে উপরে ঠেলিয়া তুলিয়া মহাবীরকে বলিয়াছিল—পাকড়ো ভাই মহাবীর!

কিন্তু ভাগ্য দুলালের! মেয়েটি কালো চশমার মধ্য দিয়া যেমন সামনের দিকে স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন তেমনিই বসিয়া রহিলেন। একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

দুলালের ক্ষোভের সীমা ছিল না।

মান গোবিন্দপুরে আসিয়া তাহার সে ক্ষোভ মিটিল। নিজেই সেই সূর্য্যের দেশের মেয়ে বলিয়াছিলেন—তোমার নাম দুলাল তো! দুলাল বলেই তো ডাক্‌ছিল তোমাকে।

অবাক হইয়া গিয়াছিল দুলাল।—হ্যাঁ।

—তুমি রাধাচরণবাবুকে চেন?

উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল দুলাল।—হ্যাঁ। আপনি সেখানে যাবেন? তাঁর বাবার আখড়ায়?

—না। তিনি যেখানে থাকেন।

নরোত্তম দাস বাবাজীর ছেলে রাধাচরণ।

বাপ সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন। ছেলে রাধাচরণ গুপ্ত মানগোবিন্দপুরেই বাসা করিয়া চরকায় সুতা কাটে, লোকজন জড়ো করিয়া সভাসমিতি করে। কংগ্রেসের পাণ্ডা। তাহার চেহারা এমনি রুক্ষ—এমনি দীপ্ত।

নরোত্তম দাস বাবাজীর প্রতি দুলালের দুরন্ত ক্রোধ কিন্তু রাধাচরণকে সে ভালোবাসে। এই মেয়ের সর্ব্বাঙ্গে যেমন সূর্য্যের দীপ্তি তেমনি তাহার রুক্ষ চেহারাতেও আছে অগ্নিশিখার দীপ্তি এবং উত্তাপ। ভয়ও করে। গম্ভীর রাধাচরণ তাহাকে কটু কথা বলে না, কিন্তু দৃষ্টি তাহার অত্যন্ত প্রখর।

মেয়েটি দুলালকে বলিয়াছিল—তোমার নাম রাধাচরণবাবু আমাকে বলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন তাকে বললেই সে ঠিক পৌঁছে দেবে।

দুলাল কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিয়াছিল—ওদিকে না—এই ঘাসে ঘাসে আসুন। বেজায় ধূলো এখানে। বর্ষার সময় এ সব জায়গায় যা কাদা।

—খুব কাদা হয়—না?

—খুব। পথে এক একদিন বাস নিয়ে জান বেরিয়ে যায়। একবার একটা গরু আধখানা ডুবে গিয়েছিল কাদায়। শেষে পেটের তলায় বাঁশ দিয়ে ঠেলে তুলি। একদিকে আমি আর একদিকে দুজন। আমার কাঁধের চামড়া ফেটে গিয়েছিল।

—তোমার গায়ে খুব জোর। আজও তুমি বোঝাটা যা তুললে—

—ওর আর কি ওজন! দু মণে বস্তা ঘাড়ে নিয়ে ইষ্টিশান থেকে বাস পর্য্যন্ত দিব্যি চলে আসি। জানেন—আমার ইচ্ছা আছে—একদিন মটর আটকে দেখব। শুনেছি—সার্কাসে সব মটর আটকায়!

রাধাচরণের বাসায় তাহারা আসিয়া পড়িয়াছিল। মেয়েটি তাহাকে পয়সা দিতে চাহিয়াছিল—একটি দু আনি; দুলাল ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল—না—।

সেই দিন অপরাহ্ণে আবার সে আসিয়াছিল—একটা মরা গোখুরা সাপ লইয়া। সাড়ে তিন হাত লম্বা—প্রকাণ্ড বিষধর। বাসের গ্যারেজে কখন ঢুকিয়া বসিয়াছিল, দুলালই সেটাকে মারিয়াছিল। রাধাচরণকে দেখাইতে আসিয়াছিল। রাধাচরণকে নয়—ওই মেয়েটাকে। মেয়েটির নাম শোভা। 'সকালে' রাধাচরণের মুখে নামটা শুনিয়াছিল—বিকালে আসিয়া সে নিজেই সম্পর্ক পাতাইয়া ডাকিল—শোভা দি, দেখুন কত বড় সাপ মেরেছি!

মেয়েটি রাধাচরণকে ইংরাজীতে কি কয়টা কথা বলিয়াছিল।

রাধাচরণ হাসিয়া ইংরাজীতে কি উত্তর দিয়াছিল। তারপরই মেয়েটি

বলিয়াছিল—তোমার গায়ে খুব জোরও আছে, সাহসও আছে খুব, কিন্তু লেখাপড়া করেছ কতটা ?

—লেখাপড়া ?

—হ্যাঁ।

—লেখাপড়া বেশী জানি না ?

—শিখবে লেখাপড়া ?

—উঁহু। ও—হবে না আমার !

—হবে, হবে। আমার কাছে যখন হোক একঘণ্টা ক'রে পড়ে যাবে। কেমন ?

রাজী হইয়াছিল দুলাল। আসিতও রোজ। কিন্তু লেখাপড়া হয় নাই। লেখাপড়া না-হোক শোভা দিদির সঙ্গে আলাপ হইয়াছে। শোভা দিদি সূর্য্যের দেশের মেয়ে।

শোভা দিদিকে সে ভক্তি করে, নাম উঠিলেই দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করে—বলে—ওরে বাপরে ! এর চেয়ে স্পষ্ট এবং গভীর ভাবে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিবার মত ভাষা দুলালের নাই। শোভা দিদি নয় ; কিন্তু বিবাহের কথা মনে হইলেই সে কল্পনা করে ওই শোভাদিদির মত একটি দীপ্তিমতী মেয়ে তাহার গলায় মালা দিতেছে !

দুলালের কল্পনা আকাশে ফুল ফুটাইয়া চলে। তাহার কাছে অসম্ভব কিছু নাই। বাস ছুটিয়া চলে, বাসের ফুটবোর্ডে দাঁড়াইয়া চলিতে চলিতে অকস্মাৎ সে স্তব্ধ হইয়া যায়—কল্পনা করে—সে ওই রাধাচরণ দাদার মত হইয়াছে ; মাথায় গান্ধী টুপী, পরণে খদ্দর, রুক্ষ চুল। রাধাচরণের চেয়েও সে বড় হইয়াছে। রাধাচরণ চরকা কাটিয়া মিটিং করিয়া জেল খাটিয়া এমন হইয়াছে—দুলাল চরকা কাটিবে না, ও সব নয়—সে বোমা

পিস্তল ছুড়িয়া জেল খাটিয়া ফিরিয়া আসিবে। একদিন—শোভাদিদির মত কোন মেয়ে আসিয়া হাজির হইবে। —আপনি দুলাল বাবু? আমি কলকাতা থেকে এসেছি!

মা বলিবে— ওটি কে রে দুলাল?

দুলাল হাসিয়া বলিবে—উনি আমার কাছে এসেছেন মা।

সেদিন কয়েকজন মিলিটারী অফিসার আসিয়াছিল। রেল হইতে নামিয়া তাহাদেরই বাসখানা লইয়া একটা ডাঙ্গা দেখিয়া গিয়াছে। এরোপ্লেনের ঘাটি করিবার কথা হইতেছে। যুদ্ধ চলিতেছে। জার্ম্মানীর সঙ্গে [illegible] সঙ্গে যুদ্ধ! দুলাল পিছনে বসিয়া অদ্ভুত অসম্ভব কল্পনা করিয়া চলিয়াছিল। এরোপ্লেনের ঘাঁটি হইবে। একদিন রাত্রে চুপি চুপি আসিয়া বোমা পিস্তল মারিয়া সব জখম করিয়া এরোপ্লেন দখল করিবে। উহাদের পোষাক পরিয়া এরোপ্লেন উড়াইয়া বোমা মারিয়া গিয়া নামিবে এক দুর্গম অরণ্যের মধ্যে। প্রতি রাত্রে হানা দিবে। ক্রমে সেই বনের মধ্যে আসিয়া জুটিবে রাধাচরণ, শোভা দিদি, তাহাদের সঙ্গে আরও কত তরুণ তরণী। ইংরাজকে স্লোৎ করিয়া একদিন তাহারা দেশে ফিরিবে। বাড়ীতে আসিবে। মিলিটারী পোষাক তাহার পরণে, সঙ্গে তাহার বধূ। ওই সূর্য্যের দেশের মেয়ে। গ্রামের লোকে চিনি-চিনি করিয়াও চিনিতে পারিবে না। সভায় সবিস্ময়ে দূরে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া দেখিবে। মা—মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিবে—বলিবে—কে বাবা তুমি?

দুলাল কৌতুক করিবে—বলিবে—তুম্ ব্রজডাসী হ্যায়। ওই উল্লু—দুলাল তুমাহারা লেড়কা হ্যায়?

—হ্যাঁ বাবা।

হা—হা করিয়া দুলাল তখন হাসিয়া উঠিবে। মাথার টুপিটা ছুড়িয়া

দিবে বধূর হাতে। মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিবে—মা গো, চিনতে তো পারলে না। আমিই সেই উল্লু দুলাল!

—দুলাল! আমার দুলাল!

—হ্যাঁ গো। হ্যাঁ গো! হ্যাঁ গো!

—ওটি? ওটি কে দুলাল? লক্ষ্মীর মত মেয়েটি কে বাবা?

—বউ, তোমার বউ গো!

—আমার বউ!

অবাক হইয়া যাইবে তাহার মা।

দুলালের কল্পনায় অসম্ভব কিছু নাই। তবুও একদিন বাস্তব সংসার-বোধ সজাগ হইয়া উঠে। সেদিন ওই কল্পনা করিতে সঙ্কোচ হয়। সে দিন প্রচণ্ড উগ্রতায় সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে। কিছুই ভাল লাগে না। অবসর পাইলেই সে সে-দিন সকলের কাছ হইতে দূরে চলিয়া যায়। শোভা দিদির কাছেও যায় না। কোন নির্জ্জন স্থানে গাছতলায় শুইয়া পড়ে। সেও ভাল লাগে না। বাহিরের প্রকৃতি তাহাকে বাস্তব সংসারকে মনে করাইয়া দেয়। সে তখন গামছায় মুখ ঢাকা দেয়। চোখ মুজিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার কল্পনার অদ্ভুত রাজ্যের দুয়ার খুলিয়া যায়। সে-দিন সেভাবে কুছ পরোয়া নেহি হ্যায়। সে ডাকাত হইবে। ডাকাতি করিবে। —লাঠি হাতে ডাকাত নয়। মোটর ট্যাক্সি লইয়া ডাকাতি। রিভলভার দেখাইয়া ট্যাক্সিওয়ালাকে ঘায়েল করিয়া নিজেই লইবে ষ্টিয়ারিং। তারপর—কোন জুয়েলারির দোকানে—কি কোন বড় গদীতে—কি ব্যাঙ্কে—হানা দিয়া লাখ টাকা লইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিবে। হু—হু করিয়া ছুটিবে গাড়ী। কল্পনায় গাড়ী ছোটে। হঠাৎ চোখে পড়ে—পথ ধরিয়া আসিতেছে এক মেয়ে, চোখে কালো গ্লাস, রুখু চুল, সর্ব্বাঙ্গে ধূসর লাবণ্যের দীপ্তি। সে সজোরে ব্রেক

কবিয়া গাড়ী থামায়। খেলার পুতুলের মত মেয়েটিকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া আবার গাড়ী ছাড়ে। ছোটে গাড়ী, ছোটে, ছোটে! এক নির্জ্জন স্থানে—বনের মধ্যে গাড়ী থামায়। প্রথমেই সে লুণ্ঠন করা সম্পদ আর রিভলভারটা ফেলিয়া দেয়—মেয়েটির পায়ের কাছে। বলে—যা—হয় কর তুমি! তোমার হাতেই—আমার জীবন মরণ।

মনে মনে উৎসাহে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া লাফাইয়া উঠিয়া পড়ে। নির্জ্জন স্থানটায় অকারণে বিকৃত মস্তিষ্কের মত একটা চীৎকার করিয়া গাছের পাখী, কাঠবিড়ালীদের সচকিত করিয়া দেয়। পাখীরা শব্দ করিয়া উড়িয়া যায় নিশ্চিন্ত বিচরণরত কাঠবিড়ালী গুলা লেজ উঁচু করিয়া চিক্ চিক্ শব্দ করিয়া লাফ মারিয়া গাছে উঠিয়া পড়ে, দুলাল—হা—হা করিয়া হাসে।

সে দিন একদিন ঠিক এমনই মুহূর্ত্তে মানগোবিন্দপুরের একটা বসতি ঘন পাড়া হইতে সচকিত কলরব ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল—আগুন—আগুন!

মাথার লম্বা চুলে ঝাঁকি দিয়া দুলাল—ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—দূরে কুণ্ডলী পাকাইয়া কালো ধোঁয়া উঠিতেছে। এ্যা—র্ত—বলিয়া একটা চীৎকার করিয়া দুলাল ছুটিল। চৈত্রের শেষ, অপরাহ্ণ বেলা। শীতান্তে আগুন জরা পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যের তেজে লেলিহান—প্রখর। লোকজন অনেক জমিয়াছে। রাধাচরণ, শোভাদিদি আসিয়া হাজির হইয়াছেন।

—জল! জল! জল।

জল আসিয়াছে। কিন্তু আগুন যেখানে জ্বলিতেছে—সেখানে কেহ যাইতেছে না। লাফ দিয়া দুলাল চালে উঠিয়া পড়িল। নিজের

মাথায় এক হাঁড়ি জল ঢালিয়া লইয়া আগাইয়া গেল।—দে আও, জল! আর দা একখানা

খানিকটা, জল দিয়া নিভাইয়া, বাকীটা দায়ের কোপে কাটিয়া চালখানাকে ঘরের ভিতরে ফেলিয়া দিয়া আগুনকে ঘরের চারিখানা দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করিয়া ফেলিল। তারপর দেওয়ালে দাঁড়াইয়া বলিল—এইবার ঢালো জল!

একবার নয়, তিনচারবার নিজেকে ভিজাইয়া লইয়াছিল সে। তবুও সর্ব্বাঙ্গ ঝলসিয়া গিয়াছিল, বিশ পঁচিশটা ছোট বড় ফোস্কা পড়িয়াছিল; তিন চার জায়গা কাটিয়াও গিয়াছিল। শোভাদিদি নিজের হাতে ওষুধ লাগাইয়া দিয়াছিলেন; প্রসন্নতায়—বিস্ময়ে—প্রশংসায় শোভাদিদিকে যে কি সুন্দর তাহার [illegible] সে দিন! তিনি সে দিন বলিয়াছিলেন—দুলাল সত্যই একটা বীরপুরুষ!

দুলালের ইচ্ছা হইয়াছিল—এ্যা—র্ত বলিয়া সে একটা চীৎকার করিয়া ওঠে!

বিয়ে! বিয়ে একটা তিলক ফোঁটা কাটা বোষ্টুম মেয়েকে!

রাগে মাথার চুল ঝাঁকি দিতে দিতে সে মাঠের পথে মানগোবিন্দপুরের দিকে চলিল। নিজেও সে ওই ফোঁটা তিলক কাটিয়া মাথা ন্যাড়া করিয়া খাটো থান কাপড়ের বহির্ব্বাস পরিয়া মহান্ত সাজিতে পারিবে না।

অভ্যাসবশত সে মাঠের মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিল—এ্যা—র্ত!

আঃ! খুব সহজে পরিত্রাণ পাইয়াছে কিন্তু। অসুখে ভুগিয়া এক মুঠা ভাত খাইয়া এমনই তাহার মোহ হইয়াছিল যে মাকে সে বৈষ্ণব মহান্ত হইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বসিয়াছিল।

—তুলাল! তুলাল!. মহেশ মণ্ডল পিছন হইতে ডাকিল। মণ্ডল অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। বেচারী একটি ভাল মেয়ের সন্ধান পাইয়া খুসী মনেই ব্রজদাসীকে খবর দিতে আসিয়াছিল। আনন্দের উচ্ছ্বাসেই সে তুলালের কাছে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছে। তুলালের মনের এই অদ্ভুত কল্পনা বিলাসের কথা তাহার জানাও ছিল না। সে ভাবিয়াছিল তুলাল এ খবরে পুলকিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু এ কি বিপরীত কাণ্ড হইয়া গেল। মণ্ডল ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। হইল কি? তুলাল বাহির হইয়া গেল—সে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর ব্যাকুল হইয়া ছুটিল—তুলাল—অ তুলাল!

তুলাল মাঠে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ওই লোকটা তাহার পিছনে ছুটিয়াছে! ওই লোকটা তাহার তুই চক্ষের বিষ! কার্ত্তিক শেষের রবিফসলের চষা মাঠের চ্যাঙড় তুলিয়া লইয়া তুলাল পাগলের মত ছুড়িতে আরম্ভ করিল।

মহেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

একটা মাটির চ্যাঙড় আসিয়া লাগিল তাহার পায়ে! মহেশ মণ্ডলও প্রচণ্ড বলশালী ব্যক্তি। তাহার দেহও বিশাল দেহ; আঘাত কম হয় নাই, কিন্তু মহেশ শুধু একবার মুখ বিকৃত করিল মাত্র। যন্ত্রণায় রাগও হইল। ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া ছেলেটাকে ধরিয়া হাতখানা তুমড়াইয়া ভাঙিয়া দেয়। না—গলা টিপিয়া শেষ করিয়া দিয়া—আদালতে গিয়া হাতজোড় করিয়া বলে ধর্ম্মাবতার—

কিন্তু—মা-জীর মুখ মনে পড়িয়া গেল। সে মাথা হেঁট করিয়া ফিরিয়া আসিল। মা-জী ফিরিয়া আসুক!

পাঁচ

ব্রজদাসী পুলকিত চিত্তেই বাড়ী ফিরিতেছিল। একটি ভালো মেয়ের সন্ধান সে পাইয়াছে। এ মেয়ের সঙ্গে দুলালকে বাঁধিতে পারিলে দুলাল বাঁশীর সুরে মুগ্ধ সাপের মত স্থির হইয়া দুলিতে দুলিতে ঘুমাইয়া পড়িবে তাহাতে তাহার সংশয় ছিল না।

আপন মনেই সে পথ চলিয়াছিল। আশ-পাশের দিকে লক্ষ্য পর্য্যন্ত ছিল না। মন তাহার আপনার মধ্যেই মগ্ন হইয়াছিল। ওই মেয়েটির কথাই সে ভাবিতেছিল। গোকুল-বাড়ী গাঁয়ের ভোলা দাসী কলিকাতায় ঝি-গিরি করে। পনের ষোল বৎসর আগে চার বছরের ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছিল, পেটের দায়ে স্থানীয় বাবুদের বাড়ী কাজ লইয়া তাদের সঙ্গে কলিকাতা গিয়াছিল। কলিকাতা ভাল করিয়া চিনিয়া শুনিয়া বাবুদের বাড়ীর কাজ ছাড়িয়া ঠিকা ঝিয়ের কাজ করে, আজও করে। ছেলেটা না-থাকিলে হয় তো দেশের সঙ্গে সম্পর্কও রাখিত না। এখন ছেলে বড় হইয়াছে, গোকুলপুরে ঘরদুয়ার করিয়া সে এখন দেশেই থাকিতে চায়। কিন্তু বিপদ হইয়াছে একটা মেয়ে লইয়া। ভোলাদাসী বলে মেয়েটি তাহার নয়, তাহাদের ঠিকা-ঝিয়ের আস্তানার এক বান্ধবী সখির মেয়ে। সখিটি মরিবার সময় তিন মাসের মেয়েটিকে ভোলাদাসীর হাতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছে—বলিয়া গিয়াছে—সই—তোমার ছেলে আছে, এটি তোমার মেয়ে হ'ল। এটিকে তুমি দেখো। সেই মেয়ের বয়স আজ বারো বছর। ভোলাদাসী এখন বিপদে পড়িয়াছে। ভোলাদাসী ওই মেয়ে লইয়া যে বৎসর প্রথম গ্রামে আসে—তখনই

সমাজে নানা কথা উঠিয়াছিল। ভোলাদাসীর কথা শুনিয়া সাধারণ লোকে মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিল। সমাজপতিরা মুখ গম্ভীর করিয়া হরিনাম স্মরণ করিয়াছিল। এইখানেই শেষ হয় নাই, ভোলাদাসীকে সমাজ একঘরে করিয়াছিল। সেদিন ভোলাদাসী সমাজকে গ্রাহ্য করে নাই। মেয়েটাকে লইয়া নাক উঁচু করিয়া কলিকাতা চলিয়া-গিয়াছিল; ছেলেকে রাখিয়া গিয়াছিল নিজের বাপ ভাইয়ের কাছে। এখন ভোলাদাসীর বড় বাসনা—ছেলের বিবাহ দিয়া বউ ছেলে লইয়া ঘর সংসার করে। ঘর সে করিয়াছে, ভাল কোঠা ঘর, টিনের চাল, পাকা মেঝে; কলিকাতা হইতে কত ছোটখাটো আসবাব আনিয়া ঘর সাজাইয়াছে। কিন্তু বিপদে পড়িয়াছে ওই মেয়েকে লইয়া। মেয়ের মত পালন করিয়া আজ কোথায় ফেলিয়া দিবে? পরের মেয়ে—বুকে তুলিয়া মানুষ করিয়া আজ যে আপন সন্তানের বেশী হইয়া উঠিয়াছে সে! অথচ ওই মেয়ে ঘরে থাকিতে সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিবে না; তাহার ছেলের হাতেও কোন গৃহস্থ মেয়ে দিতে চাহিতেছে না।

সন্ধান পাইয়া সে গোকুলপুরের মণ্ডলকে গিয়া ধরিয়াছিল—এই সম্বন্ধটি আপনি ক'রে দেন মণ্ডল; প্রভু আপনার ভাল করবেন।

মণ্ডল মহাশয় মুখ ভার করিয়াছিল।

ভোলাদাসী আজ অনেকগুলি টাকা লইয়া দেশে ফিরিয়াছে—মহাজনী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অহংকার তার অনেক। চাল চলন কথাবার্ত্তায় সে গোটা গ্রামখানাকেই অবজ্ঞা করিয়া চলে। কথায় কথায় বলে—'টাকা বেটা, পাথর কাটা'। একমাত্র ওই মেয়েটির ঠেকায় সমাজে ঠেকিয়া আছে। মেয়েটাকে যদি কোন মতে কাহারও হাতে সমাজ সম্মত উপায়ে তুলিয়া দিতে পারে তবে

আর তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারা যাইবে না। তবে মুগ্ধ ভাবের এইটাই একমাত্র কারণ নয়, আরও একটা কারণ আছে। মণ্ডল বৈষ্ণবী ব্রজদাসীকে শ্রদ্ধা করে—স্নেহ করে। সেই কারণে ওই ভোলাদাসীর মত বিলাসিনী-গোপন-দেহ-পসারিণীর ওই পাপের ফলকে গ্রহণ করিতে দিতে তাহার আপত্তি আছে। সে মুখ ভার করিয়া বলিয়াছিল—আপনি এই কথা বলছেন মা-জী? আপনি তো সব জানেন।

ব্রজ সবিনয়ে হাসিয়া বলিয়াছিল—শুনেছি অনেক কথাই মণ্ডল মশাই, কিন্তু শোনা কথা—সব সময়ে সত্যি তো হয় না।

—আপনার শোনা কথা—আমরা যে চোখে দেখেছি। ও পাপ আপনি ঘরে ঢোকাবেন না। আপনারা অবিশ্যি বৈষ্ণব, আপনাদের ধর্ম্মে মহাপ্রভুর দয়ায় সকল জনের ঠাঁই আছে; জাত জন্ম সমস্ত কিছুর যত পাপই থাকুক না কেন—সবই ঘুচে যায় আপনাদের ধর্ম্মের পুণ্যে, কিন্তু এ মেয়ের পাপ ঘুচবে না—এ আমি জোর গলা ক'রে বলতে পারি।

ব্রজ মিথ্যা কথা বলিয়াছিল—কিন্তু আমি যে স্বপ্নাদেশ পেয়েছি বাবা!

—স্বপ্নাদেশ!

—হ্যাঁ বাবা! কাল মহেশ মণ্ডল মশায়ের সঙ্গে দুলালের বিয়ের কথা বলেছিলাম। কিছু দিন থেকেই ওর বিয়ে দোব-দোব ভাবছি। কিন্তু এত বড় অসুখটা গেল ও-কথা ভাববার সময় ছিল না। দুলাল পথ্যি করেছে, আবার কথাটা মনে হ'ল। মণ্ডল মশায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম কাল। তারপর রাত্রে শুয়ে ঘুমিয়েছি—স্বপ্ন দেখলাম, একটি ছোট ছেলে, কাল রঙ, হাতে পাঁচন লাঠি,

মাঠের ধারে বসে আছে, গরু চরাচ্ছে ; আমি যাচ্ছি মেয়ে খুঁজতে। সেই ছেলেটি বললে—মা-জী, এই সামনের গাঁয়ে ভোলাদাসীর মেয়েটির সঙ্গে ছেলের বিয়ে দাও। বেশ মেয়ে গো! ভাল মেয়ে। তবে মায়ের আওতায় আছে, মায়ের 'ছোঁয়া' তার ওপর পড়েছে তাই মনে হচ্ছে খারাপ। তুমি ওকে নিয়ে যাও মা-জী, গোপালের প্রসাদ খাইও, তিন বেলা প্রণাম করিও—দেখবে ওর আসল চেহারা বেরিয়ে পড়বে। পতিতকে উদ্ধার করো, প্রভু তোমার ভাল করবেন।

এক নিশ্বাসে এতগুলি মিথ্যা কথা বলিয়া ব্রজদাসী শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—এর পর আমি কি না-এসে পারি, আপনিই বলুন!

মণ্ডল অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। প্রবীণ মানুষ ; স্বপ্নাদেশ তাহার কাছে অবিশ্বাস্য নয় এবং দৈবলীলার প্রকাশ বৈচিত্রেও তাহার গভীর বিশ্বাস, তাহার উপর এই ভক্তিমতী ভাল মানুষ বৈষ্ণব মেয়েটি এ অঞ্চলে এমনই শ্রদ্ধা ও স্নেহের পাত্রী যে তাহাকে সে মিথ্যাবাদিনীও ভাবিতে পারিল না। কিন্তু এ প্রস্তাবে সায় দিতেও তার মন সরে না।

ব্রজ নিজেও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া না-থাকিয়া পারে নাই। মনে মনে নিজের কাছেই তাহার লজ্জার সীমা ছিল না। কিন্তু তাহার যে উপায় নাই। দুলালকে যে তাহার বাঁধিতেই হইবে! গোবিন্দ জানেন—অপরাধ তাহার নাই—কিন্তু দুলালের জন্ম যে অপরাধের মধ্যে। জন্মের অপরাধে সে পতিত ; পাপ তাহার জীবনকে এমন উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছে। মুক্তি আছে প্রভুর চরণাশ্রয়ে। সেই আশ্রয় তাহাকে গ্রহণ করাইতে হইবে। তাহার একমাত্র উপায় তাহাকে তাহার ওই প্রভুর সংসার ওই আখড়ার ঘরকন্নায় আবদ্ধ করা। ভোলাদাসীর মেয়েটিও পতিত—একই অপরাধে

অপরাধিনী সে। দুই পতিতকে একসঙ্গে বাঁধিয়া দিবে সে—ফেলিয়া দিবে তাহাদের প্রভুর চরণাশ্রয়ে। ইহার জন্য সে মিথ্যা কথাটা বলিয়া গেল—একেবারে পাকা মিথ্যাবাদিনীর মত; এতগুলা মিথ্যা বলিয়া সে নিজেই অবাক হইয়া গেল—কেমন করিয়া এমন নিপুণ-ভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া কথাগুলা বলিল! সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাও পাইল। কিন্তু উপায় কি? যে শাস্তি যে দণ্ড তাহার প্রভু তাহাকে দিবেন—সে পরমানন্দে হাসিমুখে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে, আক্ষেপ করিবে না—শুধু দুলাল উদ্ধার পাক। শুধু তো উদ্ধারই নয়, দুলাল একান্তভাবে তাহার হইয়া—তাহার সংসার—তাহার বুক জুড়িয়া থাক।

কিছুক্ষণ পর মণ্ডল বলিল—গোবিন্দের ইচ্ছা মা-জী। এর ওপর আমি আর কি বলব! তা হ'লে চলুন। আপনাকে নিয়ে যাই—ভোলাদাসীর বাড়ী! দেখুন—সে আবার কি বলে! আদেশ আপনার ওপর হয়েছে, তার ওপর তো হয় নাই। তা-ছাড়া সে তো আপনার আমার মত নয়। সে কলকাতায় থাকে। সে—।

মণ্ডল কথাটা বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল। এই ভক্তিমতী বৈষ্ণবীর সম্মুখে কুৎসিত মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া সঙ্কোচে জিভ যেন আপনি গুটাইয়া গেল।

ভোলাদাসীর অর্থের অহঙ্কার মণ্ডলের সহ্য হয় না—সে-জন্য সে বেশ খানিকটা তাহার উপর বিরক্ত এ কথা সত্য—কিন্তু অন্য দিকটায় মণ্ডল মিথ্যা অপবাদ দেয় নাই। ব্রজ ভোলাদাসীর বেশভূষা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। বৈধব্যের নিরাভরণতাকে যে এমন বিলাস-সজ্জায় পরিণত করা যায়—এ ধারণাই তাহার ছিল না।

সৌখীন হাতা ধোয়া সেমিজের উপর চুলপাড় মিহি ধুতি পরিয়া ঝকঝকে পানের বাটা পাড়িয়া পান সাজিতেছিল। চুলে পাক ধরিয়াছে ভোলাদাসীর—কিন্তু এমন চলকো করিয়া কান ঢাকিয়া এলোখোঁপা বাঁধিয়াছে যে ব্রজ লজ্জা অনুভব করিল! একবার মনেও হইল—না—কাজ নাই, ফিরিয়া যাই। কিন্তু ওপাশের দাওয়ায় রন্ধনরত কিশোরী মেয়েটাকে দেখিয়া সে সমস্ত বিতৃষ্ণা উপেক্ষা করিল। চমৎকার মেয়েটি। রূপ আছে, সে রূপে পারিপাট্যও আছে; ভালো করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল—রান্নার কাজে মেয়েটির ক্ষিপ্র নৈপুণ্যও আছে। শুধু তাই নয়—আচার আছে মেয়েটির। কাঁচা তরকারির পাত্রটা তুলিয়া কড়াইয়ে তুলিবার পূর্ব্বে এঁটো হাতটা ধুইয়া লইল। আরও লক্ষ্য করিল—ভিজে হাত সে কাপড়ের আঁচলে মুছিল না। মণ্ডল এবং ব্রজদাসীকে দেখিয়া গায়ের কাপড় সে ঠিক করিয়া লইল কিন্তু হাতের হলুদ মসলা মাখা দিকটা দিয়া নয়, হাতের চেটোর উল্টো পিঠ দিয়া কাঁধের উপর ভাঁজকরা আঁচল খানা অনাবৃত হাতের উপর নামাইয়া লইল। বেশ মেয়ে। আচার যখন আছে, পরিচ্ছন্নতা যখন আছে তখন আশা আছে। আচার থাকিলে ভক্তি আসিবে। মাটি পরিপাটি করিয়া খুঁড়িয়া চষিয়া বীজ পুতিলে অঙ্কুর মেলিতে দেরী হয় না। ব্রজদাসীর বাউল গুরু বলিতেন—"মানুষের মন হল মাটি— আচার হ'ল তার চষা-খোঁড়া; ওই টুকু না হ'লে ভক্তির সাধ্বী লতার বীজ গজায় না।"

ব্রজদাসী শক্ত হইয়া দাঁড়াইল।

মণ্ডল বলিল—ভোলাদাসী, ইনি হলেন গোবর্দ্ধনপুরের গোপালজীর আখড়ার মা-জী।

ভোলাদাসী বলিল—কি ভাগ্যি আমার! ওঁর গানের কথা বলতে

লোক পঞ্চমুখ। আমার কপাল, আমি শুনি নাই। আসুন—আসুন! ওঁর কল্যেণে আপনার পায়ের ধূলো পড়ল আমার বাড়ীতে—সে আমার আরও ভাগ্যি!

ভোলাদাসীর তরিবৎ কথা-বার্ত্তা ভদ্রলোকের মত। সে আসন পাতিয়া দিল।

মণ্ডল বলিল, গান নয় ভোলাদাসী। কথা আছে।

মণ্ডল বলিল—তোর এতে ভালো হবে, ভোলাদাসী।

ভোলাদাসী বুদ্ধিমতী; সে একমুহূর্ত্তে সব বুঝিয়া লইল। সে বলিল—সে তো আমার ভাগ্যি। মেয়ের ভাগ্যি আমার ভাগ্যি। মেয়েকে পেটে ধরিনি—কিন্তু একমাসের মেয়ে কোলে নিয়ে এত বড় করে তুলেছি। ওকে নিয়ে আমার কলঙ্কের সীমা নাই তবু ওকে ফেলতে পারিনি। ভেবে আকুল হচ্ছিলাম—কোথা কার হাতে দোব ওকে! তা দুখের শেষে সুখ—পারুলের আমার খুব কপাল।

তারপর হাসিয়া বলিল—তেমনি ভাল কপাল আমার, এমন বেয়ান পাব।

মণ্ডল বলিল—তা' হলে তোমরা দুজনে কথাবার্ত্তা বল। আমি এখন যাই।

মণ্ডল চলিয়া গেলে ভোলাদাসী পান দোক্তা মুখে পুরিয়া বলিল—এইবার ভাই খোলাখুলি কথা! কি বল?

পানের পিচ ফেলিয়া বলিল—কিছু মনে করো না ভাই; কুচুকুরে মোড়ল চলে গিয়েছে—সোজাসুজি কথা বলব। রাগ কর—দোব ধর—নিজের ঘরে গিয়ে পেট ভরে ভাত খেয়ো, প্রাণভ'রে গাল দিয়ো

আমাকে। আমার কথা তুমি জান, এ অঞ্চলে আমার নামে অনেক রটনা অনেক গুজব! আর—

বেশ একটু সরস হাসি হাসিয়া ভোলাদাসী বলিল—তুমিও ভাই আজ পনের ষোল বছর এখানে এসেছ, তোমার কথাও লোকে বলে, বার মাস দেশে না থাকি—মাঝে মাঝে আসি সে সব কথা আমিও শুনেছি। রাগ করো না যেন। তোমার দুলালের বাপের কথা নিয়ে সে-সব অনেক কথা! তা ভাই এক পথের রাহী আমরা—পথের ফেরের কথা দুজনেই জানি। মেয়ে আমারই সে কথা তোমার কাছে লুকোব না। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে খেটে খেতে পথে নেমেছিলাম, গায়ের জ্বালায় কাদা মেখেছি, সেই কাদায় শালুক ফুলের মত মেয়ে আমার অঙ্গে ফুটে উঠল। নিজে ভাই অনেক রোজগার করেছি, সুখও করেছি, কিন্তু মেয়েকে সে পথ দেখাতে মন সরে না। নইলে ওতো আমার নম্বুরী নোট—বাজারে ছড়িয়ে আমি তো আঁচল ভরে টাকা পাই!

কথাবার্ত্তা শুনিয়া ব্রজদাসীর সমস্ত শরীর যেন কেমন হিম হইয়া গিয়াছিল। বিশেষ করিয়া ভোলাদাসী তাহাকে যখন নিজের দলে টানিয়া তার পাপের সমান ওজনের পাপ তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়া বলিল—"এক পথের রাহী আমরা। পথের ফেরের কথা দুজনেই জানি,"—তখন তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে চাহিল—না—না—না—না। চোখ ফাটিয়া তাহার জল আসিল। কিন্তু সে শুষ্ক হাসি হাসিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মসম্বরণ করিল।

এ সমস্ত কথার জবাব সে দিল না! সে মেয়েটিকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বলিল—হ্যাঁ মা—বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর ওপর তোমার ঘেন্না নাই তো?

মেয়েটি উত্তর দিল না—মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল!

ব্রজ এইটুকুতেই সন্তুষ্ট হইল। মেয়েটির লজ্জা আছে। সে আবার

প্রশ্ন করিল—কপালে তিলক কাটতে হবে, নাকে রসকলি পরতে হবে—তুমি আবর কলকাতায় মানুষ হয়েছ—লজ্জা করবে না তো? মন উঠবে তো। হ্যাঁ—পারুল?

পারুল এবারও হাসিল, ওই মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল—কিন্তু এবার বোধ হয় হাসিটা বেশী, মুখে সে কাপড় চাপা দিল।

ব্রজ আরও খুসী হইল। আসলে সে খুসী হইবার জন্য মনে প্রাণে প্রস্তুত হইয়াই ছিল। সে বুঝিতে পারিল না, মেয়েটি মায়ের মুখের দিকে চাহিয়াছিল ইঙ্গিতের জন্য এবং সেখানকার ইঙ্গিত মতই সে নীরব হইয়া থাকিল, হাসিটা অবশ্য ইঙ্গিতে নয়—মনের কৌতুকে।

ব্রজ ভাবিল—ঠিক আছে, বিবাহ দিয়া ঘরে তুলিতে পারিলে আবার কি? ভোলাদাসীর ছায়া মাড়াইতে দিবে না। বৈষ্ণবধর্ম্মের দীক্ষা দিয়া জাত্যন্তর ঘটিলে—ভোলাদাসীর আর কোন দাবী থাকিবে? আর মায়ের স্নেহ দিয়া মেয়েটিকে সংসারের সুপথের আনন্দ আস্বাদ করাইতে পারিলে—ওই মেয়েই কি আর মায়ের দিকে ফিরিয়া চাহিবে? যে শুঁয়া-পোকা পাতা খায়—গাছ নির্ম্মূল করে, সে যখন গুটি কাটিয়া প্রজাপতি হইয়া আকাশে পাখা মেলে—সে তখন আর গাছের পাতার স্বাদে আকৃষ্ট হয় না—সে তখন সেই গাছেরই মধু আস্বাদন করিয়া ধন্য হয়। মেয়েটির এই শুঁয়াপোকা অবস্থা হইতে সে তাহাকে রেশম কীটের সযত্নে পালন করিয়া প্রজাপতি করিয়া ছাড়িয়া দিবে। জয় গোবিন্দ বলিয়া সে সকল মান অপমান বোধ দূরে সরাইয়া ভোলাদাসীর হাত দুটি চাপিয়া ধরিল—বলিল—তা হলে এই কথা ঠিক রইল!

ভোলাদাসী হাসিয়া [illegible] রইল বই কি ভাই। না হলে কি তোমার কাছে নিজের কলঙ্কের কথা এমন করে বল্তাম। আমি খুব খুসী—আমি খুব রাজী। মেয়েটাকে তোমার ঘরে পাঠালেই আমি খালাস

ছেলের বিয়ে দোব। মনে মনে এমনিই খুঁজছিলাম। তোমার ছেলের জন্মে কলঙ্ক—আমার মেয়েরও জন্মে কলঙ্ক। কেউ কাউকে ছোট ভাববে না, ঘেন্না করবে না। তার চেয়েও ভাই বড় কথা—একেই আমি মেয়ের মা, তার ওপরে এই কলঙ্ক—ছেলের মায়ের কাছে মাথা হেঁট করতে হবে না। তুমি আমার মুখে কালী দিলে আমি তোমার মুখে চূণ কালী দোব।

হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল সে। তারপর বোধহয় ভদ্রতার খাতিরে বিনয় করিয়া বলিল—কিছু মনে করো না ভাই বেয়ান—আমার কথা-বার্ত্তা ওই এক রকম! রেখে ঢেকে কথা বলতে পারি না। পারলে—একটা কৃত্রিম দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—পারলে ভাই রাজরাণী হতে পারতাম। বুঝেছ না!—সে বলব একদিন। পাকাপাকি বেয়ান হই—তারপর বলব। ওরা দুজনে একঘরে শোবে—আমরা দুজনে শুয়ে—সে সব গল্প বলব।

আবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ব্রজ মনে মনে ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিয়া বলিল—তুমি আমার মান রাখ। আমাকে তুমি ধৈর্য্য দাও সহ্য করবার শক্তি দাও। দুলালকে আমি ঘরে বাঁধব। তোমার চরণাশ্রয়ে ফেলে দোব।

ওখান হইতে বাহির হইরা সে ওই সব কথাই ভাবিতেছিল। কিন্তু মন তাহার একটি প্রবল বাসনাকে কেন্দ্র করিয়া চারিপাশে ঘুরপাক খাইয়াই ফিরিতেছিল—কেন্দ্রটির মায়া ছাড়িয়া সোজা চলিবার শক্তি তাহার ছিল না। থাকিলে ভোলাদাসীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহারই গর্ভের ওই কন্যাটি বাহ্য সুশীলত্ব সম্পর্কে তাহার অন্তত সন্দেহ জাগিত; ভাল করিয়া যাচাই করিয়া দেখিবার সঙ্কল্প করিত সে। ভোলাদাসীর

মেয়েটি সুশ্রী—মেয়েটি রূপের মার্জ্জনা জানে ; তাহার রূপের একটা আকর্ষণ আছে ! এ মেয়ের সঙ্গে দুলালকে বাঁধিলে দুলাল বাঁধা পড়িবে !

গোবিন্দ ভরসা ! গোবিন্দের প্রতি যদি তাহার ভক্তি থাকে তবে বিষ অমৃতে পরিণত হইবে। তাহার ধর্ম্মনিষ্ঠ বিশ্বাসী মন কত কল্প-কাহিনী স্মরণ করিল। মনকে ওই বিশ্বাসে আশ্বস্ত করিয়া ছেলের বিবাহ দিয়া একটি সুখের সংসার গড়িবার কল্পনায়—মধুচক্র রচনারত মধুমক্ষিকার মত বিভোর হইয়া উঠিল।

* * * *

পথে মাঠের মধ্যে একটা গাছতলায় বসিয়াছিল বাগ্দীবুড়ী। বটগাছ তলায় পা ছড়াইয়া বসিয়া আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিল আর বাঁ হাতের আঙুলে টানিয়া ভুরু ছিঁড়িতেছিল। আপন মনেই হিসাব করিতেছিল—কাত্তিক গেল—আগন মাস এল—আউশ ধান কাটা শেষ হল, খাঁ খাঁ করছে আউশের মাঠ ; আমার মরণ, কাজ নেই কম্ম নেই—তাই এসেচি ধানের শীষ কুড়োতে। এইবার সব গম বুনবে, কলাই পাকড় ফেলবে, আলু লাগাবে, সরষে বুনবে। আগনের শেষ থেকে হেঁওত কাটা আরম্ভ। এ মাসটা কি করব তাই ভাবছি ! কি আর করব ? খাল—ডোবা দেখে মাছ কাঁকড়া ধরব। তা আবার মাছ কাঁকড়া ধরতে সঙ্গী চাই। সঙ্গী আবার কোথা পাই ? আঃ—দুলাল ছোঁড়া যে বড় হয়ে গেল। এমনি সঙ্গী হয় তবে তো সুখ ! শক্ত ডাঁটো ছেলে, কপাকপ মাছ ধরে, ভাগ নেয় না, দুটো রাঁধা মাছ খেয়ে খুসী। আমারও রেঁধে সুখ ! তা বিধেতার যেমন বিচের, ছোড়া আবার বড় হয়ে গেল। এখন তেমন বড় নয়—এ্যাই বড়। শুধু বড় নয়—পাখনা গজালো। আজকাল আবার মাছ ধরবার কথায় হাসে। তেমনি কি রাগ। কুমীরে ধরল—সেই রক্তারক্তি শরীল নিয়ে আমার ঘরে এল। তা-পরেতে

যমে মানুষে টানাটানি। বাঁচলি যদি—তো—দশদিন চুপ করে থাক, খা—দা, শরীলটা তাজা কর! তা' না—এই শরীলে মায়ের ওপর রাগ করে—। কে....গো সাদা মতন—কে গো? ভারী ত্বরিত প্যয়ে চলেছ, লাগছে। অ—মা মাথায় কাপড় রয়েছে যেন! মেয়ে লোক—কে গো? আঃ—ছেলে তুলে খুব হরষপরশ হয়ে চলেছ যে গো? ও গো—অ—মেয়ে! বলি এত হরষপরশ হয়ে চলেছিস কোথা গো? কে গো তুই?

ব্রজ চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। বুড়ীকে সে লক্ষ্যই করে নাই। বুড়ীকে দেখিয়া সে খুসী হইল, বুড়ী দুলালের শৈশবের সঙ্গিনী। কতদিন ব্রজ রহস্য করিয়া ছেলেমানুষ দুলালকে বলিয়াছে—ওই বাগ্দী বুড়ীর সঙ্গে তোর বিয়ে দোব।

বুড়ী হাসিত। দুলাল রাগ করিত।

পুলকিতচিত ব্রজ রহস্য করিয়া বলিল—চিনতে পারছ না?

—না। তবে গলাটা চেনা-চেনা মনে লাগছে। কে গো তুই?

—চিনলে তো খুসী হবে না বাছা—মনে হবে এ আবাগী কোথা থেকে এল আমার মাথা খেতে।

—কে লা? তুই আমার মাথা খাবি; তোকে আমি ভয় করব, বলি তোর ঘর কোথা লা?

—আমি তোমার শাউড়ী গো!

—শাউড়ী? অ! বেশ মা! তা—। আশ্চর্য্য হইয়া গেল বাগ্দীবুড়ী, ব্রজর কণ্ঠস্বরে এমন আনন্দোচ্ছ্বাস কেমন করিয়া ঝরিয়া পড়ে। দুলাল যে এই প্রথম দুপুরে তাহার চোখের সামনে দিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল। সে তো সেই অবধি মাঠেই আছে—কিন্তু কই দুলালকে তো সে ফিরিতে দেখে নাই!

ব্রজ কাছে আসিয়া বুড়ীর পাশে বসিয়া পড়িল। হাসিয়া বলিল

—তোমার যতীনের খোঁজে গিয়েছিলাম পিসী, তুমি তো বাছা—আমার ঘরেও এলে না, সেবা যত্নও করলে না। তাই নতুন বউয়েরই খোঁজে বেরিয়েছিলাম। বেটার আমার আবার বিয়ে দিচ্ছি। তুমি যেন রাগ রোষ ক'র না বাপু।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে ব্রজর মুখের দিকে চাহিয়া বুড়ী বলিল—বেটার বিয়ে দেবে, কনে খুঁজতে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ পিসা। তা—ভাল মেয়ের খোঁজ পেয়েছি।

—তাই দাও কোন রকমে সাতপাক ঘুরিয়ে দাও। ছোড়া ফাঁদে পড়া ঘুঘুর মত মজাটা দেখুক। তা সে ফিরল কখন? কি রাগ মা? মাঠে তখন ধান কুড়ুচ্ছি। হন হন ক'রে যাচ্ছে, বললাম—কে রে? কে। তা বললে—তোর যম। ফের ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করবি তো তোকে মেরেই ফেলব। গলার আওয়াজে বুঝলাম—দুলাল। বললাম—হ্যাঁরে দুলো, এত বড় অসুখ গেল, এই সাতদিন আগে তোকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে এলাম, এর মধ্যে যাবি কোথা? তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন রাগ করে যাচ্ছিস! আমার মুখের কাছে দু হাত নেড়ে দাঁত কষকষ ক'রে বললে—বেশ করছি। তোর কি? আমি বললাম—

—তা বেশ ভাই বেশ। আমার কিছু নয়। কিন্তু রোগা শরীল নিয়ে যাবি কোথা রাগ ক'রে, চল—আমার বাড়ী চল। সে তো তোর গোসাঘর। বললে—নাঃ। ব'লে মা, হন হন করে চলে গেল! কিন্তু ফিরতে তো দেখলাম না?

ব্রজর আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে কি? দুলালকে খাওয়াইয়া নিজে দুটো মুখে দিয়া বাহির হইয়াছে। প্রসন্নমুখে দুলালকে সে সিগারেট খাইতে দেখিয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যে দুলাল রাগ করিবে কার উপর? সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল—কি বলছ

পিসী? দুলাল? দুলাল রাগ ক'রে গিয়েছে? তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—হ্যাঁ। দেখা হয় নাই? আমি কি ব'সে ব'সে ঘুমাচ্ছিলাম নাকি—স্বপন দেখছিলাম না কি?

ব্রজ তবু বলিল—তা দেখ নাই, তবে তুমি কাকে দেখে কাকে ভেবেছ। দুলাল নয়।

—আমি কাকে দেখে কাকে ভেবেছি? আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে? আমার বাহাত্তুরে ধরেছে? আমাকে কানা বলছ না কি? তা—কানা না হয় হয়েছি, চোখে না—হয় ঝাপসাই দেখি, কিন্তু কানাও হয়েছি না কি? বলি—হ্যাঁ গো—দুলালের পিছু পিছু মোড়ল এল, ডাকলে—

—কে? মহেশ মণ্ডল মশায়?

—হ্যাঁ গো! ও মা—পায়ে ঢেলা মেরে মোড়লের পা একবারে ফাটিয়ে দিয়েছে। মোড়লকে শুধালাম—কি হ'ল মণ্ডল মাশায়। মোড়ল কথা ভাঙলে না, বললে—ও একটা কাণ্ড হয়ে গেল! একেই রাগী ছেলে—তার ওপর রোগা শরীর—কথায়—কথায় রাগ, বুঝলে না বাঙ্গী বউ! হেসে বললে—দেখ না—ডাকলাম—তো কেমন ঢেলা মেরেছে দেখ না! মোড়ল আরও খানিকটা গেল। তা' পরে ফিরে এল। কই দুলাল তো—ফেরে নাই।

ব্রজ আর অবিশ্বাস করিল না।

সে বুঝিয়াছে। সে যে জানে! মণ্ডলের সঙ্গে দুলালের আক্রোশ সে জানে। বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল তাহার মুখে। মণ্ডলের সঙ্গে দুলালের কিছু হইয়াছে। মণ্ডল আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা—তাই দুলাল রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় ঢেলা মারিয়া মণ্ডলের

রক্তপাত করিয়া গিয়াছে। মণ্ডলের অদৃষ্টে হয়তো আরো আঘাত পাওনা আছে দুলালের হাতে।

ব্রজকে নীরব দেখিয়া বুড়ী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—তুমি কিছু জান না—তা হ'লে? হ্যাঁ মা?

ব্রজ নীরবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

ক্ষীণ দৃষ্টি বুড়ীর কাছে ইঙ্গিতের উত্তর নিরর্থক, সে মুখের কাছে মুখ আনিয়া আবার প্রশ্ন করিল—হ্যাঁ মা? তুমি কিছু জান না—নয়?

ব্রজ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না।

সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বুড়ী বলিল—চললে মা?

—হ্যাঁ।

যাও তাই, বাড়ী যাও। ভেবো না সনদে নাগাদ সে ফিরবে। নিশ্চয় ফিরবে। আমি তো তাকে ভাল ক'রে জানি। সনদে লাগলে আর মায়ের কাছ ছাড়া তার ভাল লাগে না, ঘুম আসে না মা। এই তো সেদিন গো, কুমীরে ধরেছিল সে দিন—সেদিন 'দিনোমান'টা বেশ রইল—বললে—তোর কাছেই থাকব আমি দিদি! যা রোজগার করব তোকে দোব। সে রাক্ষসী মায়ের মুখ দেখব না। তা পরে মা—যেই নাকি সনদে হওয়া—অমনি ওঃ—আঃ আরম্ভ করলে। আমি যত শুধাই—হ্যাঁরে দুলাল—হ'ল কি? কষ্ট হচ্ছে? তা—জবাব দেয় না কথার। শেষমেশ—ঝেড়ে উঠে বললে—চললাম আমি মানগোবিন্দপুর। আমি ধরতে গেলাম—তো ঝাঁকি মেরে হাত ছাড়িয়ে চলে এল। কি করব—আমিও চললাম পিছু, পিছু ওই মণ্ডলের মত। গাঁ থেকে বেরিয়ে ওদিকে থাকল মানগোবিন্দপুর—

দুলাল পথ ধরল এদিকে চাঁদুরায়ের বাঁধের দিকে। বুঝলাম মা—চলল বাড়ী। বাঁধ পার হয়েই তোমার সঙ্গে দেখা। সে সাঁঝ লাগলেই ঠিক ফিরবে। বুঝেছ না?—আমার বয়েস অনেক হ'ল অনেক দেখলাম—মা! মায়ের এক ছাওয়াল হলেই ওই ধারা। মায়ের ওপর যত টান তত রাগ—দিনে রাগ করবে রাতে সুড়সুড় করে এসে কোলের কাছটিতে ঢুকে—।

বুড়ী আপন মনেই বলিয়া চলিয়াছিল। হঠাৎ এতক্ষণে খেয়াল হইল—কই শ্রোতার সাড়া-শব্দ কই? মুখ তুলিয়া সে আশে-পাশে চাহিয়া দেখিল। কই; কে কোথায়?

সে গোবর্দ্ধন পুরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিল—বেজ মা!

ছানিপড়া চোখের সম্মুখে পৃথিবীটাযেন কুয়াসাময় ঢাকা, কাছে মানুষ থাকিলে মনে হয় খানিকটা কুয়াসা যেন জমাট বাঁধিয়া নড়িতেছে। কই—তাই বা কই? সাড়াও তো দিল না ব্রজ মা।

সে এবার মানগোবিন্দপুরের দিকে মুখ ফিরাইল। এই বটগাছ-তলাটাকে পাঁচ মুড়ির বটতলা বলে। এখান হইতে আলপথ গিয়াছে গোবর্দ্ধন পুর, আরও তিনখানা গ্রামের দিকে তিনটা আলপথ চলিয়া গিয়াছে। এবার বুড়ীর যেন মনে হইল জমাটবাঁধা কুয়াসা খানিকটা নড়িতে নড়িতে দূরের গাঢ় জমাট কুয়াসার মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে।

ব্রজ সত্যই মানগোবিন্দপুরের পথ ধরিয়াছিল। তাহার ধৈর্য্যের ভিত্তি যেন নড়িয়া গিয়াছে। আর সে পারিতেছে না।

ছয়

মানগোবিন্দপুরে দুলালের আড্ডা মোটরবাসের গ্যারেজে। চারিপাশে খুঁটি পুতিয়া তাহার উপর খড়ের চাল বাঁধিয়া প্রকাণ্ড একটা চালা ঘর। চারিপাশে খুঁটির গায়ে বাঁশের খলপা বাঁধিয়া দেওয়ালের কাজ সারা হইয়াছে। মেঝেটা বাঁধানো বটে কিন্তু তাহার উপর তেল এবং ধুলায় আধইঞ্চি পুরু একটা আস্তরণ পড়িয়াছে। পা দিলে চট্ চট্ করে, একটা তৈলাক্ত গন্ধ ওঠে। দিনে গ্যারেজটা খালিই থাকে, রাত্রে থাকে দুইখানা মোটর বাস; আর থাকে দুলালের তিনজন সঙ্গী—দুজন কণ্ডাকটার একজন ক্লীনার। বাস দুইখানার দুইপাশে খানিকটা করিয়া ফালি জায়গায় তিনখানা খাটিয়া খাড়া করা থাকে। গ্রীষ্মকালে খাটিয়া গুলাকে বাহিরে আনিয়া খোলা জায়গায় পাতিয়া শুইয়া পড়ে। বর্ষা ও শীতকালে খাটিয়াগুলা দেওয়ালের পাশে খাড়া করিয়া রাখিয়া দিয়া ঘুমাইতে যায় বাসের ভিতর। একটা ঢোলক আছে প্রত্যেকের এক একটা বাঁশের বাঁশী আছে, দুই জোড়া মন্দিরা আছে আর আছে এক জোড়া ঘুঙুর। রাত্রি সাতটায় শেষ ট্রিপ দিয়া সদর শহর হইতে ভায়া জংসন ষ্টেশন মোটরবাস মানগোবিন্দপুরে ফিরিবার পর তাহাদের কনসার্ট পার্ট বসে। প্রত্যহ একজন পালা করিয়া বাঁশী বাজায়—একজন ঢোলক একজন মন্দিরা একজন ঘুঙুর হাতে বাজাইয়া সঙ্গত করে। দুলালও কনসার্ট পার্টির একজন সভ্য। কিন্তু রাত্রি সাড়ে আটটায় তাহাকে বাড়ী রওনা হইতে হয়। না-হইলে মা বেটী ঘর বাহির করিয়া সারা হইবে, বেশী দেরী হইলে শেষ পর্যন্ত মাঠের প্রান্তে আসিয়া অন্ধকার মাঠের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে।

মধ্যে-মধ্যে ডাকিবে—দুলাল! মৃদুস্বরে ডাক। দুলাল জানে অন্ধকারের মধ্যে মায়ের চোখের দৃষ্টিতে ছায়া দুলাল ভাসিয়া উঠে। মাও সে-কথা জানে তাই মৃদু স্বরে ডাকে—দুলাল। উত্তর পায় না, আবার ডাকে দুলাল! মা জানে দুলাল চুপ করিয়া আসে না। দুলাল আসে গোটা মাঠখানা চকিত করিয়া গান গাহিয়া; অন্তত আধ মাইল দূর হইতে তাহার কর্কশ কণ্ঠের গান শোনা যায়; যেদিন ঠিক সময়টিতে দুলাল ফেরে সে দিন আখড়ায় বসিয়া মা তাহার গান শুনিতে পায়—তবুও মা অন্ধকার নিস্তব্ধ মাঠের দিকে তাকাইয়া চোখের ভ্রমে পড়িয়া মৃদুস্বরে ডাকিতে থাকে দুলাল! দুলাল!

দুলাল অবশ্য এক আধদিন নীরবে আসে।

যেদিন শোভাদিদিকে প্রথম দেখিয়াছিল সেদিন কল্পনায় বিভোর হইয়া নীরবে আসিয়াছিল। সেদিন কল্পনা করিতেছিল ওই রাধাচরণ দাদার চেয়েও সে বড় স্বদেশী লোক হইয়াছে, সাহেবদের উপর বোমা মারিয়া সে কালাপানি পার হইয়া আন্দামান যাইতেছিল। এ সমস্ত গল্প সে অনেক শুনিয়াছে, সেই শোনা গল্পের পথকে সে প্রশস্ততর করিয়া কল্পনার চতুরশ্ব রথ ছুটাইয়া দিয়াছিল। সে দিন গান গায় নাই। হঠাৎ তাহার কানে আসিয়া ঢুকিল মৃদু স্বরের ডাক—দুলাল! সে চমকিয়া উঠিল। সবিস্ময়ে চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছিল—আবার ডাক আসিল —দুলাল! দুলালের আর ভুল হয় নাই। সে উত্তর দিয়াছিল মা!

—এত দেরী করে? ছি! কত রাত্রি হয়েছে, বলতো?

—কত?

—প্রহর অনেকক্ষণ গড়িয়ে গিয়েছে দুলাল। কি করছিলি এতক্ষণ?

দুলাল শোভাদিদির কথা বলিতে পারে নাই, বলিয়াছিল তোর মাথা

করছিলাম। চল্, বাড়ী চল্। এই আঁধারে একলা ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে দেখ।

—ভূতের মা যে আমি, ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকব না। মানুষ যারা হয় তারা মাকে এমন করে ভাবায় না, তাদের মাকে এমন করে অন্ধকারে মাঠের মধ্যে ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকতেও হয় না।

দুলাল সে দিন কল্পনায় নিজেকে এমন উঁচুতে তুলিয়া ছিল যে ভূত বলিলেও রাগ করিতে পারে নাই। একটু লজ্জিতই হইয়াছিল, বলিয়াছিল—তোর খুব কষ্ট হয়েছে মা। হুঁ অনেকটা রাত হয়েছে বটে! তারপর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—দেরী হলে এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকিস তুই?

—থাকি বইকি, ঘরে বসে কত ভাবব? দাঁড়িয়ে থাকি এইখানে—আর কিছু নড়লেই নাম ধরে ডাকি। মনে হয় তুই আসছিস। যেদিন আসতে দেরী হবে—বলে গেলেই পারিস।

—তাই ভাল, তাই বলে যাবো।

দুলাল সেই অবধি জানে—মা তাহার মাঠের মধ্যেই দাঁড়াইয়া থাকে তাহার প্রতীক্ষায়। তাই ঠিক সাড়ে আটটায় আড্ডা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে। আড্ডার সকলেরই তাহাতে আপত্তি। দুলাল গান বাজনায় পারদর্শী নয়। ওই বিদ্যেটা তাহার গলায় মগজে হাতে কোথায় আসে না। কিন্তু তাহার মত গান বা বাজনা জমাইতে কেহ পারে না। সে যা মুখে ভেহাই মারে, তালের মাথায় লম্বা চুল একবার সামনে কপালে মুখে ফেলিয়া একবার পিছনে ফেলিয়া মাথা নাড়িয়া সর্ব্ব শরীর নাচায় যে গান বা বাজনা, যাই হোক না কেন, একটা প্রবল্ল জোর পাইয়া জমজমাট্ হইয়া সব কিছুতে নাচন জাগাইয়া দেয়। আড্ডার ছোকরারা বলে—শা—লা, জ্বলে গেল একেবারে।

দুলাল বলে—জ্বলবে না? কার ফু দেখতে হবে!

সকলেই সে-কথা বিনা প্রতিবাদে মানে। ঠিক এই কারণেই তাহাদের দুলালকে ছাড়িয়া দিতে আপত্তি। তাহারা বলে রোজ বাড়ী যাবি কেন?

কথাগুলো তাহারা ভাঙা হিন্দীতে। মহাবীর প্রসাদ এখানকার বাস্ ব্যবসায়ের প্রধান ড্রাইভার, মালিকও একজন ছাপরার লালা কায়স্থ। তাহারা এ ব্যবসায়ে লোকজন যাহা রাখিয়াছে তাহারা অন্তত নামে হিন্দী ভাষাভাষী। জন্মকর্ম্ম সবই এ দেশ, বাপ বা পিতামহের আমল হইতে এখানেই বাস করিতেছে—তবুও তাহারা ভাঙা হিন্দী বলে, নামও রাখে ও দেশের অনুকরণে। এক দুলালই এ মাটির খাঁটি মানুষ। মহাবীর প্রসাদ ছেলেটির তাগদ এবং হিকমত দেখিয়া উহাকে কাজ দিয়াছে। মহাবীরের গোপন উদ্দেশ্যও একটা আছে। মহাবীর এখানে যাহাকে লইয়া ঘর বাঁধিয়াছে সে তাহার বিবাহিতা স্ত্রী নয়, দেশে তাহার জমজমাট ঘর সংসার, স্ত্রী পুত্র মেয়ে জামাই জোতজমা অনেক কিছু আছে। এখানে কাজ করিতে আসিয়া একটি মেয়েকে লইয়া একটা ছোট সংসার পাতিয়াছে—তাহার ফল হইয়াছে একটি কন্যা। মাহাবীর জানে দুলালেরও নাকি জন্মপরিচয়ে এমনি একটি গল্প আছে। সেই হেতু তাহার নজর পড়িয়াছে দুলালের উপর। দুলাল কথাটা জানে না, মহাবীর এখন কথাটি ভাঙ্গে নাই। কিন্তু সে কথা যাক। আড্ডার সকলের প্রতিবাদে দুলাল খুসী হয়, তাহার থাকিতেও ইচ্ছা হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য তাহার অন্তরের অন্তরে যেন বিপরীত একটা প্রবলতর ইচ্ছা ঠিক সময়টিতে তাহার ঘাড় ধরিয়া আড্ডা হইতে টানিয়া তুলিয়া দেয়।

দুলাল বলে—না ভাই। মা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকবে। জানিস না তাকে।

শিউচরণ বলে—জানছে রে বাবা জানছে, সব জানছি আমরা। কেন বাবা বিলকুল ঝুটমুট বাত বলছ! যাও ঘর যাওরে বাবা, বিরিজ নন্দন—সাঁও লাগল--আঁধার নামল, শিয়াল ডাকল—বহুত রাত হল—তুমি ঘর যাও, মায়ের কোলে গিয়ে শুয়ে পড়, বাস্—শুয়ে শুয়ে—মায়ের মেন্থু খাও।

শিউচরণের কথার ভঙ্গিতে সকলেই হাসিয়া ফেলে, দুলালও হাসে; হাসিয়াই বলে—এ শালা কোনদিন মরবে রে আমার হাতে! দোব একদিন এক ডাণ্ডা বসিয়ে। ডিম ফাটা করে ফাটিয়ে দেব।

শিউচরণ মাথা নোয়াইয়া দিয়া বলে—মারো দাদা, ফাটায় দেও আমার মাথা। লেকেন তুমি ঘর যাও, তুমার ছাতি ফাট্ যাচ্ছে—দাদা হো—মায়ের মেন্থু খানেকেলিয়ে, ও আমি জানছে রে দাদা, তুমি ঘর যাও। তারপর সে শিশুর মত কাঁদিতে সুরু করে ও মা—গো! ওগো—মা—গো! কোলে নে গো! আঁধার হল গো! কোথা গেলি গো!

শিউচা না হইয়া অন্য কেহ হইলে দুলাল মারামারি করিত, কিন্তু ওই ছোট ছেলেটার কথাবার্ত্তা ধারাধরণ এমনি মিষ্ট যে কোন মতেই উহার উপর রাগ করা যায় না, উহার ওই কথাগুলি অন্য কেহ বলিলে ব্যঙ্গ হইয়া উঠিত—সূচের মত ধারালো সূক্ষ্ম মুখে অতর্কিতে বিঁধিয়া চকিত ক্রোধে বিচলিত করিয়া তুলিত, কিন্তু শিউচা'র কথা বার্ত্তা বলার ধরণ তাহার কণ্ঠস্বর এমন যে কথাগুলি নিছক রঙ্গ হইয়া উঠে, কথাগুলির মুখ সূক্ষ্ম হইলেও এমন নমনীয় যে গায়ে বেঁধে না—বাঁকিয়া যায়, সুড়সুড়ি দিয়া যেন হাসাইয়া দেয়। শিউচার রহস্যের রঙ্গে হাসিয়াই দুলাল সাড়ে আটটায় বাড়ী চলিয়া যায়।

আজ আড্ডায় শিউচা এবং দুই নম্বর বাস 'জয়-মা-তারা'র

ড্রাইভার উপস্থিত ছিল। "জয়-মা-তারা' চাকা খোলা অবস্থায় ইট এবং কাঠের মোটা টুকরার তোলানের উপর পড়িয়া আছে। কি-কি সব পার্টস খারাপ হইয়াছে সে গুলা না হইলে আর তাপ্পি মারিয়া চালানো অসম্ভব। স্বয়ং লালাজী কলিকাতায় গিয়াছেন পার্টস কিনিতে। ইতিমধ্যে চাকা খুলিয়া জয়-মা-তারাকে—ইট কাঠের তোলানের উপর চাপাইয়া তলার ময়লা মাটি ছাড়ানো চলিতেছে। শিউচা গাড়ীর তলায় শুইয়া লোহার টুকরা দিয়া মাটি ছাড়াইতেছিল আর তারস্বরে গান জুড়িয়াছিল। ড্রাইভার রামধনিয়া একটা খাটিয়ার উপর পড়িয়া ঘুমাইতেছে, মুখে রাজ্যের মাছি বসিয়াছে; সম্ভবত মদ খাইয়াছে। লোকটার চেতন নাই। দুলাল দুর্ব্বল শরীরে ক্রোশ দেড়েক পথ হাঁটিয়া আসিয়া গ্যারেজের সামনে বসিয়া পড়িল। ডাকিল—শিউচা!

গাড়ীর তলা হইতেই শিউচা জিজ্ঞাসা করিল—কে?

কণ্ঠস্বর দুর্ব্বল হইলেও দুলালের কণ্ঠস্বর চিনিতে তাহার কষ্ট হয় নাই কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিল না। এত বড় অসুখ হইতে এই সবে উঠিয়াছে দুলাল—সে সংবাদ তাহারা খুব ভালো করিয়াই রাখে; সুতরাং দুলাল এখন এখানে আসিবে কেমন করিয়া? তাই সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কে? সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর তলা হইতেই যথা সম্ভব ঘাড় উঁচু করিয়া দুলালকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল—আরে তুম্! ব্রিজ নন্দন!

—হ্যাঁ। বেরিয়ে আয়, জল দে দিকিনি এক গেলাস।

পিঠ ঘেসড়াইয়া শিউচা বাহির হইয়া আসিল। দুলালের শরীরের অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—আরে এমনি হালত্ হয়েছে তুহার? অাঁ। এহি হাল লিয়ে বাড়ীসে আসলি কি ক'রে? আরে নিকলালি কাহে রে ভাই?

—আগে জল দে।

—আরে নেহি। এই ধুপে এত্‌না পথ; এহি হালত্‌ তুহার; আবি পানি, না। থোরা ঠার্‌ যা।

—ওরে শালা—তেষ্টায় আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।

—তব, চা পিয়ো।

—না। জল দে। দিবি কি না বল্‌?

—সোডা পিয়ো তব। ছুটিয়া চলিয়া গেল শিউচা। দুলাল চালা ঘরটার ভিতর গিয়া একখানা খাটিয়া বাহির করিরা দড়ির ছাউনির উপরেই শুইয়া পড়িল।—আঃ! এইবার নিশ্চিন্ত। উঃ—কি বিপাকেই সে পড়িয়াছিল! এই সব ফেলিয়া সে ওই পাড়াগাঁয়ের আখড়ার জঙ্গলের মধ্যে ফোঁটা তিলক কাটিয়া—কণ্ঠী পরিয়া—মাথা নাড়াইয়া—মালা জপ করিবে!

শিউচা সোডার বোতলটা ভাঙিয়া তাহার হাতে দিল—পিয়ো।

ঢক ঢক করিয়া গিলিয়া সোডার বোতলটা শেষ করিয়া দুলাল বলিল—দুরো—ঝাল্‌ ঝাল্‌—ধেৎ! তারপর বলিল—আখড়া ছোড়কে আয়া শিউচা—আর নেহি যায়ে গা!

শিউচা অবাক হইয়া গেল। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—নেহি যায়ে গা?

—নেহি! কভি নেহি! হিঁয়াই পাক্কা ডেরা গাড়েগা। বাস্‌। সমুচা রাত চালাও ধাঁ ধাঁ—ধাঁ ধাঁ ম্‌ পিঁ-পিঁ-পিঁ-পিঁ পোঁ! ধেনেকেটে—ধেনেকেটে—তা ধিন—তা ধিন—ধা!

—বহুত আচ্ছা। শিউচা নাচিয়া উঠিল। শিউচার কল্পলোকের নায়ক হইল দুলাল; সবল পরিপুষ্ট শরীর, দুর্দ্দান্ত সাহস এই দুইটা শিউচার নাই। দুলালের আছে প্রচুর পরিমাণে। তাহার উপর দুলাল তাহাকে ভালবাসে। সত্যসত্যই ভালবাসে।

এক সময়—অর্থাৎ পরিচয়ের প্রথম দিকে দুইজনের মধ্যে ছিল প্রবল আক্রোশ। মহাবীর ড্রাইভারের মেয়ের প্রেম লইয়া দুজনে দুজনের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু দুলাল যেদিন প্রথম সদর শহরে গিয়া বেণী দুলাইয়া সহরের মেয়েদের ইস্কুলে যাইতে দেখিয়া ফিরিল সেইদিনই তাহার মহাবীরের কন্যার উপর আকর্ষণ ঘুচিয়া গেল এবং সেইদিনই সে শিউচাকে ডাকিয়া বলিল—এই শিউচা শোন!

হেঁট হইয়া শিউচা গাড়ীর যন্ত্রপাতি গুছাইয়া তুলিতেছিল—সেই অবস্থাতেই মাথাটা মাটির দিকে রাখিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার দিকে উদ্ধত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—কেয়া?

দুর্ব্বল শিউচার ওই দৃষ্টি দুলাল কখনও বরদাস্ত করিতে পারে না, অনেকবার এমন ক্ষেত্রে সে লাফাইয়া গিয়া শিউচার মাথাটা মাটিতে ঠুকিয়া দিয়াছে, অথবা পিছনে মারিয়াছে লাথি; শিউচাও সঙ্গে সঙ্গে হাঁকড়াইয়াছে—চাকা হইতে টায়ার খোলা ইস্পাতের চেপ্টা ডাণ্ডাটা!

সেদিন দুলাল সে সব কিছু করিল না—তাহার পরিবর্ত্তে গম্ভীরভাবে শিউচাকে ডাকিয়া বলিল—শুনে যা বলছি। এদিকে আয়! শোন! ভয় নাই। শুনে যা।

বিস্মিত হইয়া শিউচা কাছে আসিল এবং দুলালের অভয় দেওয়াকে তুচ্ছ করিবার জন্যই বোধ হয়—একেবারে মুখের কাছে বুকটা উচাইয়া দিয়া বলিল—কি?

এক কথায় দুলাল মহাবীরের কন্যাকে শিউচাকে দান করিয়া দিল—যাঃ তোকে দিলাম।

—কি?

—ড্রাইভার সায়েবের বেটীকে। যা তুই ওকে বিয়ে কর গে।

শিউচা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দুলাল একটা সিগারেট তাহার হাতে দিয়া বলিল—নে খা।

শিউচা সিগারেট ধরাইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—তুই ? তোর কি হ'ল ?

—সে তোকে ভাবতে হবে না। আমি বিয়ে এখন করছি না।

—এখন বিয়ে করছিস না ?

—না।

—কখন করবি ?

—সে বলব না। যখন করব তখন দেখতেই পাবি। তবে তুই পারিস তো ড্রাইভার সায়েবের মেয়েকে বিয়ে করগে। আমি ওকে বিয়ে করব না।

—তুই তো করবি না লেকিন—ড্রাইভারের বহু যে বাঙালীন ওযে ছাড়বে না তোকে। আর ওই মেয়েটা যে আমাকে দেখতে পারে না।

—ওরে শালা—সে তোর হাত। আমি ওকে পষ্টাপষ্টি বলে দোব। ওই যে, দাঁড়া—এখুনি বলে দিচ্ছি। এই—এই রঙ্গি—এই !

রঙ্গির ভাল নাম পুষ্পলতা। তাহার বাঙালীন মায়ের রাখা নাম, বাপ মহাবীর ছেলেবেলা হইতে রঙ্গিলা নাম রাখিয়া রঙ্গি বলিয়া ডাকে; রঙ্গি এখন বড় হইয়া রঙ্গি নামটা আদৌ পছন্দ করে না। সে মনেপ্রাণে ভাবে ভঙ্গিতে আধুনিকা বাঙালিনী হইতে চায়; জংশন ষ্টেশনে মধ্যে মধ্যে সিনেমায় গিয়া ফ্যাসান শিখিয়া আসে, গান শিখিয়া আসে। রঙ্গি বলিয়া ডাকিলে সে ভয়ানক চটিয়া যায়।

রঙ্গি আড়চোখে তাকাইল—কিন্তু উত্তর দিল না।

দুলাল আবার ডাকিল—এই। এই।

—কি ? কাকে ডাকছ ? আমাকে ?

—নয় তো কাকে ? শুনতে পাও না ?

—কেন পাব না ? কিন্তু রঙ্গি কি আমার নাম ?

—আরে গেল যা।

আরে গেল যা কিসের? আমার নাম.পুষ্পলতা। রঙ্গী বলে ডাকলে উত্তর দেব কেন আমি?

—আচ্ছা—আচ্ছা। শোন।

—কি? বল।

—শিউচা তোমাকে খুব ভালবাসে।

—ভাগ্।

—ভাগ্ নয়। আমি ভাই বিয়ে টিয়ে করব না বুঝলে—? তুমি ওকেই বিয়ে কর। আমি বলছি। বুঝলে?

—মরণ! বলিয়া রঙ্গি চলিয়া গিয়াছে।

রঙ্গি কথাটা কানেই তুলে নাই। সে আপনার গরবেই আছে। তাহার বিশ্বাস মুখে দুলাল যাই বলুক—তাহার হাসি কান্নায় দুলাল মাণিক মতি কুড়াইয়া পায়, ও কথাটা দুলাল শিউচাকে বোকা বানাইবার জন্য নেহাত ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছে! মহাবীর ড্রাইভারের আদরিণী মেয়ে সে, দুলারিয়া বেটীয়া, তাহাকে উপেক্ষা করে এমন সাধ্য দুলালের কি হইতে পারে? অন্ততঃ বাপের 'দুলারিয়া বেটী' রঙ্গি সে-কথা বিশ্বাস করে না।

রঙ্গি যে বিশ্বাস লইয়াই থাকুক, তাহাতে দুলালের কিছু আসে যায় না। সেও দুলাল—ব্রিজনন্দন, সে সাড়ে তিন হাত গোক্ষুর সাপ ছোট্ট একটা লাঠি দিয়া ঠেঙাইয়া মারে, সে আগুনের সঙ্গে লড়াই করে, সে এখানে কাহারও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করে না। সে জানে স্বয়ং মালিক লালা সাহেব তাহার কাজ দেখিয়া খুসী। মহাবীরের কথায় তাহার কাজ যাইবে না। সে শিউচাকে সরল অন্তঃকরণে সুস্থ

শরীরে রঙ্গিক দান করিয়া তাহার সহিত বন্ধুত্ব পাতাইয়া ফেলিল। প্রাণের বন্ধু করিয়া তুলিল।

তাই শিউচা আজ দুলালের সংকল্প শুনিয়া নাচিয়া উঠিল। দুলাল এখানে থাকিলে আড্ডা তাহাদের এখন জমিয়া উঠিবে!

এইবার তাহা হইলে দুলাল মদ খাইবে, গাঁজা খাইবে। মায়ের আঁচল ধরিয়া থাকিয়া দুলাল এখনও পুরা মরদ হইল না। ঘরেই আছে অথচ মদ খাইবে না। বলিবে—না ভাই—ওটি পারব না। একে বোষ্টুমের ছেলে—তার ওপর মা ভাই বড় খারাপ লোক। বকবে ঝকবে না—কাঁদবে শুধু।

তারপর শিহরিয়া উঠিয়া বলে—কে জানে ভাই, গলায় দড়ি-ফড়ি দিলে—মরে যাবে। আমার আর তখন পাপের সীমা থাকবে না।

জোর করিলে—দুলাল শক্ত হইয়া উঠে; কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলে—না। সে 'না'এর প্রতিবাদ দলের কোন লোক করিতে পারে না। শিউচা খুসী হইল, এবার আর দুলাল না বলিবে না।

*   *   *   *

লম্বা একটা ঘুম দিয়া দুলাল যখন উঠিল তখন অগ্রহায়ণের দিন গড়াইয়া আসিয়াছে। অপরাহ্ণ বেলার আলো কেমন নিষ্প্রভ লালচে হইয়া উঠিয়াছে। রাঢ়ের লালমাটির দেশ, লাল ধূলা উড়িয়াছে আকাশে। দুলাল আকাশের দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এমনি সমারোহের গোধূলি ফুটিলেই তাহার মায়ের মনে গান সাড়া দিয়া ওঠে। গুণ গুণ করিয়া আপন মনেই গান গায় আর কাজ করিয়া ফেরে। শুধু তাই নয় ছেলেবেলায় এমন গোধূলির ক্ষণে শত অপরাধ করিয়া ফিরিলেও মা তাহার উল্লেখই করিত না। ছেলেবেলায় সে খেলিয়া বাড়ী ফিরিত—

একেবারে ধূলায় ভূত হইয়া বাড়ী ফিরিত; নুনঝুড়ি, হাডু-ডু-ডু বা চিক্-খেলায় সে ছিল সকলের ওস্তাদ; হাডু-ডু-ডু খেলায় সে যাহাকে ধরিত সঙ্গে সঙ্গে সে ধূলার উপর আছাড় খাইয়া পড়িত—তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেও পড়িত; যাহাকে ধরিত সে পড়িত চিত হইয়া আর সে পড়িত উপুড় হইয়া। নখের ডগা হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত ধূলার একটা প্রলেপ পড়িয়া যাইত। বাড়ী ফিরিবামাত্র মা প্রায় প্রত্যহ একটী কথা বলিয়া আক্ষেপ করিত—হয় তো পুত—নয় তো ভূত। আমার যেমন কপাল তেমনি হবে তো!

গরমের দিন কোন কথা না বলিয়া তুলাল লাফাইয়া গিয়া পড়িত খালের জলে। জল তোলপাড় করিয়া—ব্রজদাসীর তিরস্কার শুনিয়া তবে উঠিত। শীতের দিন—মায়ের সঙ্গে ঝগড়া বাধিত। জল গামছা নামাইয়া দিয়া ব্রজ বলিত বেশ ভাল ক'রে মুছবি এতটুকু ময়লা যেন না থাকে গায়ে।

নাকি সুরে তুলাল কাঁদিত— যে ঠাণ্ডা, মা-গো!

ব্রজ বলিত—কেন ধূলো মাখবার সময় মনে পড়ে নাই মাকে?

সর্ব্বাঙ্গ ভিজা গামছায় মুছিয়া সেই গামছা কাচিয়া তবে পরিত্রাণ পাইত তুলাল। তারপর ব্রজদাসী তাহাকে নারিকেল তেল মাখাইত। নহিলে শীতের দিন সর্ব্বাঙ্গ ফাটিবে যে! কিন্তু রক্তসন্ধ্যা করিয়া যেদিন মনোরম গোধূলির সমারোহ ফুটিয়া উঠিত সেদিন ঘটিত অন্যরূপ। খেলা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই খেলার উত্তেজনা কাটে না, সঙ্গীদের সঙ্গে খেলার ভুলচুকের উত্তেজিত আলোচনা করিতে করিতে তুলাল বাড়ী ফিরিত—আশেপাশে দিকে দিগন্তরে কোথায় কি ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে খেয়াল থাকিত না, কিন্তু বাড়ীর তুয়ারে আসিয়াই বুঝিতে পারিত—আজ পৃথিবী রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। শুনিতে পাইত আখড়ার মধ্যে তাহার মা গুণ গুণ করিয়া

গান করিতেছে। যখন সে খুব ছোট ছিল—তখন মা তাহার এমন দিনে তাহাকে বুকে তুলিয়া ছড়া কাটিত—

ধুলোয় ধূসর নন্দ কিশোর ধুলো মেখেছে গায় !

সেদিন মা নিজেই তাহার গায়ের ধূলা মুছাইয়া দিত। তারপর পড়িত তাহাকে সাজানোর পালা। স্নানের পর যেমন মুখ মুছাইয়া চুল আচড়াইয়া দেয়—তেমনি আর একদফা সাজাইয়া চোখে কাজল দিয়া তবে ছাড়িত। এই সমাদরের স্বাদটি তাহার কাছে মধু অপেক্ষাও মধুরতর। চোখে যেন একটা রঙ ধরিয়া যাইত।

এমন সন্ধ্যা দুলালের কাছে আজও কাম্য হইয়া আছে। মানগোবিন্দপুরে আসিয়া নূতন পৃথিবীর রঙ লাগিল তাহার মনে। মোটর বাসে চাকরী লইল। কিন্তু শীতের অপরাহ্নে যেদিন রক্ত গোধূলির সমারোহ জাগিত সেদিন তাহার মন উতলা হইয়া উঠিত। কতদিন এমন হইয়াছে যে মোটর বাসের পা দানিতে দাঁড়াইয়া দুলাল গতির উল্লাসে, উচ্ছ্বসিত হইয়া চীৎকার করিতেছে "তুফান মেল—তুফান মেল—হট যাও—মুসাফির হট যাও; ঝন্‌-ঝন্‌ দুনিয়া সন্‌ সন্‌ তুফান, দব্‌ দব জান, চলো জোয়ান";—মনের উচ্ছ্বসিত উল্লাসে, স্বতস্ফূর্ত্ত-অর্থহীন সঙ্গতিহীন ছড়া আওড়াইয়া চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ চোখে ধরা পড়িল—শীতের অপরাহ্নের ধূলিধূসরতার সর্ব্বাঙ্গে ধরিয়াছে লাল রঙ, সঙ্গে সঙ্গে দুলাল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, মনে পড়িয়াছে মাকে, মোটরের শব্দের মধ্যে সে সেদিন মায়ের গুণ গুণ গান শুনিয়াছে—

"গোধূলি ধূসর শ্যাম কলেবর
আজানু লম্বিত বনমালা।"

এমন অপরাহ্নে মানগোবিন্দপুরে থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে সে লাফ দিয়া উঠিত। তার পরেই ভাবিয়া চিন্তিয়া মাথায় অথবা পেটে হাত

দিয়া যন্ত্রণাকাতরতার ভাণ করিয়া বলিত—"উঃ—হঠাৎ এ কি হ'ল? ওঃ—মাথার মধ্যে চিড়িক মেরে উঠল!" তারপর শুইয়া পড়িত, কয়েক মিনিট পর উঠিয়া বলিত—আজ আর ডিউটি দিতে পারব না। বড্ড যন্ত্রণা। বাড়ী চললাম।

আজও রক্ত সন্ধ্যা রঞ্জিত-গোধূলি ক্ষণটি দুলালের মনে মায়ের মুখ ভাসাইয়া তুলিল। মা এতক্ষণ বাড়ী ফিরিয়াছে নিশ্চয়, মহেশ মণ্ডলের কাছে সমস্ত কথা সে শুনিয়াছে, শুনিয়াছে—দুলাল বলিয়া গিয়াছে একটা তিলক ফোঁটা কাটা বৈষ্ণবের মেয়ে বিবাহ করিয়া মাথা মুড়াইয়া সে বৈরাগী বাবাজী হইতে পারিবে না। শুনিয়া মা তাহার কি করিবে?

দুলাল হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। মা কি করিবে সে কল্পনা করিতে পারিতেছে না। এতকাল মায়ের সঙ্গে তাহার কত ঝগড়াঝাঁটি হইয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া সে কোন দিন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসার মত ঘর ছাড়ে নাই।

শিউচা গরম জল করিয়া সাবান দিয়া হাত-পা-মুখের তেল কালী ধুইতেছিল—সে বলিল—ওঃ বহুত খটমল আছে উয়ো খাটিয়ামে। নেমে বোঠ ওহি বাসকে সিটের গদীটো লে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দুলাল বলিল—তবিয়েৎ বহুত খারাপ করছে শিউচা। একটু চা খাওয়াবি ভাই।

পিছনের দিকে দেওয়ালে ঠেস দিয়া জয়তারার ড্রাইভার একটা মদের বোতল লইয়া বসিয়াছিল, মদ পেটে পড়িলেই লোকটা গুরুগম্ভীর হইয়া উঠে, ঘোর মাখানো চোখ মেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, সঙ্গীরা হাস্যপরিহাস করে—সে তাহাতে যোগ দেয় না, হঠাৎ পরিহাসের

কথা লইয়াই এমন একটা গভীর ভাবের কথা বলিয়া ওঠে যে সমস্ত মজলিসটাই স্তব্ধ হইয়া যায়। শিউচা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল—তুম বহুত খারাব কাম কিয়া খিরিজনন্দন!

দুলাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া চিন্তা-স্তিমিত দৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া দেওকীনন্দন বসিয়া রহিয়াছে, ঠোঁট দুইটা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দুইকোণ বাঁকাইয়া যেন উদ্বেলিত বেদনার উচ্ছ্বাসকে চাপিয়া রাখিয়াছে কোন মতে। দুলাল জিজ্ঞাসা করিল—কি? কি খারাব কাম করলাম? এ খাটিয়াটা তোমার না কি?

দেওকী দৃষ্টি তুলিল না—ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—বহুত খারাবি কিয়া ভাই। সীয়ারাম, সীয়ারাম!

দুলাল আপন মনেই বলিল—মরেছে—পেটে পড়েছে আর—

দেওকী বলিয়াই চলিয়াছিল—তুমরা টাইফয়েড হুয়া, বহুত খারাব বেমার, বহুত খারাব। আঃ—আওর তুম এইসা শরীরকে হালত লেকে তুম চলা আয়া এতনা পথ, এহি ধূপ মে! বহুত খারাব। বহুত খারাব।

—ভাগ্। তিক্ত চিত্তে দুলাল উঠিয়া পড়িল। দোকানে গিয়া চা খাইয়া ওই খোলা মাঠটায় বসিবে, আকাশে রক্তসন্ধ্যা ক্রমশ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে।

দেওকী বলিল—কাঁহা যাতা হায়?

দুলাল আর একবার তাহার দিকে বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া চাহিল।

দেওকী বলিল—মৎ যাও। টাইফয়েড বহুত খারাব বেমার। হম জানতা হায়। অব দশ রোজ তো তুম শোতে রহো।

—ওরে বাবা, আমি চা খেতে যাচ্ছি। তুমি এত ভেবোনা আমার জন্যে

—আরে [illegible]—[illegible], চা কেয়া পিয়েগা ? মৎ পিয়ো চা ! বহুত খারাব। টাইফয়েডমে চা বহুত খারাব। অম্বল হোগা—উসসে ফিন জ্বর চলা আয়েগা ! বাস্ টাইফয়েড যব রিপীট করে গা—তো বাস্ হো যায়েগা খতম। মৎ পিয়ো চা।

—যাঃ গেল। এ তো বড় ফ্যাসাদে ফেললে রে বাবা। দুলাল খানিকটা ভয় বোধ হয় পাইয়াছিল। না হইলে কোন কথা না বলিয়াই সে অনেক আগেই চায়ের দোকানে গিয়া বসিত। দেওকী বলিল—এক কাম করো। দোঠো কুইনিন পিল মাঙ্গা লেও, আওর থোড়া দারুকে সাথ খা লিও। বাস্। তবিয়ৎ ভি আচ্ছা হোগা।

—মদে আর কুইনেনে ?

—হ্যাঁ। খা লেও—বাস্—তবিয়ৎ আচ্ছা হো যায়েগা।

—না।

শিউচা এতক্ষণ নীরবে মজা দেখিতেছিল, তাহার মুখ হাত ধোওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল ; মুখে মাথায় সাবান মাখিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া—পিট্ পিট্ করিয়া চাহিয়া সব দেখিতেছিল।

সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শিউচার এই খিল খিল হাসির মধ্যে ব্যঙ্গ আছে। দুলাল এই হাসিতে জ্বলিয়া যায়। দেওকীকে সে উপেক্ষা করিয়াছিল কিন্তু শিউচার ব্যঙ্গভরা হাসি সে সহ্য করিতে পারিল না। যাহা অসহ্য তাহা উপেক্ষাও করা যায় না। সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া একটা গর্জ্জন করিয়া উঠিল—শিউচা !

শিউচা বলিল কি ? চিল্লাচ্ছিস কেন ?

—হাসছিস কেন তুই ?

—তোকে দেখে আমি হাসি নাই। দেওকীর কথা শুনে হাসছি।

ও জানে না, খোখারা মদ খেলে মায়েরা গোস্যা করে। কান পাকড়কে।
—খবরদার !

রঙ্গিকে লইয়া আজ আর দুলালের উপর কোন অভিযোগ বা আক্রোশ না থাকিলেও দুলাল তাহাদের একজন হইয়াও বন্ধু হইয়াও তাহাদের সঙ্গে মদ খায় না—এ লইয়া একটা অভিযোগ শিউচার আছে। কিন্তু দুলালের গায়ের জোরকে শিউচা ভয় করে—তাই সাধারণত চুপ করিয়া থাকে, কখনও কখনও আক্রোশটা বেশী হইলে এমনি ধারার ব্যঙ্গহাসি হাসিয়া দুলালকে 'খোখা' বলিয়া ঠাট্টা করে। দুলালও এমনি গর্জ্জন করিয়া শিউচার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কিল চড় ঘুঁষি চালায়; শিউচা বেচারী রসিক হইলেও দুর্ব্বল মানুষ, দুলালের শক্তহাতের নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করিতে পারে না, হাত-জোড় করিয়া বলে—মাফি। মাফি মাংতা হ্যায়। এ ভাই নওজোয়ান—এ দুলাল।

জয় পরিতৃপ্ত দুলাল শিউচার ভঙ্গি দেখিয়া এবং নওজোয়ান সম্বোধন শুনিয়া হাসিয়া ফেলে, এবং ছাড়িয়া দিয়া বলে—বলবি আর ?

—নেহি। আরে বাপ্—কান পাকড়তা। কভি নেহি বলে গা !

—দেখিস ! মনে থাকবে তো ?

—থাকবে রে বাবা—থাকবে। আঃ দেখতো ক্যায়সা জখম কিয়া ! কপালে হাত বুলাইয়া ঘুঁষির আঘাতটা দুলালকে দেখায়।

দুলাল অনুতপ্ত হইয়া শিউচার কপালে হাত দিয়া সস্নেহে বলে—এঃ—জোর মার হয়ে গিয়েছে। তারপর বলে—তুই তো জানিস—আমার রাগ, কেন এমন ধারা রাগিয়ে দিস্ বল দি-নি ? চল টিংচার আইডিন লাগিয়ে দি।

ডাক্তারখানা হইতে আইডিন আনিয়া শিউচার কপালে লাগাইয়া

দেয়। তারপর কয়েক আনা পয়সা তাহাকে দিয়া বলে—যা আধপো মালের দাম দিলাম, খেয়ে গায়ের বেথা মেরে আয়!

শিউচা কিন্তু আজ দুলালের খবরদার গর্জ্জনকে গ্রাহ্য করিল না। রোগ শীর্ণ দুলাল আজ যদি তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে তবে সে আজ শোধ লইবে। সে আরও তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া বলিল—আরে বাপ্‌—খোখেয়াকে বহুত গোস্যা হো গিয়া। আও না—আও!

দুলালের আর সহ্য হইল না। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সে নিজের অবস্থা ভুলিয়া গেল, লাফাইয়া পড়িল শিউচার উপর। এই মুহূর্ত্তে শিউচা এইটাই চাহিতেছিল। সে আজ অনায়াসে প্যাঁচ কষিয়া ঘাড়ের উপর হইতে দুলালকে উল্টাইয়া আছাড় মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর বসিল। বলিল—আব্—মেরে খোখোয়া। বিরিজ নন্দন দুলালোয়া! হা—হা! দুলাল চীৎকার করিতেছিল উন্মত্ত ক্রোধে। শিউচা ঘুঁষি তুলিল। সে আজ শোধ তুলিবে। সাধ মিটাইয়া শোধ তুলিবে।

হঠাৎ দেওকী ছুটিয়া আসিয়া বলিল—লেও, পিলাও দারু।

শিউচা উল্লসিত হইয়া উঠিল ব্যাস্ ব্যাস, পিলাও, মারো বোষ্টো-মোয়াকো জাত খোখোয়াকো জোয়ান বনা দেও! পিলাও!

শিউচা দুলালের হাতখানা পা দিয়া শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। দুই কাঁধে দুইহাত দিয়া শক্ত করিয়া ধরিয়া দেওকীকে বলিল—লে—লে লে তু পিলা।

দুলালের দুই কষ চাপিয়া ধরিয়া দেওকী তাহার মুখে অনেকটা মদ ঢালিয়া দিল। না গিলিয়া উপায় ছিল না। শিউচা কাঁধের হাত ছাড়িয়া দিয়া নাক টিপিয়া দুলালের নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দিল। দুলাল গিলিল।

দেওকী বলিল—বস্ করো—ছোড় দো।

শিউচা বলিল—আওর থোড়া।

—নেহি। ছোড় দো।

শিউচা দুলালকে ছাড়িয়া দিয়া হাততালি দিয়া নাচিতে লাগিল। আজ তাহার পরম আনন্দ। দুলালের জাত মারিয়াছে।

দুলাল চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শিউচা এবার কাছে আসিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল—আরে কাঁদছিস কাহে? আঁ? ক্যায়সা লাগ্‌তা দেখ তো!

—ছাই লাগছে!

—নেহি! ঝুট বোলতা তুম্!

দেওকী বলিল—আওর থোড়া লি লে ভেইয়া। সব ঠিক হো যায়েগা।

দুলাল উঠিয়া দাঁড়াইল—আমি বাড়ী যাব।

বাড়ীই সে চলিয়াছিল।

বাজারের পথ দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতেই চলিয়াছিল। মনে মনে সে মায়ের নামই করিতেছিল ছোট-ছেলের মত। —মা—মা গো!

মানগোবিন্দপুর আধা শহর, গ্রামের চেয়ে শহরের প্রভাবটাই বেশী। বাজারটা বড়ই ছিল, এবার যুদ্ধের মরসুমে সেটা আরও বাড়িতে সুরু করিয়াছে। ধান চালের দর চড়িতেছে—সঙ্গে সঙ্গে বাজারটা কাঁপিতেছে। নতুন দোকান বসিতেছে। মাইল খানেক লম্বা হইয়া উঠিয়াছে বাজারের পথ।

অর্দ্ধেকটা পথ আসিয়া দুলাল থমকিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ মনে হইল তাহার দুর্ব্বল শরীর যেন যাদুমন্ত্রে সবল হইয়া উঠিয়াছে। মাথার মধ্যে ক্রোধ আক্রোশ যেন বৈশাখের আগুনের মত উত্তপ্ত লেলিহান

হইয়া জ্বলিতেছে! শিউচার টুঁটিটা ছিঁড়িয়া না দিয়া তাহার শান্তি নাই। সে ফিরিল।

হঠাৎ একটা মোড়ের মাথায় পথের ভিড়ের মধ্য হইতে কে তাহার জামার পিছনটা চাপিয়া ধরিয়া টানিল।

—কে? এ্যাই! দুলাল ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—ওরে শত্রু—ওরে—।

ব্রজদাসী!

ব্রজদাসী পথে-পথে আসিতেছে দুলালের খোঁজে। মোড়ের মাথায় পৌঁছিয়াই দেখিল—দুলাল। সে তাহার জামার পিছনদিকটা চাপিয়া ধরিয়া ডাকিল—ওরে শত্রু—ওরে রাক্ষস—! কিন্তু কথা তাহার শেষ হইল না, জিভে আটকাইয়া গেল। একটা কদর্য্য উৎকট গন্ধ তাহার নিশ্বাস আটকাইয়া দিল, কণ্ঠরুদ্ধ করিয়া দিল, বোধ করি হৃদ পিণ্ডটাও মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল!

পরমুহূর্ত্তেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল—দুলাল!

সে চীৎকারে পথের জনতা চকিত হইয়া উঠিল! মনে হইল কেউ যেন আকস্মিক মৃত্যুর অতি নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় সংসারের আপনতম জনটির নাম ধরিয়া শেষ চীৎকার করিয়া উঠিল।

—কি হ'ল? কে? কে? কার কি হ'ল?

কেহ উত্তর দিল না। কেহ বুঝিতে পারিল না কে চীৎকার করিয়াছে। ব্রজদাসী পরমুহূর্ত্তেই দ্রুতপদে যেন ছুটিয়া পলাইয়া চলিয়াছিল।

দুলাল দাঁড়াইয়াছিল অসাড় নিস্পন্দ—একটা মাটির পুতুলের মত।

দুলাল এখানে সকলের পরিচিত।

দুলালের নামটাও সকলের কানে গিয়াছিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল—কি রে দুলাল?

দুলাল অকস্মাৎ অগ্নিস্পৃষ্ট বিস্ফোরকের মত ফাটিয়া পড়িল, একটা ক্রুদ্ধ চীৎকার করিয়া তাহার গালে একটা চড় মারিয়া বসিল।

জনতা তাহাকে আক্রমণ করিল। প্রচণ্ড কোলাহল উঠিল। কিন্তু ব্রজদাসী ফিরিয়া চাহিল না।

সাত

ছুটিয়া পলাইয়াছিল।

ব্রজদাসী যেন সংসার হইতে ছুটিয়া পলাইবে। দুলাল মদ খাইয়াছে! বৈষ্ণবীর অন্তর হাহাকার করিতেছিল। ইহা অপেক্ষা দুলাল মরিল না কেন? হায় ভগবান, হায় রাধা গোবিন্দ—এত বড় অসুখে দীর্ঘ দেড়মাস দিন রাত্রি শিয়রে বসিয়া এই দেখিবার জন্য ওই রাক্ষসকে—ওই শত্রুকে সে বাঁচাইয়া তুলিল! আজ ষোল বৎসর ধরিয়া তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম ইষ্ট সাধনার অবসর খণ্ডিত করিয়া একটা মাংসপিণ্ডকে সে লালন করিয়া এতবড় করিয়া তুলিল—ইহারই জন্য! চোখ দিয়া তাহার বন্যা বহিতেছিল। হে ভগবান! কি করিবে সে? কোথায় যাইবে সে! এ লজ্জা কোথায় রাখিবে সে?

—ব্রজ! ব্রজদাসী! ব্রজ!

—এঁ্যা! ব্রজ বুঝিতে পারিল না কার কণ্ঠস্বর। সে হাঁপাইতেছিল।

—ব্রজ!

ডাকিতেছিলেন—মানগোবিন্দপুরের বাবাজী। ব্রজদাসী চলিয়াছিল মাঠের পথ ধরিয়া। বাবাজীর আখড়া মাঠখানার উপরেই এখান হইতে অল্প খানিকটা দূরে। ব্রজদাসীর গ্রামে ফিরিবার পথ কাঁচা শড়কটা ওই মাঠের উপরেই—আখড়ার কোল ঘেঁসিয়া চলিয়া গিয়াছে। ব্রজদাসীর খেয়াল ছিল না অথবা ইচ্ছা করিয়াই আখড়ার সান্নিধ্য এড়াইয়া মাঠে মঠে চলিয়াছিল—সে ব্রজদাসীও জানে না, সে শুধু চলিয়াছিলই। বাবাজী মাঠের মধ্যে কি যেন করিতেছিলেন, ব্রজদাসীকে এই ভাবে মাঠের পথে আত্মহারার মত ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন

ব্রজ বুঝিতেই পারিল না কাহার কণ্ঠস্বর।

সম্ভবত চরম লজ্জায় সে বুঝিতে চাহিতেছিল না। কি বলিবে সে বাবাজীকে!

—ব্রজ!

এবার ব্রজ ফিরিয়া চাহিল।

—কি হ'ল ব্রজ? এমন ক'রে—? কথা শেষ করিতে পারিলেন না বাবাজী। ব্রজদাসীর মুখের চেহারা দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। কি হ'ল? তবে কি রোগের হঠাৎ কোন নূতন আক্রমণে দুলালের কিছু হইয়াছে?

—কি হয়েছে ব্রজ? দুলাল—

ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল ব্রজদাসী।

বাবাজী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—দুলাল ভাল আছে ব্রজ

ব্রজ সেই মাঠের মধ্যেই বাবাজীর পায়ের উপর আছাড়খাইয় পড়িয়া বলিল—দুলাল কেন মরল না প্রভু? সে কি—

—কি হ'ল ব্রজ? এ কিঁ বলছ তুমি?

—দুলাল মদ খেয়েছে প্রভু! সে এর চেয়ে মরল না কেন? এ আমি কি করব? চোখের জলের আর বিরাম ছিল না।

বাবাজী যেন অকস্মাৎ একটা কঠিন আঘাত পাইলেন, চমকিয় উঠিলেন, কথা বলিতে পারিলেন না।

ব্রজ আকুল কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করিল—বলুন, আমি কি করব আমার পরিত্রাণের উপায় বলে দিন! সে প্রত্যাশাভরা নির্নিমে করুণ দৃষ্টিতে বাবাজীর দিকে চাহিয়া রহিল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাবাজী বলিলেন—পরিত্রাণ হয় তে আছে ব্রজ কিন্তু তা কি তুমি পারবে?

—পারব—খুব পারব। আপনি বলুন।

—ব্রজ—গাছ জীবনের সকল রস জমিয়ে তাকে জলে রোদে পাক ক'রে বহু কষ্টে ফুল ফোটায়—সেই ফুল থেকে হয় ফল; সেই ফল বাড়ে—তারপর একদিন পাকে—খসে পড়ে; সেদিন গাছের দুঃখটা বুঝতে পার? কিন্তু ফলের সেদিন পরমানন্দ। সে স্বাধীন জীবন পেলে মাটির বুকে—নিজের বীজকে ফাটিয়ে গাছ হবে। এ সংসারের নিয়মই এই। ওর আশা তুমি ছেড়ে দাও। ওকে যেতে দাও ওর নিজের পথে।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ব্রজ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বাবাজী দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—বৃন্দাবনে যাবে ব্রজ? যাও যদি, চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। সন্তানের দুঃখ বড় দুঃখ ব্রজ, আমার দুঃখ তো তুমি জান। পারবে—যাবে?

ব্রজ এ কথার জবাব দিল না, মনের আবেগে বলিল—আপনি তো অনেক জানেন, অনেক বোঝেন—বলতে পারেন এ আমার কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত? আমি তো কোন পাপ করি নাই। তবে, তবে আমার এ শাস্তি কেন?

বাবাজী হাসিয়া বলিলেন—শাস্তি তো নয় ব্রজ?

শাস্তি নয়?

—না। এই তো নারীজন্মের পরমানন্দ ব্রজ। বেদনার মধ্য দিয়েই সন্তানের জন্ম, সে বেদনায় মনে হয় ত্রি-সংসার বিলুপ্ত হয়ে গেল—অন্ধকারে, নিজের আত্মা দু'খানা হয়ে সন্তান পায় তার আত্মা!

ব্রজ অধীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল—না-না—প্রভু আমি জানি না ও আনন্দ যদি পেতাম ও যদি আমার

গর্ভের সন্তান হ'ত তবে যে আজ আমি নিজেকে বুঝাতে পারতাম। আমার পাপে ওর এই মতি—আমার রক্তের দোষে—ওর—

সে আবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কোনমতে আত্মসম্বরণ করিয়া চোখ মুছিয়া উদাস দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া বলিল—আজ ষোল বছর এ কথা আপনার কাছেও প্রকাশ করি নি। ও আমার গর্ভের সন্তান নয়—।

দিগন্তের দিকে চাহিয়াই সে বলিল—দিগন্তের পটভূমিতে যেন ষোলবৎসরের ইতিহাস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

—ওকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। বেরিয়েছিলাম বৃন্দাবনে। পদব্রজে। বড় মনের দুঃখেই বেরিয়েছিলাম—। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল পৃথিবী। প্রভু শ্যামচাঁদ আমাকে রূপ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। আর দিয়েছিলেন গান গাইবার কণ্ঠ। মা বলতো—আমার কোলে এসেই তোর সোনার কপালে ধূলো লাগলোরে ব্রজ; ভিখেরী বাউল বৈষ্ণবের মেয়ের গর্ভে জন্মালি—ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে ভিখারিণী তোকে সাজতেই হবে। নইলে যে রূপ তোর—যা তোর গানের কণ্ঠস্বর—তাতে রাজপুরীতে সোনার পালঙ্কে বসে তোর বীণা বাজিয়ে গান গাইতিস মা!

মেঘে ঢাকা শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদের মত বেদনাচ্ছন্ন একটুকরা হাঁসি ব্রজদাসীর ঠোঁটে ফুটিয়া উঠিল—সম্ভবত মনে পড়িয়া গেল আপনার সে রূপের কথা। বলিল তা রূপ আমার ছিল প্রভু। কপালে চাঁদ ফুটে উঠত পূর্ণিমার রাত্রে যখন চাঁদের পানে চাইতাম।

বাবাজী বলিলেন তুমি যে দিন দুলালকে কোলে নিয়ে নবীন ক্ষ্যাপার আঙিনায় বসে গান শুনিয়ে ছিলে ব্রজ, সে দিন পূর্ণিমা ছিল না—সে দিন

ছিল শুক্লপক্ষের একাদশী, সে দিনও তোমার কপালে চাঁদ আমি দেখেছিলাম।

না প্রভু দেখেন নি। আপনি যখন দেখেছেন তখন রূপে আমার কার্ত্তিকের রাত্রির ধোঁয়া ধূলোর মত কুয়াসার মত একটা ঝাপসা ছিল্কে পড়ে গিয়েছে। যখনকার কথা বলছি তখন কপালে আমার ফুটে উঠত শরতের চাঁদের আলোর মত ঝলমলানি। প্রভু আয়নায় নিজের মুখ দেখতাম—দেখে নিজেরই আমার আশা মিটত না। কিন্তু বিশ্বাস করুণ বাউল বৈষ্ণবের মেয়ে আমি, আমি মায়ের কথা শুনে সুখ পেতাম না। আমার এক গুরু ছিলেন সাধক বৈষ্ণব—তাঁর কথায় মন আমার ভরপুর হয়ে থাকত। আমার মায়ের কথা শুনে তিনি বলতেন—এ কি কথা গো ব্রজর মা! তুমি না বাছা বৈষ্ণবী! এমন রূপ কি ও অকারণে পেয়েছে? বৈষ্ণবের ঘর যমুনা তটের নিকুঞ্জ, নিকুঞ্জের ধারে যমুনার বুকে ফুটেছে শ্বেত কমল—ওতে হবে প্রভুর পূজা! ও হল কৃষ্ণ পূজার কমল, তাই জন্মেছে সাধন পথের পথিক বৈষ্ণবের ঘরে. ও যদি রাজার ছেলের গলার মালাই হবে তবে রাজবাড়ীর সরোবরে ফুটল না কেন? প্রভু তিনি গান গাইতেন "কৃষ্ণপূজার কমল কলি রাখব আমি মাথায় করে।" আমি সেই স্বপ্ন দেখতাম। মহাজনের পদাবলী তিনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন। ওই লীলার স্বপ্ন আমাকে বিভোর করে তুলেছিল। হায়রে দুর্ভাগা মানুষ! মানুষের মধ্যে দুর্ভাগা হ'ল মেয়ে জাত প্রভু! গুরু বলতেন "কৃষ্ণপূজার কমল" কিন্তু ভাবতেন না যমুনার জলে যে কমল ফুটতো—সে কখনও শুকাত না, কিন্তু মানুষের রূপ যৌবন যায়, কমল ফুলও শুকিয়ে যায়, সেদিন প্রভুর চরণ থেকে ধূলোয় গিয়ে পড়ে! প্রভু ভালবেসেছিলাম—ওই লীলাগানের কিশোরীর ভালবাসার মত একজনকে সেই বয়সে ভালবেসেছিলাম।

মনে হয়েছিল—ওর কাছে লজ্জা পায় রাজার ছেলে, ওই আমার রাজার রাজা, ওই হ'ল সকল গুণীর সেরা গুণী, ওই হল—সকল পুরুষের মধ্যে পুরুষোত্তম। সেও আমাকে সেদিন বলেছিল, বৈষ্ণব সে—সব মহাজনের সেরা মহাজন—প্রভু চণ্ডীদাসের পদ গেয়ে আমাকে শুনিয়েছিল। গেয়েছিল—"ও দুটি—।"

ব্রজদাসী চুপ করিয়া গেল। আজ এই বেদনার্ত্ত মনেও সে লজ্জা পাইল। সে সেদিন বলিয়াছিল—"ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি।"

কিছুক্ষণ পর ব্রজ বলিল—বিশ্বাস করেছিলাম। অকপটে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু শ্যামচাঁদ হয়তো হেসেছিলেন।

একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল সে। তারপর বলিল—শ্যামচাঁদকে তো চাই নি, চেয়েছিলাম তাকে, তাই প্রভু হেসেছিলেন, হয় তো বলেছিলেন—তোর কর্ম্মফল, আমার দোষ কি? নারী হয়ে জন্মেছিস, মহাজনের পদাবলী গান করেও—চোখ তোর ফুটলো না, সামান্য পুরুষে করলি পুরুষোত্তম বলে ভ্রম, তার ফল তোকে পেতে হবে—জানতে হবে মাটীর পৃথিবী নারী জন্মের কোন্ দাম দেয়, সেই দাম তোকে নিতে হবে। সে দাম নিতে হল, বুঝতে হল একদিন! বয়স বেড়ে আসছিল—আটাশ বছর বয়স যখন, দুলালকে পাবার মাস কয়েক আগে আমাকে সে ত্যাগ ক'রে নতুন বৈষ্ণবী নিয়ে এল ঘরে। বললে—আমার সাধনার সামনে—রূপ চাই যৌবন চাই তা' আজ আর তোমার নাই। লুকিয়ে আয়নায় মুখ দেখলাম ভাল ক'রে—দেখলাম সে মিথ্যে বলে নাই, রূপের ওপর আমার কার্ত্তিকের সন্ধ্যার কুয়াসার ছিল্‌কের মত ছিল্‌কে পড়েছে। প্রভু—কমল ফুল শুকিয়ে গিয়েছে। তাকে কি দোষ দেব? আমিই তো নিত্য আমাদের আখড়ার শ্রীমন্দির মার্জ্জনা করতাম, বাসি ফুলগুলি আমিই বের ক'রে

ফেলে দিতাম, বাসি ফুলের দাগ লেগে থাকলে ঘষে পরিষ্কার করতাম, নিজের হাত তাও ভাল ক'রে ধুয়ে ফেলতাম, দাগ উঠে গেলেও হাত শুঁকে দেখতাম—কোন গন্ধ উঠছে কি না। তখন বুঝলাম—নারী জন্মের দাম। এ পৃথিবীতে নারী জন্মের দাম রূপ আর যৌবন। ফুলের দল খসে যায়, তাতে ফল ধরে, বীজ হয়। সে বীজে গাছ হয় কিন্তু যে ফুল অন্তর শুদ্ধ দেবতার পায়ে না দিয়ে সেখানে ওঠে—তার না-হয় দেবতাকে পাওয়া, না হয় ফলে বীজে নূতন করে বাঁচা, তাকে ধূলোয় মিটিয়ে যেতে হয়। সেই দিনই আমি মনের ধিক্কারে বেরিয়ে পড়লাম। পৃথিবী তখন অন্ধকার। স্থির করলাম যে পুরীতে অক্ষয় চাঁদ বিরাজ করেন—সেখানে যাব। যাব বৃন্দাবনে। পদব্রজে যাব, ভিক্ষা করতে করতে চলে যাব।

আট

তখন মনে পড়িয়াছে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের—সকল দুখের সকল সুখের পরমাশ্রয়কে। দেবতাকে ইষ্টকে মনে পড়িতেই সে তাঁহার আশ্রয় লইতে ছুটিয়া চলিয়াছে। একা চলিয়াছে। রূপ যৌবন থাকিতেও পথ চলিতে ভয় করে নাই। কাঁধে শুধু একটি ঝুলি—বগলে একটি ছোট পোঁটলা—আর একটি ঘটি।

বেদনায় মানুষ যখন আপনাকে হারায়, তখন এমনই করিয়াই হারায়।

মাস খানেক পথ চলিবার পর হঠাৎ একদিন সে বিপদে পড়িল। পথ চলিতে চলিতে বড় একটা রেল-ষ্টেশনে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। ভিক্ষায় কিছু টাকা তাহার ইতিমধ্যেই জমিয়াছিল—সেই টাকায় একটা টিকিট করিয়া খানিকটা আগাইয়া লইবার অভিপ্রায় ছিল। যত দিন যাইতেছে—ততই পদব্রজে বৃন্দাবনে পৌছিবার উৎসাহে ভাটা পড়িতেছে। তাহার উপর সামনেই আছে বড় একটা নদী এবং জঙ্গল-সমাকীর্ণ কতকটা স্থান। জায়গাটা সম্পর্কে চুরি ডাকাতি রাহাজানির গল্প কাহিনীর মত এ-অঞ্চলে প্রচলিত। খানিকটা ট্রেনে চড়িবার সঙ্কল্প করিয়া সে নিজের উপরেই খুব খুশী হইয়া উঠিল। পথ চলিয়া ক্লান্তও হইয়াছিল। মনের ক্ষোভ, সংসারের উপর তিক্ততার পরিমাণ যতই হোক্—দেহ তো রক্ত—মাংসের মানুষের।

সমস্ত দিনটা ষ্টেশনের বাজারটায় গান গাহিয়া ভিক্ষাও মিলিল প্রচুর। অপরাহ্ণে সে আসিয়া [illegible] উঠিল; ষ্টেশনের যাত্রিশালা।

সেখানেও একদফা সে খঞ্জনী বাজাইয়া গান আরম্ভ করিল, সামনে পাতিয়া দিল নিজের ভিক্ষা-পাত্রটা।

গান শেষ হইতে ভিক্ষাপাত্রটায় পড়িল অনেক পয়সা দুইতে সিকি পর্য্যন্ত হঠাৎ একটা টাকা ঠং করিয়া পড়িল। সকলেই চমকিয়া উঠিল—দাতাকে দেখিবার জন্য, বৈষ্ণবীও মুখ তুলিয়াছিল। এক জন তকমা আঁটা আর্দ্দালি। সে বলিল—সাব বকশিস দিয়া! আপিস মে বইঠকে গীত শুনা। সে হাসিতে লাগিল। বৈষ্ণবী টাকাটা কপালে ঠেকাইয়া সাহেবকে নমস্কার জানাইল। চাপরাশী বলিল—সাহেব হুকুম দিয়া কি—

কে একজন বলিল—বাংলাতে চল বাবা। বষ্টুমী বষ্টুমী হায়—ব্রজধামের আহিরিণী নয়। হিন্দি-মিন্দি বুঝবে না।

—হাঁ হাঁ। সাহব হুকুম দিলো কি—উসকে বাংলামে লিয়ে আও, গানা শুনাও!

—সাহেব বাংলা গান শুনিবে? পর মুহূর্ত্তেই বষ্টুমী প্রশ্ন করিল—সায়েব বাঙালী না কি তোমাদের?

মুসাফেরখানার ষ্টলের একটা ছোকরা বলিয়া উঠিল—আমার চেয়েও রঙ কালো গো বষ্টুমী। রোজ ওই আর্দ্দালিটা বাজার থেকে পুঁইডাঁটা কুমড়োর ফালি নিয়ে যায় আমি দেখেছি।

বষ্টুমী হাসিয়া ফেলিল; সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িল—চল!

এদেশের মানুষ হইলে তাহার ভয় কি? তাহার কণ্ঠে প্রভুর লীলার মোহন মন্ত্র, সে মন্ত্রে, সে গানে পাষাণ গলে, পশু বশ মানে! পথে বাহির হইয়া দেখিল সে অনেক! গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে গান গাহিয়া ভিক্ষা মাগিয়া শুধু তো মুষ্টি ভিক্ষাই পায় নাই—ওই একমুষ্টি চালের সঙ্গে তাহাদের কত ভালবাসাই না পাইল সে।

সায়েব? সায়েবও সে দেখিয়াছে। সদর শহরে দিন কয়েক ভিক্ষা করিয়াছে—সেখানে খাঁটি সাহেব মেকী সাহেব দেখিয়া আসিয়াছে এই দিন কয়েক আগে। মেকী সাহেবের বাংলায় সে দেখিয়াছে—সাহেব সাজিয়া মুখে চুরুট চাপিয়া কর্ত্তা বলিয়াছে—কেয়া মাংটা, বাগো। দিব্য আলতা পায়ে গরদের শাড়ী পরিয়া গিন্নী বাহির হইয়া আসিয়া বলিয়াছে—মরণ! ফকীর বষ্টুম ভিক্ষে চাইতে এসেছে—তাদের কাছেও হিন্দী চালাচ্ছ? এসো গো বাছা—এস ভিক্ষে নিয়ে যাও!

বষ্টুমী বলিয়াছিল—প্রণাম মা-ঠাকরুণ গান শুন্‌বেন?

—গান? গান জান? গাও, গাও! শুনব বই কি?

বষ্টুমীর মনে দুর্বুদ্ধি জাগিয়াছিল। খঞ্জনীতে ঘা দিয়া বলিয়াছিল—ব্রজেশ্বরী রাধা মান করেছেন—শ্রীগোবিন্দ নাপতানী সেজে এসে আলতা পরাব বলে পায়ে ধ'রে মান ভাঙাচ্ছেন।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতিদর তিমিরমতি ঘোরং।

গানটা সে জমাইয়া ধরিয়াছিল। বাংলার যত চাকর-আর্দ্দালি আসিয়া আনাচে কানাচে দাঁড়াইয়া গান না শুনিয়া পারে নাই। সে যাহা চাহিয়াছিল, তাও হইয়াছিল। খোদ সাহেব আসিয়া নিজেই একটা বেতের চেয়ার টানিয়া গিন্নীর পাশে গান শুনিতে বসিয়া গিয়াছিলেন। গিন্নী নাকে কাপড় দিয়া বলিয়াছিলেন—উঃ! সাহেব চমকাইয়া উঠিয়া—ওঃ! বলিয়া হাতের চুরুটটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। বষ্টুমী গান গাহিতে গাহিতেও না হাসিয়া পারে নাই মুহূর্ত্তে বুঝিয়া লইয়াছিল—চুরুটের গন্ধ গিন্নীর সহ্য হয় না। সাহেবকে চুরুট খাইতে হয়—গিন্নীর সঙ্গে আলাপের সময় বাদ দিয়া!

শেষ 'দেহি পদপল্লবমুদারুম্'—কলিটি গাহিয়া গান শেষ করিতেই

খাঁটি বাংলায় সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—বাঃ, চমৎকার! যেমন তোমার গলা তেমনি তুমি শুদ্ধ ক'রে গাইলে। কার কাছে গান শিখেছ?

দুই হাত কাপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল—বাউল গুরুর কাছে প্রভু! তিনি নিজেই ছিলেন মহাজন! গুরুর নাম স্মরণ করিতে তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। কৌতুক বোধ—রসিকতার ইচ্ছা —সব ওই দুই ফোঁটা চোখের জলের মধ্যে দুই বিন্দু অগ্নি কণার মত পড়িয়া নিবিয়া কোথায় তলাইয়া গেল; বিন্দু সিন্ধু হইয়া উঠে সময়ে সময়ে, দুই বিন্দু চোখের জল তাহার দুই সমুদ্র হইয়া উঠিল যেন!

সেদিনও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে গুরুকে স্মরণ করিয়া সে পা বাড়াইল। জয় গুরু—জয় রাধেশ্যাম! তারপর একটু হাসিয়া বলিয়াছিল—চল দেখি তোমার সাহেব কেমন? চাপরাশীটাও কথা শুনিয়া হাসিয়াছিল।

রেলের লাইন দেখিয়া বেড়ান সাহেব। ষ্টেশন হইতে লাইন ধরিয়া খানিকটা গিয়া সাহেবের বাংলা। যেমন নির্জ্জন গাছ-পালায় ছায়াঘন। আগে আগে লাইন দেখিয়ে সাহেবেরা ছিলেন খাঁটি সাহেব অথবা আধা সাহেব অর্থাৎ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। এখন এদেশী লোক ওই চাকরী পাইতেছে। কিন্তু আসনের বা পদের একটা মহিমা আছে! ষ্টলের ছোকরা মিথ্যে বলে নাই—বাড়ীতে পুঁই ডাঁটা কুমড়োর ফালি আসে, কিন্তু সাহেব টেবিলে বসিয়া খান। বারান্দায় দরজার পাশে একটা আশ্চর্য্য রকমের কুকুর ঘাড় গুঁজিয়া ঘুমাইতেছিল। পায়ের শব্দে কুকুরটা মুখ তুলিয়া দেখিয়া আড়মোড়া ছাড়িয়া লইল। আর্দ্দালিটা বলিল—যাও—যাও!

বষ্টুমী থমকিয়া দাঁড়াইল।

—চলো-চলো—ডর নেহি হ্যায়!

—না।

ঠিক এই মুহূর্ত্তে সাহেব বাহির হইয়া আসিল। আর্দ্দালি বলিল—কুত্তা দেখকে ডরতি হ্যায় হুজুর!

সাহেব হাসিয়া কুকুরটাকে ডাকিয়া তাহার ঘাড়ে চাপড়াইয়া বলিল—দেও—সেলাম দেও।

কুকুরটা একটা পা তুলিয়া মাথাটা ঈষৎ নামাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—একেবারে নিরীহ ভেড়ার বাচ্চার মত। সাহেব বলিল—এস—তোমাকে কিছু বলবে না, সেলাম দিচ্ছে তোমাকে।

—মা-ঠাকরুণ কই?

—আছেন—আসছেন, ভেতরে এস।

নিঃশঙ্ক মনেই বষ্টুমী বারান্দায় উঠিয়া বলিল— এইখানেই বসি!

—না, এই সামনের বসবার ঘরে!

চমৎকার সাজানো ঘর। কত আসবাব। বষ্টুমী ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—গিন্নী মায়ের জয় হোক। আসুন মা!

সাহেব একটা চেয়ারে বসিয়া বলিলেন—বস।—কই, মা-ঠাকরুণ কই।

—তুমি গান ধর না! আসবেন, গানের সাড়া পেলেই আসবেন।

বলিয়া কুকুরটার মাথায় একটা চাপড় মারিয়া ইংরাজীতে কি বলিলেন। কুকুরটা পাশেই দিব্য শ্রোতার মত বসিয়া গেল!

বষ্টুমী আবার বলিল—মা-ঠাকরুণ কই? কণ্ঠস্বর তাহার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে! এমন নিস্তব্ধ বাড়ীটায় সূচ পড়িলেও শব্দ ওঠার কথা, কিন্তু মানুষের কোন সাড়া নাই কেন? মধ্যে মধ্যে এক-আধটা পাখী শুধু ডাকিয়া উঠিতেছে।

সাহেব এবার বলিলেন—মা-ঠাকরুণ বাড়ী নেই। তাতে কি হয়েছে? তুমি গান শোনাও না!

—না! আমাকে তবে মিথ্যে বলে ডেকে আনলে কেন আপনার লোক?

—উঠো না, বস।

—না। সে মুহূর্ত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ওই প্রকাণ্ড কুকুরটা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কঠিন দৃষ্টিতে তাহাকে যেন চোখ রাঙ্গাইয়া শাসন করিয়া নিম্ন সুরে একটা হিংস্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল—গোঁ—! গোঁ—!

সাহেব হেসে উঠল হি-হি করে। বললে—এবার নড়লেই ও তোমার কাঁধে পা তুলে দিয়ে দাঁড়াবে। বস—বস। গান শোনাও!

ভয়ে বষ্টুমীর সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ হইয়া গেছে। সে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সাহেব আবার একবার হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া সে নিজেকে সম্বরণ করিল। তারপর খঞ্জনীতে ঘা দিয়া গানও শুনাইল। গান শেষ করিয়া বলিল, এইবার আমি যাই। বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুটাও উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার গোঁঙাইয়া উঠিল।

সাহেব হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল—আজ তোমাকে রাত্রিটা এখানে থাকতে হবে। বুঝেছ না? খালি বাংলা, মেয়েরা কেউ নেই, রাত্রে থাকবে—গান শোনাবে— —নাচতে পার—নাচতে?

সে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল—না!

সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও বার দুই গম্ভীর আওয়াজ করিয়া ডাক দিল —ঘাউ—ঘাউ!

সাহেবও কুকুরটার সুরে সুর মিলাইয়া হো-হো শব্দে হাসিয়া

উঠিল। তার পর আবার বলিল—দেখলে তো! জ্যাকের মত কুকুর আর হয় না। বুঝলি জ্যাক, এ রইল। খবরদার—চেঁচাতে দিবি না, নড়তে দিবি না। আমি চললাম এখন।

নৃশংস লোকটা—লোকটা নয় পশুটা ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

* * *

ষোল বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। আজ ষোল বৎসর পরেও সেই ঘটনার কথা মনে করিয়া ব্রজদাসী শিহরিয়া উঠিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। বলিল সে দিন আমার মনে বাবাজী বলিলেন থাক—ব্রজ—থাক—

—না। আজ ষোল বছর কলঙ্কের পসরা মাথায় করে লুকিয়ে রেখে এসেছি—সে কথা আজ না বলে আমি শান্তি পাচ্ছি না। —জানে দুজন—আপনিও শুনুন। নইলে শান্তি পাব না—স্বস্তি পাব না আমি। ম্লান হাসিতে বাবাজীর মুখ সকরুণ হইয়া উঠিল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন তিনি।

আঁচলের খুঁটে চোখ মুছিয়া ব্রজ বলিল—কি করব? মনে মনে শ্যামকে ডাকলাম। বললাম—এই তোমার মনে ছিল? শেষে কি এমন ভয়ঙ্কর সাজা দিবে আমাকে? আমার গুরু একটি গল্প বলতেন। তাঁর গুরুর গল্প। তাঁর গুরুর আখড়ার ছিল না কি খুব জম-জমাট। মহাপ্রভুর শ্রী-অঙ্গে ছিল অনেক অলঙ্কার। লোকে বলত' টাকাটাও না কি ছিল অনেক। একদিন রাত্রে পড়ল ডাকাত। দরজা ভাঙছিল তারা, আমার গুরুর গুরু নিজেই দরজা খুলে বেরিয়ে এসে হাত জোড় করে বললেন—এলে—এলে—শেষে এই রূপেই এলে? তারা কথা শুনতে আসে নাই—এসেছিল ডাকাতি করতে, তারা প্রথমেই তাঁকে মারলে, মাথায় লাঠি মারলে। চাইলে কোথায় কি আছে দে। তিনি হেসে বললেন—

নাও ; সঞ্চয়ের মতি হয়েছিল—তোমার নাম করে সঞ্চয় করেছি—সে সঞ্চয় নিতে তোমার এই রূপেই তো আসার কথা। এসেছ—নাও। তিনি মন্দিরের দরজা খুলে একে একে খুলে দিলেন—সব অলঙ্কার। তারা বললে—টাকা! কিছু টাকা পুতে রেখেছিলেন—তাও দেখিয়ে দিলেন। তারা বললে—আর? তিনি হাত জোড় করে বললেন,—আর তো নাই প্রভু। তারা তা বিশ্বাস করলে না, জ্বলন্ত মশাল দিয়ে মেরে সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। তাতেই তিনি দেহ রেখেছিলেন। আমার গুরুকে বলেছিলেন—বাবা—এই না হ'লে আমার মুক্তি ছিল না, তাঁর চরণ—পেতাম না আমি। অমার সাধনের ফাঁকি যে টুকু ছিল—সেটুকু তিনি নিজে হাতে ঘুচিয়ে দিয়ে গেলেন ওই মূর্ত্তিতে এসে। ইদানীং আমিও এই রকম ভাবছিলাম। বড় মমতা ছিল আমার। ঘুচে গেল, ঘুচিয়ে দিলেন, এইবার তাঁর মদন মোহন রূপ দেখতে পাব আমি!

ব্রজ বলিল—সে দিন ওই গল্পটি মনে পড়েছিল। মনে হয়েছিল—দিতে তো পারি নি নিজেকে ভুলে—নিজেকে তুলে—দিতে যদি পারতাম তবে কি সে আর একজনকে ঘরে আনলে বলে—এমন করে চলে আসতে পারতাম? তাই কি শেষে এই ভয়ঙ্কর বেশে প্রভু অমার এই সাজা দিচ্ছেন? কেঁদে উঠেছিলাম ফুঁপিয়ে কেঁদে গলা ছেড়ে ডেকেছিলাম—দয়া কর গোবিন্দ—! সঙ্গে সঙ্গে কুকুরট' উঠল গর্জ্জে। ভয়ে গলা বন্ধ হয়ে গেল—আমি যেন কাঠ হয়ে গেলাম।

আবার সে শিহরিয়া উঠিল। চোখের সম্মুখে সে দিন আবার ভাসিয়া উঠিল।

*   *   *

জীবনে সে এক যন্ত্রণার দিন। এমন নিষ্ঠুর যন্ত্রণা সে জীবনে কখনও ভোগ করে নাই। নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড বাড়ী চারি দিকে গাছ-

পাড়ার মধ্যে শুধু ঝিঁঝিঁ ডাকিয়া চলিয়াছে ওই এক টানা নিম্ন স্বরের ডাক—যেন একটা কান্নার প্রবাহের মত বাহিয়া চলিয়াছে। ঠিক যেন তার অন্তরের কান্নার প্রতিধ্বনি। বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—তাহার অন্তরাত্মা কাঁদিয়াই চলিয়াছে। মুখের সামনে স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া প্রকাণ্ড কুকুরটা বসিয়া আছে বিভীষিকার মত। তৃষ্ণায় তাহার বুক হইতে ওষ্ঠপ্রান্ত পর্য্যন্ত শুকাইয়া যেন বৈশাখের বালুচর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কাহাকেও ডাকিবার উপায় নাই, চীৎকার করিবার উপায় নাই।

হঠাৎ একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। অতি সামান্য ঘটনা—কিন্তু বৈষ্ণবীর চোখে সেটা অঘটন বলিয়াই মনে হইল। বাড়ীর পাশের জঙ্গল হইতে সামনের ঘরটার খোলা জানালা দিয়া লাফাইয়া ঘরে ঢুকিল একটা বড় বেজীর মত জানোয়ার। বৈষ্ণবী দেখিল, কিন্তু কুকুরটা দেখিতে পায় নাই। জানালাটা যে ঘরের—সেই ঘরের দিকে সে পিছন ফিরিয়া বসিয়া আছে। শুধু নাকটা তুলিয়া ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল;—গন্ধ বৈষ্ণবীও পাইয়াছিল—সে বুঝিল—খাদ্য লোভে কোন লোভী খাটাশ আসিয়া ঢুকিয়াছে। হতভাগ্য খাটাশ। ও ঘরের কোন একটা জিনিব ঝন-ঝন শব্দে উল্টাইয়া ফেলিল। এবার কুকুরটা লাফ দিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া ছুটিল। খাটাশটা ছুটিয়া পলাইতেছে। কুকুরটাও ছুটিয়াছে। খাটাশটার উপর একটা লাফ দিয়া পড়িল। কিন্তু খাটাশটা তাহার পূর্ব্বেই লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িল একটা আলমারীর মাথায়—সেখান হইতে লাফ দিয়া খড়ো বাংলাটার চালের কাঠ নখ দিয়া আঁচড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল।

কুকুরটা লাফ দিতে সুরু করিল। মুহূর্ত্তে বষ্টুমীর চেতনা ফিরিয়া আসিল। প্রাণপণে দেহের কম্পন—মনের ভয়কে লঙ্ঘন করিয়া উঠিয়া

পড়িল। ছুইটা ঘরের মাঝের দরজাটা টানিয়া ধরিল; বৈষ্ণবীর ভাগ্য, বন্ধ করিয়া দিতেই বিলাতি ঢংএর ছিটকানি খট্ শব্দ করিয়া বন্ধ হইয়া গেল। ওদিকে কুকুরটা তখন খাটাশটাকে লইয়া মাতিয়া আছে, ঘরময় লাফাইয়া লাফাইয়া বেড়াইতেছে, গোঁঙাইতেছে। খাটাশটাও বোধ হয় চালের কাঠে কাঠে ছুটিয়া ফিরিতেছে। খর-খর শব্দ উঠিতেছে ঘরের চালের কাঠামোয়।

বৈষ্ণবী কোন্ পথে পলাইবে? পথ? পথ কই? পিছনের দিকে সে একটা জানালা খুলিয়া ফেলিল। জানালাগুলায় শিক নাই। প্রাণপণ চেষ্টায় সে জানালার উপর উঠিয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়িল! এই দিকেই তাহারা ঢুকিয়াছিল বাংলায়, এটা পিছনের দিক। ছোট একটা ফটক। ফটক খুলিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে। সে অন্ধকারের মধ্য দিয়া সামনে যে দিকটা পড়িল—সেই দিকেই ছুটিল।

ছুটিয়াই চলিয়াছিল।

কতক্ষণ চলিয়াছিল—হিসাব নাই। হিসাব রাখিবার মত মনের অবস্থাও নয়। শুধু সে পলাইয়া চলিয়াছে। কুকুরটা যদি জানিতে পারিয়া ছুটিয়া থাকে পিছন-পিছন? মধ্যে একবার সে থামিয়াছিল; মাঠে একটা কুকুর দেখিয়া না থামিয়া পারে নাই। তৃষ্ণায় বুকখানা ফাটিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছিল! ছুটিয়া গিয়া ঘাটে নামিয়াছিল সে। অঞ্জলিতে ভরিয়া জল পানের বিলম্ব সহ্য হয় নাই। জন্তুর মত জলের উপর মুখ রাখিয়া চোঁ-চোঁ শব্দ তুলিয়া সে জল পান করিয়াছিল। তাহার পর আবার চলিয়াছিল। মাঠে মাঠেই চলিয়াছিল। চলিতে চলিতে সামনে পড়িল একটি নদী। এ দেশের নদীতে বর্ষার সময় ছাড়া জল বড় একটা থাকে না। সময়টা বর্ষা নয়—

ফাল্গুনের শেষ, কিন্তু তবু সে নদী পার হইল না। পা-ও আর তাহার চলিতেছে না। আর সে পারিতেছে না—আর সে পারিবে না। সেই ভয়ঙ্কর কুকুরটা যদি এখানে আসিয়াও তাহাকে টুকরা-টুকরা করিয়া ছিড়িয়া ফেলে, ফেলুক ছিঁড়িয়া—আর সে পারিবে না! পাশেই একটা জঙ্গল। সে সেই জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িল। একটা গাছতলায় মাথা রাখিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

কৃষ্ণ-পক্ষের একাদশী। দুলালের জন্মতিথি। সে তিথি কি ভুলিবার! বাইশ দণ্ডেরও বেশী রাত্রি তখন চলিয়া গিয়াছে। কারণ আকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল বষ্টুমীর। ক্লান্তির মধ্যেও আতঙ্কের প্রভাবে চেতনা তাহার সজাগ ছিল। ফাল্গুনের ঝরা-পাতার উপর কাহারও ভারী পায়ের শব্দে সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—কে?

মুহূর্ত্তে কে যেন খানিকটা দূরের একটা গাছতলায় হেঁট হইয়া কি করিতেছিল, বিদ্যুৎগতিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বষ্টুমীও উঠিয়া দাঁড়াইল; আতঙ্কে তাহার সর্ব্বশরীর থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। চন্দ্রালোকের রহস্যময় স্বচ্ছতার মধ্যে একটা সাদা মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া উঠিল। সে আবার প্রশ্ন করিতে চেষ্টা করিল—কে? কিন্তু গলার স্বর বাহির হইল না। ওদিকে মূর্ত্তিটাও একটা অস্ফুট ভয়ার্ত্ত চীৎকার করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল, সামনে নদী, নদীতে ঝাঁপ দিতে ভয় করিল না। বষ্টুমী দেখিল, জ্যোৎস্নায় আলোকিত ওপারের বালুচরের উপর দিয়া মূর্ত্তিটা চলিয়া গেল—ক্রমে বালুচরের শেষে স্থির কালো একটা কিছুর মধ্যে মিশিয়া গেল। ওটা একটা গ্রাম, গাছ-পালাগুলি স্থির কালো মূর্ত্তি লইয়া জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে!

এ দিকে একটা অদ্ভুত অবিশ্রান্ত শব্দ।

কান্নার শব্দ! শিশু-কণ্ঠের কান্নার শব্দ! গাছতলা হইতে এক-পা-এক-পা করিয়া আগাইয়া গেল বষ্টুমী। আকাশে চাঁদ—বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; জঙ্গলের ভিতরেও মধ্যে মধ্যে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না আসিয়া মাটির উপর পড়িয়াছে। সাদা আলোর মধ্যে কালো-কালো এ গুলো কি? কয়লা, কাঠ-কয়লা! ওটা কি? খালি কলসী কাত হইয়া পড়িয়া আছে। রাজ্যের কাপড়-বিছানা ওই—ওই—দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এবার বেশ সতর্ক হইয়া হেঁট হইয়া দেখিল—নজরে পড়িল—হাড়; টুকরা টুকরা হাড়ও ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! তাই বটে! শ্মশানই বটে! কিন্তু এখানে শিশু কাঁদে কোথায়, কাঁদিবে কি করিয়া! ভয়ে তাহার শরীর আবার কাঁপিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল ছুটিয়া পলাইয়া যায়! কিন্তু তা-ও সে পারিল না। ভয়েই পা উঠিতেছে না। একটাগাছের ডাল সে সজোরে মুঠিতে আঁকড়াইয়া ধরিল; তাহার পায়ের কাছেই কান্নাটা যেন মাটি হইতে উঠিয়া আসিতেছে। একেবারে পায়ের তলায়। সভয়ে সে বসিল। তীক্ষ্ণ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। গাছের ছায়ার তলে—একটা পোঁটলা; কান্না বাহির হইয়া আসিতেছে তাহারই ভিতর হইতে। হাত কাঁপিতেছিল; সেই হাতেই কোন মতে সে পোঁটলাটা তুলিয়া লইল। সে ক্ষণের সে মন, মনের সে উদ্বেগ—সে যন্ত্রণা—সে ভয়—জীবনে তাহার অনাস্বাদিত; মন চীৎকার করিতেছিল—না—না—চাই না। হাত দুইটা থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল! কিন্তু ওই পোঁটলার বাঁধন খুলিয়া শিশুটিকে না দেখিয়া তাহার পরিত্রাণ নাই, চুম্বকে এবং লোহাতে যেমন জড়াইয়া যায়—তেমনি ভাবেই হাতের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছিল, হাত কাঁপিতেছিল। পোঁটলা কাঁপিতেছে, পড়িতেছে না; পড়িলে পোঁটলার সঙ্গে সে-ও উপুড় হইয়া মাটির উপর পড়িয়া যাইবে।

কোনক্রমে পরিপূর্ণ চাঁদের আলোতে আনিয়া মাটিতে নামাইল—বাঁধন খুলিল।

* * *

ব্রজদাসী বলিল—প্রভু সেদিনের সে শেষ রাত্রি আমার আজিও মনের মাঝে জ্বল জ্বল করছে। চোখ বুজলে মনে হয়—আমি যেন সেই—নদীর পাড়ে শ্মশানের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছি; চারিদিকে বড় বড় গাছের বন, মাটির উপর জ্যোৎস্নার টুকরো টুকরো আলো পড়েছে। আমি ছেলেটিকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে বুকে ধরে থর থর করে কাঁপছি। অন্ধকারে চোখে দেখতে পাইনি প্রভু—তবু ছেলেটিকে জড়ানো কাপড় আর ছেলেটির শরীর নেড়ে বুঝতে পারলাম—তার অঙ্গে তখনও মায়ের রক্ত মাখানো রয়েছে। কি যে হল, কি যে করব ভেবে পেলাম না। শুধু কাঁদলাম—। বলুন তো প্রভু—মানুষের শিশু কেমন করে সেই শ্মশানে তাকে ফেলে দিই? কিন্তু আমি বৈষ্ণবী বৃন্দাবনের পথে পা বাড়িয়েছি—আমিই বা এই জীবটিকে নিয়ে কি করি? মনে মনে বললাম—গোবিন্দ তুমি পথ বলে দাও! গুরুকে স্মরণ করলাম—বললাম—গুরু তুমি আমাকে রক্ষা কর!

বাবাজী বলিলেন—গোবিন্দ তোমাকে ঠিক পথই দেখিয়েছিলেন ব্রজদাসী। গুরু তোমাকে রক্ষা করেছিলেন; হতভাগা শিশু—মা—বাপ যাকে পরিত্যাগ করে শ্মশানে ফেলে দিলে—তাকে দেখেও—যদি তুমি তুলে না নিতে—চলে যেতে বৃন্দাবনের পথে—তবে বিগ্রহই তুমি দেখতে, গোবিন্দকে তুমি পেতে না! এ তুমি ঘরে ব'সে গোবিন্দকে পাবার পথ করেছ ব্রজ।

ব্রজ তীব্র আক্ষেপে ঘাড় নাড়িয়া কথাটা অস্বীকার করিয়া বলিল—না—না—না। এ—জীবনে পেলাম না, পাব না। তা হ'লে—ওই

দুলাল—তার মতি এই হয় ? আমার দুর্মতি প্রভু, আমার লোভ বাবাজী —মনে মনে আমার বোধ হয় ছিল সন্তানের মোহ—ওই ছলনা করে —গোবিন্দ আমার কোলে ফেলে দিলেন—ওই অসুর শিশুটাকে ! মুক্তির পথ আমার সামনে খোলা পড়ে ছিল, চোখে আঙুল দিয়ে—কানে খোঁচা দিয়ে—আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তো—এর জন্মদাতার হাতে জোর করে তুলে দিয়ে—মুক্তি নিতে পারতাম।

বৈষ্ণবী নীরবে চেখ বুজিয়া সেই সব কথাই স্মরণ করিল। বাবাজী সস্নেহে তাহার মাথায় কোঁকড়ানো চুলের রাশির উপর হাত বুলাইয়া দিলেন—বলিলেন—এমন ভাবে ভেঙে পড়ো না ব্রজ !

ব্রজ আবার ঘাড় নাড়িল :—না—না—না। বোধ হয় সান্ত্বনাকে অস্বীকার করিল, আজ সে নিজের কথা নিজের দুঃখ নিজের উপলব্ধি ছাড়া সব কিছুই অস্বীকার করিতেছে।—কেন সে সেদিন মুক্তি লয় নাই ?

* * *

ক্লেদাক্ত শিশুকে বুকে লইয়া সে নদীর ঘাটে গিয়া নামিয়াছিল।

আঁচল ভিজাইয়া শিশুর অঙ্গের ক্লেদ মুছাইয়া দিবে। আবরণ মুক্ত শিশুটি তখন একদিকে পৃথিবীর বায়ু-স্পর্শে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে অন্যদিকে তারস্বরে কাঁদিতেছে । সরল শিশু !

কৃষ্ণ পক্ষের একাদশী সে দিন। বৈষ্ণবী একাদশী করিয়া আছে। সামান্য ফল ও মিষ্টান্ন খাইয়াছে—সেই বেলা দ্বিতীয় প্রহরের শেষে। তিথিটা তাহার তাই অক্ষয় হইয়া রহিল তাহার মনে। একাগ্র মনে সযত্নে অভ্যস্ত অপটু হাতে ভয়ে-ভয়ে সে শিশুর অঙ্গের ক্লেদ মুছাইতেছিল। হঠাৎ কল-কলরবে পাখী ডাকিয়া উঠিল, বৈষ্ণবী চমকিয়া উঠিল।

আকাশে চাঁদ—পূর্ব্বার্দ্ধের চতুর্থ পাদ অতিক্রম করিয়াছে।

পূর্ব্ব-দিগন্তে পাণ্ডুরাভা দেখা দিয়াছে। পাখীরা প্রথম ধ্বনি দিয়া উঠিল; রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে! শিশুটির মুখ অনেকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণবী বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল। সারা বুকের ভিতরটা গুরু গুরু করিয়া উঠিতেছে। এ কি হইল? সে কি করিবে?

—কে গো? কে ওখানে? মানুষের সাড়া। বৈষ্ণবী আবার চমকিয়া উঠিল। প্রথমেই সে শিশুটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল, ইচ্ছা হইল—ছুটিয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু তাও পারিল না, সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। সভয়ে সে চোখ তুলিয়া ওপারের দিকে চাহিল শেষরাত্রির কাকজ্যোৎস্নার মত পাণ্ডুরাভার মধ্যে একটি মূর্ত্তি ওপারে দাঁড়াইয়া আছে। চকিতের মত হইলেও—বৈষ্ণবীর মনে হইল—আকার অবয়ব ঠিক তেমনি—তাহারই মত—যে—শ্মশান হইতে ছুটিয়া—নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল। হ্যা---ঠিক তেমনি।

বষ্টমী বুঝিল, এ সেই লোক। যে এই শিশুকে বিসর্জ্জন দিতে আসিয়াছিল। নিশ্চয় সেই! ভয়ে পলাইয়া গিয়াও পলাইতে পারে নাই—আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ধীরে ধীরে তাহার সাহস ফিরিয়া আসিল।

বষ্টুমী বলিল—ভূত প্রেত নই। আমি মানুষ। রাহী।

লোকটি আগাইয়া আসিল—রাহী। মেয়ে লোক—এই রাত্রে?

বষ্টুমী বলিল, এস তো এপারে। শোন তো একটু। তাহার কণ্ঠস্বরে আদেশ ছিল; সে আদেশ লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা ওই লোকটির নাই—সে বষ্টুমী জানে।

লোকটি নদীর জল ভাঙিয়া এপারে আসিয়া উঠিল। আসিয়াই বলিল—এ কি—তোমার সন্তান হল?

—হ্যাঁ। কিন্তু একটু সাহায্য করবে আমাকে? একটা গর্ত্ত ক'রে দিতে পারবে? এটা তো শ্মশান, এটাকে—

'পুঁতে দেব' বলিতে সে পারিল না। ও-কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া কঠিন তিরস্কার ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি পশু—না—পাষাণ?

এমন প্রশ্নের জন্য লোকটি বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না। সে চমকিয়া উঠিল।

বৈষ্ণবী আবার বলিল, এই বস্তুকে তুমি—। তাই শুধাচ্ছিলাম, তুমি পশু না পাষাণ?

জীবন্ত সমাধি দিতে আসিয়াছিলে, এ কথা তাহার জিভে বাধিয়া গেল।

এবার লোকটি একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তুমি যা বলছ—তা ঠিক। আমি দুইই। আমি পশু—পাষাণ দুই-ই বটে।

বৈষ্ণবী শিশুটিকে তাহার দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—নাও ধর।

লোকটি দু' পা পিছাইয়া গেল। কথা বলিল না, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

* * *

এই লোকটিই মহেশ মণ্ডল।

নদীর ঘাটে বালুচরের উপর বষ্টুমীর পাশে বসিয়া অকপটে সমস্ত বলিয়া গেল।

এখান হইতে দু' ক্রোশ দূরে তাহার বাড়ী। গ্রামের মণ্ডল সে। সে বলিল—লোকে আমার ভাগ্যের হিংসে করত। স্ত্রী—দুটি সন্তান নিয়ে সংসার। পনের বিঘে জমির জোত, নাখরাজ পুকুর, বাগান, গাঁয়ের

মণ্ডল ;—তুমি বিশ্বাস কর, আমি আমার জ্ঞানে অন্যায় করি নাই; কারও কখনও 'হ'রে-হর্মে' নিই নাই—এক ছুঁচ মাটি না, একটি কাণা-কড়ি না। কখনও মিথ্যে সাক্ষী দিই নাই, কোন অখাদ্য খাই নাই। লোকে আমাকে মান্য করে। কাজেই পাঁচ জনের চোখ আমার ওপর পড়বে যে!

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল সে। তার পর বলিল—লোকের দৃষ্টির দোষ আমি দিই না। লোকের দৃষ্টিতে কিছু হয় না সংসারে—সে আমি জানি। হয় এক নিজের কর্ম্মফলে আর হয় ভাগ্যদোষে। কর্ম্মফলের আমার দোষ ছিল না, দোষ আমার ভাগ্যের। আর আমার পূর্ব্বজন্মের শত্রুর দেওয়া শাস্তির ফল। সে আমার শত্রু ছিল—পূর্ব্বজন্মে ঘোর শত্রু ছিল। সে-জন্মে অনেক দুঃখ আমি তাকে দিয়েছিলাম।

—কে? কার কথা বলছ?

—আমার পরিবার! সর্ব্বনাশী দু'টি শিশু-সন্তান দিয়ে আমাকে হাতে-পায়ে বেঁধে হঠাৎ চলে গেল। এত বড় মানুষটা ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পর চোখ মুছিয়া আবার বলিল—লোকে আমাকে আবার সংসার করতে বললে। আমি বললাম—না। বলেছিলাম বষ্টুমী,—তোমরা বরং আমার ছেলে দু'টির ভার নাও, আমি চলে যাই যে দিকে দুই চোখ যায়। সেদিন আমি মিছে কথা বলি নাই, সেদিন আমি তা যেতে পারতাম।

হুঁঃ—বলিয়া নিজের কথাকেই ব্যঙ্গ করিয়া সে খানিকটা হাসিল।

—জান—। সে আবার আরম্ভ করিল। "জান, সর্ব্বনাশী গেল—আমি মাছ খাওয়া ছাড়লাম, নিরিমিষ খেতে আরম্ভ করলাম। থান-

কাপড় পড়তে ধরলাম। বয়স আর আমার কত হবে? তিরিশ হ'ল এই বছর। দু' বছর আগের কথা। লোকে বললে, মহেশ সত্যি সত্যিই কোন দিন ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাবে। আমারও মনে তাই ছিল, ভেবেছিলাম, ছেলে দু'টো একটু ডাঁটো হলেই দু'টোরই বিয়ে দোব একসঙ্গে, এক-ঘরে দুই বোন দেখে বিয়ে দোব; তার পর বেরিয়ে পড়ব এক দিন ভগবানের সন্ধানে। তখন কি জানি ছাই আমি এক জনা নই আমি দু' জনা। এক জন হিসাবী আমি—আর এক জন বেহিসেবী আমি। ও দু' জনে আপোষ হয় না। বুঝেছ! আপোষ করতে গেলেই ওই বেহিসেবী জনই মরে। হিসেব করে যুক্তি ঠিক করছিলাম। দু' জনের এক-ঘরে দুই বোনকে বিয়ে দিলে ঘর আমার একখানা ভেঙে দু'খানা হবে না, আর দু' জনের এক জন শ্বশুর হলে তার হাতে সম্পত্তির ভার দিয়ে গেলে আমারই মত দু' জনের সম্পত্তি রক্ষে করবে। বেহিসেবী জন ঠকল। তার পর আর কি, যত দিন যায়—তত ঘাঁটা পড়তে লাগল আমার বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার বাসনায়। সঙ্গে সঙ্গে সংসারের উপর হ'ল ভীষণ আক্রোশ। অন্ন তেতো মনে হ'তে লাগল, ছেলে দু'টো চোখের বিষ হয়ে উঠল। বষ্টুমী, মনের মধ্যে—বুকের মধ্যে হু-হু করতে লাগল; কি যে হু-হু করতে লাগল—তা প্রথমে বুঝতে পারি নাই। বুঝলাম ক্রমে। বুঝলাম—এক দিন এই নদীর চরে এক জনকে দেখে। নীচু জাতের মেয়ে, বাড়ী এখান থেকে ক্রোশ চারেক দূরে, এসেছে কুটুম-বাড়ী। আশ্চর্য্য মেয়ে সে। জলে চোখ দু'টো যেন দু'টো জল-ভরা দীঘির মত টলমল করছে। আমি একটা গাছের তলায় বসেছিলাম, আর ভাবছিলাম, ভাবছিলাম—এই কথাই, কি'হল আমার? সে এসে দাঁড়াল। তার দিকে চেয়ে আমার কি হলে গেল। সব যেন এক

নিমেষে পাল্টে গেল। দুপুরের রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছিল— সেইদিন সেই রোদে যেন সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল।"

—"সে-ও এসে বসল গাছতলায়। শুধালে—চরণপুর কতটা একট

"আমি জবাব দিলাম কলের পুতুলের মত—শুধু চেয়ে রইলাম তার দিকে। দেখলাম—দেখলাম—দেখলাম। দেখলাম আর বুঝলাম; —পাপ বল পাপ, বুঝলাম, আমার সর্ব্ব দেহ-মন ওরই জন্যে আকুল হয়ে উঠেছে। মাটি যেমন মেঘের জলের জন্যে তপ্ত হয়, ফেটে চৌচির হয়—আমিও হয়েছি তাই।"

সে অবাক হয়ে আমার দেখা—দেখছিল। বষ্টুমী, এক ধারার মানুষ সংসারে আছে—যারা ভাল বোঝে না—মন্দও বোঝে না, শুধু অবাক হয়। সে সেই ধারার মানুষ।

লোকটি কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়াছিল—সে দিন যদি আমার মাথায় বজ্রাঘাত হ'ত।

বষ্টুমী অবাক হইয়া গেল, লোকটির চোখের জল বাঁধভাঙা নদীর বানের মত অকস্মাৎ তাহার মুখ, বুক ভাসাইয়া দিল। কিছুক্ষণপর সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—গাছতলায় ব'সে তাকে কত কথা শুধালাম সে রাগ করলে না, সন্দেহ করলে না, হাসলে না, সামনের খাঁ-খাঁ করা মাঠের দিকে চেয়েই রহিল—আর আমার কথার জবাব দিয়ে গেল। একবার শুধালাম—সামনের দিকে এমন ক'রে চেয়ে কি দেখছ বল তো? সে বললে—ও—ই—গাঁ, ও—ই মাঠ চলে গিয়েছে, ঝিরঝির ক'রে কেমন সব কি কাঁপছে; গরু চরছে—হু—ই—হোথা। গাছের মাথা নড়ছে হিল—হিল ক'রে। এই সব দেখছি! এই মানুষ সে। পরিচয় নিলাম। নিরাশ্রয় মেয়ে। বিধবা হওয়ার পর—ক'জন দুষ্টু লোকে ধরে, নিয়ে গিয়েছিল। তারাই আবার পুলিশের ভয়ে ছেড়ে দিয়ে

কাপড় পড়তে দেখ কোথাও আশ্রয় নাই। তাই আশ্রয়ের জন্তে চলেছে—এই. বছর চরণপুর।

সত্যিই ছুক্ষণপর সে উঠে চলে গেল। বললে—তারা হয় তো ঠাঁই দেবে চিল, তবু দেখি।

আমি কিন্তু উঠতে পারলাম না। সে চলে গেল। তবুও আমি তাকেই দেখলাম চারি দিকে। এমন রূপ এমন কালো জলের মত কালো রূপ আমি আর কখনও দেখি নি। বুকের মধ্যে কাল বৈশাখীর জমাট জমে উঠল। আমি বুঝলাম আমার মন কি চায়। তবু তোমাকে বলছি—আমি মনকে বুঝাবার চেষ্টা করলাম। নিজেকে শুধু নিন্দে করলাম—তিরস্কার করলাম—কত বুঝালাম। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। একবার ভাবলাম—বিয়ে করি। ওই যে হিসেবী জন—সে বললে—ছি! এত কথা বলে শেষে লোক হাসাবে? লোকে বলবে কি? লজ্জায় মাথাটা যে কাটা যাবে! আজ তোমাকে লোকে যে প্রশংসাটা করে—তাই আর করবে? তা ছাড়া, বিয়ে করলে—যাকে দেখে এমন পাগল হয়েছ—তাকে তো পাবে না।'

হঠাৎ ঝড় উঠল মনে। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। গাছতলা থেকে উঠে—সেই—রৌদ্রে ছুটতে আরম্ভ করলাম তখনও তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। খাঁ-খাঁ করা বৈশাখের মাঠে অনেক দূরে সে যাচ্ছিল;—আমি ছুটলাম। তাকে ডাকলাম—শুনছ—দাঁড়াও ও—। নাম জিজ্ঞেসা করিনি। ভুলে গিয়েছিলাম। তবু সে দাঁড়াল ফিরে তাকালে। আমি তখন পাগল—।

সে থামিল। তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

"মানুষ বড় অসহায় বষ্টুমী। জন্তু-জানোয়ার কীট-পতঙ্গ—ওদের বাসনা আছে লজ্জা নাই, সৃষ্টিকর্ত্তার বেঁধে-দেওয়া নিয়ম আছে, কিন্তু

নিজেদের তৈরী-করা হাজার মানার বেড়াজাল নাই। সেইদিন সেই মাঠের উপর আমার সব ভাসিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে এলাম—।

বষ্টুমীর আর শুনিতে রুচি হয় নাই, সে অধীর হইয়া উঠিল। একটা পাষণ্ড—গলায় কান্নার সুরের মত সুর ফুটাইয়া নিজের পাপের সাফাই গাহিয়া চলিয়াছে। সে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল—যাক। ও পাপ কথা শুনে আমার কাজ নাই। তুমি যাও—তুমি যাও আমার সামনে থেকে।

লোকটি উঠিয়া মাথা হেঁট করিয়া নদী পার হইবার জন্যে জলে নামিল।

বষ্টুমী বলিল—কাল এই ছেলে বুকে ক'রে গাঁয়ে গাঁয়ে গেরস্তের দোরে-দোরে তোমার কীর্ত্তি দেখিয়ে—কাহিনী বলে বেড়াব আমি।

মুহূর্ত্তে লোকটি ওই জলের মধ্যেই ঘুরিয়া দাঁড়াইল। চোখ দুইটা তাহার ধ্বক-ধ্বক করিয়া জ্বলিতেছে, দাঁতে দাঁতে টিপিয়া গিয়া চোয়ালের হাড় দুইটা শক্ত এবং উঁচু হইয়া ঠেলিয়া উঠিয়া পড়িয়াছে। সে মূর্ত্তি দেখিয়া যে কোন মানুষের ভয় পাইবার কথা। অপরিচিত দেশ—রাত্রি কাল—একা নারী—বষ্টুমী ভয় পাইল।

দুই পা আগাইয়া আসিয়া লোকটি থমকিয়া দাঁড়াইল। সে চেহারাটা ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। মাথা হেঁট করিয়া সে করুণ কণ্ঠে বলিল—বলো। আমাকে মরতে হবে। আত্মহত্যা করব।

—না। তার-চেয়ে তোমার ছেলে তুমি নিয়ে যাও।

—দাও।

ছেলেটিকে লইয়া সে আবার শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইল।

বষ্টুমী চীৎকার করিল—না।

—আমার উপায় নাই লোকটি হাসিল। সে হাসি কান্নার চেয়েও

মর্মান্তিক। ব্রজ এবার মিষ্ট কথা না কহিয়া পারিল না—বলিল—ওর মাকে গিয়ে বল—ওকে কোলে ক'রে চলে যাক দেশ ছেড়ে।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মহেশ বলিল—ওর মা চলে গিয়েছে। তা নইলে আর এ পাপ করতে হবে কেন আমাকে? সে উপরের দিকে চাহিয়া গভীর বেদনায় মাথা দোলাইয়া যেন মৃত হতভাগিনীর উদ্দেশ্যেই কিছু বলিতে চাহিল।

—চলে গিয়েছে?

—হ্যাঁ। তার কাছেই পাঠাচ্ছিলাম। মাঝখান থেকে তুমি পড়েই সব গোলমাল করে দিলে। কি করব ওকে নিয়ে আমি বলতে পার? নীচ জাতের মেয়ের গর্ভে জন্মেছে—ঘরে নিয়ে গেলে আমার মান যাবে, জাত যাবে। তা ছাড়া কে ওকে মানুষ করবে? ওর মায়ের জাতের লোকেরা—তারাও ওকে নেবে না। ও তো তাদের জাতেরও নয়।

—তুমি পশু—তুমি পাষাণ।

—হাজার বার বল। আমি নিজেও গলায় দড়ি দোব। কিন্তু একে রেখে তা তো পারত না! ওপারের গাছের ডালে দড়ি আমার বাঁধা আছে। তোমাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে গিয়ে—তাই করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ফিরে এলাম ওরই মায়ায়। দেখতে এসেছিলাম সাহস করে—কে ওকে নিলে!

—তুমি ওকে আমাকে দাও।

—নেবে?

—হ্যাঁ। চল তোমার গাছের ডালে বাঁধা দড়ি আমি দেখব।

ওপারের সেই স্থির কালো পুঞ্জটার দিকে সে আগাইয়া গেল। বৈষ্ণবী তাহাকে অনুসরণ করিল।

প্রাচীন কালের ঘন বাঁশবনে ঘেরা আমের বাগান একটা। শিশুকে কোলে

পূর্ব্ব দিক তখন পরিষ্কার হইয়াছে। আকাশে চাঁদ নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। লোকটি একটি গাছের তলায় দাঁড়াইয়া বলিল—ওই দেখ।

একটা গাছের ডাল হইতে দড়ির ফাঁস সত্যই ঝুলিতেছিল।

লোকটি বলিল—সংসারে যে কলঙ্ক নিতে ভয় পায়—তাকে ওই গলায় দড়িই নিতে হয় বষ্টুমী। হয় কলঙ্কের ভয়ে কামনার গলায় দড়ি দিতে হয়—নয়—কামনার তাড়নায় ছুটে শেষ পর্য্যন্ত কলঙ্কের ভয়ে দেহের গলায় দড়ি দিতে হয়।

বষ্টুমী বলিল—তোমার কলঙ্ক আমি নিলাম—তুমি নির্ভয়ে বাড়ী চলে যাও।

—তুমি যেন আমার সঙ্গে দেখা না-করে যেয়ো না। ভগবানের দিব্যি রইল। গোবিন্দের দিব্যি। আমি হাত জোড় করে মিনতি ক'রে বলছি। দোহাই তোমার।

—আচ্ছা।

—সকাল হলেই এই গাঁয়ে যেয়ো। বাগদীদের গাঁ। ঘরে ঘরে গরু ছাগল—দুধ কিনতে পাবে—এই—এই—

না। তোমার টাকা তুমি রাখ। তবে অপেক্ষা আমি করব। এই বাগানেই থাকব।

ব্রজদাসী বলিল—হায়—সেদিন যদি এ বাঁধন আমি কেটে না—পারতাম।

বাবাজী বলিলেন—কেন এত ভেঙে পড়ছ ব্রজ? লোকে শুনলে হাসবে।

—হাসবে? তা হয় তো হাসবে। হাসুক তারা। কিন্তু আপনিও কি হাসছেন প্রভু?

প্রভু, আমার অন্তর তোমার মতই হায় হায়—করছে! কি
পাল আজ মদ খেয়েছে। তাকে সাবধান কর—বুঝিয়ে বল—

—প্রভু, তাকে আপনারা জানেন না। তাকে চেনেন না। আ মি
—। ব্রজদাসী হাসিল—আক্ষেপ যখন রাখিবার ঠাঁই থাকে না—
তখনই মানুষ আক্ষেপে ক্ষোভপ্রকাশের বদলে—হাসে; হাসিয়া
ব্রজদাসী বলিল—আমি ওকে জানি! চেনার যে টুকু বাকী ছিল—সে
টুকু আজ পূর্ণ হ'ল। আজই আমি ওকে খাইয়ে—দাইয়ে গিয়েছিলাম
ওর জন্যে কনে খুঁজতে। আমার কপাল। ও গাঁয়ের ভোলাদাসী,
কলকাতায় পাপবৃত্তি করে পয়সা করে ঘরে এসেছে—পাপের ফল একটা
মেয়ে নিয়ে। দুলালের জন্য কলঙ্ক মাথায় তুলে নিয়েছি, পাঁচজনে পাঁচ
কথা বলে আড়ালে, সে আমার অঙ্গের চন্দন করেছি। কিন্তু আজ
ভোলাদাসী—তার পাপের সঙ্গে সমান ওজনের পাপের কালী অঙ্গে
মাখিয়ে দিয়ে—গা ঘেষে ব'সে বললে—বেশ হবে ভাই, তোমার সঙ্গে
বসে গোপন কথা বলব আর হাসব! তবুও আমি দমি নি প্রভু। ওই
ওর জন্যে। কথা কয়ে বাড়ী ফেরার পথে বাগ্দীবুড়ী বললে—দুলাল—
পালিয়ে এসেছে। ছুটতে ছুটতে এখানে এলাম—চৌমাথায়—।

আবার সে আক্ষেপে হাসিল।—অথচ প্রভু—সেই রাত্রি পোয়াল
—ওকে কোলে নিয়ে সেই বাগানে ব'সে ব'সে শুধু ভাবলাম—। কি
ভাবলাম জানেন? বৃন্দাবনে যেদিন বের হই, আমার ঘর যেদিন ছাড়ি
—পথে পা দিই সে দিন মনে মনে বলেছিলাম—বৃন্দাবনে যাব—যে
তোমার ওই বংশীধারী ছলনাময় প্রেমিকের রূপ তো দেখব না! ও
সাধ আমার মিটেছে। তাই—, তাই কি গোবিন্দ—

বৃন্দাবনের পথে চলিতে চলিতে আপন-মনেই কত দিন শিশুকে কোলে বৃন্দাবনে যাইব কিন্তু তোমার বংশীধারী প্রেমিক রূপ আমি দেখিব। রূপ দেখিবার সাধ আমার মিটিয়াছে। ঝর-ঝর করিয়া চোখে তাহার জল নামিয়া আসিত পশ্চিমে বাতাসের স্পর্শে বিগলিত বর্ষার মেঘের মত। তাহার অতীত দিনগুলির স্মৃতিই ছিল যেন পশ্চিমের বাতাস। মনে পড়িত, কত ভাল সে বাসিয়াছিল সেই মানুষটিকে। নিজেই সে আশ্চর্য্য হইয়া যাইত, ভাবিত, এত ভালবাসা কি করিয়া বাসিল সে। তাহার অঙ্গ-স্পর্শে সে থরথর কাঁপিত, দেহের অভ্যন্তরে—প্রতিটি লোমকূপের মুখ দিয়া বাহির হইত কম্পিত অগ্নিশিখার মত শিহরণ, মরণের স্বাদের মত অপরূপ বিবশতায় সে ঢলিয়া পড়িত; মনে হইত, ইহার পর আর বুঝি পৃথিবী নাই, দিন-রাত্রি নাই, এই মানুষটি ছাড়া আর দ্বিতীয় জন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কেহ কোথাও নাই! সেই মানুষ এক দিন তাহাকে একখানা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরার মত পরিত্যাগ করিল। অভিমানে দুঃখে, আক্ষেপে অধীর হইয়া সে পথে-পথে বাহির হইল। সেদিন সে মুক্তির মূল্য বুঝিতে পারে নাই!

বুঝিতে পারে নাই তাহার শ্যাম তাহাকে মানুষের স্বরূপ দেখাইয়া—মুক্তি দিয়াছিলেন। সে অভিমান করিয়াছিল, দুঃখ পাইয়াছিল—তাই তিনি ছলনা করিয়া ওই শিশুকে কোলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। অলক্ষ্যে হাসিয়াছিলেন। ব্রজর চোখতো প্রভুর দিকে ছিল না, তাই সে দেখিতে পাইল না। সকালের আলোয় ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া সে ভাবিল—তোমাকে প্রণাম—তোমাকে প্রণাম! সমবয়সীদের কোলে সন্তান দেখিয়া কতদিন এ সাধ তাহার হইত; সে সাধ তুমি মিটাইয়া দিলে!

তারপর সে সেই গাছতলাতেই সূতিকাগৃহ রচনা করিতে ব্যস্ত

...। নিজের কাপড় ছিল মাত্র তিন-খানা। একখানা ... একখানা গাছের ডালে শুকাইতে দিয়াছিল, একখানা ছিল পাঁটলায়—সেই-খানা ছিঁড়িয়া টুকরা করিয়া ছেলেটির বিছানা তৈয়ারী করিল। আটাশ-তিরিশ বৎসরের জীবনে সন্তানের জননী হইবার ভাগ্য তাহার হয় নাই। শিশুকে কোলে লইয়া বিব্রত হইল, কাঁদিলে তাহার দুগ্ধহীন স্তনবৃন্ত তাহার মুখে দিতে গিয়া অস্বস্তিতে যন্ত্রণায় অধীর অস্থির হইয়া উঠিল, তবু সে সেদিন বুঝিতে পারে নাই! মনে পড়িতেছে—ছেলেটি বেশী কাঁদিলে সে সন্তানবতী সখী কাদু মোল্যানীর দৃষ্টান্ত মনে করিয়া তাহাকে বুকে লইয়া উঠিয়া বাগানময় নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইয়াছিল। তাহার গান-সাধা অপরূপ কণ্ঠস্বরে গানের বদলে ছড়ার গুঞ্জন উঠিয়াছিল।

"ও রে আমার ধন ছেলে—পথে পড়ে কাঁদছিলে—মা বলে বলে ডাকছিলে—

গায়ে ধুলো মাখছিলে।"

ছড়াটা যেন এই শিশুটিকে গাহিয়া শুনাইতে তাহারই জন্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল—ইহার পদকর্তা!

"সে যদি তোমার মা হ'ত,

ধুলো ঝেড়ে তোমায় কোলে নিত!"

তাহার পরিবর্তে ধূলায় ফেলিয়া দিয়া সে পলাইয়াছে; সে তো তোমার মা নয়। আজ যে তোমাকে ধূলা ঝাড়িয়া কোলে লইয়াছে সে তোমার মা! আমি তোমার মা! আমার সোনা! আমার মাণিক! আমার গোপাল!

বাগানের প্রান্তেই বাগ্দীদের গ্রাম। লোকটি তাহাকে বলিয়া

গিয়াছিল—বাগদীদের গাঁয়ে—ঘরে-ঘরে গরু ছাগল। সে শিশুকে কোলে লইয়াই—গাঁয়ের দিকে চলিল।

ঐ-দুটি মেয়ে আসিতেছিল। সে থমকিয়া দাঁড়াইল, বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল দৃষ্টিতে।

—কে গো বাছা? এমন চেহারা—এই—বেশ—?

—আমি বাছা বষ্টুমী!

—বষ্টুমী? তা—তোমার কাপড়ে চোপড়ে রক্তের ছোপ।—এ ছাওয়াল—তোমার কোলে?

ব্রজ থতমত খাইয়া বলিয়াছিল—পথেই এল মা ও কোলে।

সে গালে হাত দিয়া বলিল।—ও মা-গো! পথেই পেসব হয়েছে?

—হ্যাঁ।

পিছনে তখন আরও কয়জন আসিয়া জমিয়াছিল।

এক জন হঠাৎ বলিয়া উঠিল—অ!

তাহার দৃষ্টি—কণ্ঠস্বর বিচিত্র, তাহাতে যত কৌতুক—তত শ্লেষ! ব্রজর গায়ে লাগিয়াছিল—ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিল—কেন? এমন বললে কেন?

এক বুড়ী দন্তহীন মুখে হাসিয়া বলিয়াছিল—তা' বলে মা, তা' বলে। ওতে 'আগ' করতে নাই! ভদ্দনোকের মেয়ে এমন রূপ তোমার, ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছ, পাপের কাঁটা পেটে নিয়ে—পথেই সে কাঁটা ফুল হয়ে কোলে খসেছে; তাই বলচে আর কি! তা বলবে—দশ জনে দশ রকম বলবে।

ব্রজ একেবারে থ' হইয়া গিয়াছিল। কথাটা সে ভাবে নাই। অথচ এত সহজ, এত স্বাভাবিক যে ইহার প্রতিবাদ করিবারও কিছু নাই। অন্য কেহ যদি আজ এমনি ভাবে এই শিশুটিকেই বুকে লইয়া

তাহাকেই এই কথাগুলি বলিত—তবে সে হয় তো এমন কৌতুক ও শ্লেষ মিশাইয়া ‘অ’—বলিয়া উঠিত না, হয়তো অন্য রকম কিছু বলিত—সান্ত্বনা দিয়া সহানুভূতির কথাই বলিত—কিন্তু অনুমানে কোন পার্থক্য হইত না, ঠিক এই অনুমানই করিত!

শিশুকে কোলে তুলিবার প্রথম ক্ষণ হইতে এ পর্য্যন্ত তাহার এ কথাটা বারেকের জন্যও মনে হয় নাই। নিষ্পাপ অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত করুণায় তুলিয়া লইয়াছিল—এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের মনে মনে শুধু পাপের সাজা দিয়াছে ওই লোকটিকে। একবারও ভাবে নাই শিশুর অঙ্গেও পাপের ছাপ লাগিয়া আছে, উহাকে কোলে তুলিলে—সে ছাপ তাহার অঙ্গেও লাগিবে। থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল—সে।

একজন হাঁ-হাঁ করিয়া বলিয়া উঠিল—আহা—মা। পড়ে যাবে—পড়ে যাবে।

আর একজন বলিল—লজ্জা কি মা? ভগবান দিয়েছেন—পেটে এসেছে—কোলে ধরেছ। কি করবে বল? তোমার চেয়ে—যে তোমার সর্ব্বনাশ করে—পথে এমন ক'রে দাঁড় করিয়ে দিলে—লজ্জা তারই বেশী, পাপ তারই।

এক জন বলিল—এই হয় মা! এ পথের এই হল নিয়ম। ভুলিয়ে নিয়ে ঘর থেকে পথে বার করবে—তার পর যখন দেখবে ফুল এইবার ফল হল—তখন পেজাপতির মত এক দিন ড্যানা মেলে উড়বে। আহা মা! ওই যে তুমি অকালে ওকে নষ্ট করনি—এই তোমার পাপের মধ্যে পুণ্যি। বেশ করেছ! ভাল করেছ! ওই তোমার এখন সম্বল হল!

এক জন বলিল—আহা-হা মা, কাঁপছ তুমি বস, বস।

যে কথা বলিতেছিল—সে তখনও বলিতেছিল—ওকে যত্ন করে মানুষ কর, ওই দেখবে তোমার অন্ধের নড়ি হবে এক দিন।

বুড়ী হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল অকস্মাৎ—বলি· ঘন কালো মা আমার বরাত। একটা পা আমার ভেঙে গেল এই বয়সে ফুলিয়া হাটবার ক্ষমতা নাই। পোড়া অদৃষ্টে এ জন্মে কাউকে কোলে পাই মুড়ু নাই, আমার আজ দুঃখ দেখ, হাত ধরে আমাকে নিয়ে যায়—এমন কেউ নাই। 'ওজগার' ক'রে খাওয়ায় এমন কেউ নাই। মরব—তা ভাবছি—সেখানে গিয়েও 'পরিত্তান' পাব না, কে দেবে' মুখে আগুনের ছেঁকাটি—কে দেবে এক গণ্ডুষ জল?

বষ্টুমীর চোখ দু'টি যেন আপনা হইতে বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। চোখের কোণ হইতে জলের দু'টি ধারা নামিয়া গড়াইতেছিল গাল বাহিয়া। ধীরে ধীরে গড়াইতেছিল, ব্রজ নিজে স্পষ্ট অনুভব করিতেছিল উষ্ণ জলবিন্দুর গতি। কিন্তু সে তা মুছিল না।

এক জন বলিল—কেঁদ না মা! নাও, দুধ নাও। পয়সা তোমার লাগবে না। নোব না আমরা।

ব্রজ অসঙ্কোচে তাহার ঘটিটি পাতিয়া তাহাদের দান দুধটুকু গ্রহণ করিয়াছিল! একটি মেয়ে বলিয়াছিল—দেখে লাগছে বাছা এই তোমার প্রথম, তা, বলে দি, একেবারে খাঁটি দুধ—জল মিশিয়ে দিও। নইলে প্যাট খারাপ হবে।

ব্রজ বাগ্দীপাড়া হইতে ফিরিল অপরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ মন লইয়া। মেয়েগুলি যে কলঙ্কের নিকষ কাল কালি সহস্র ধারায় তাহার মাথায় ঢালিয়া দিল—সে কালি যেন জন্মাষ্টমীর উৎসবের উজ্জ্বল প্রসন্ন হলুদ রঙের মাধুরী লইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঝলমল করিতেছে। যে কলঙ্কের কথা শুনিয়া সে প্রথমটা শিহরিয়া উঠিয়াছিল, সে কলঙ্ককে তার কলঙ্ক বলিয়া আর মনে হইল না। মনে হইল, এইবার সে সত্য সত্যই এই শিশুর মাতৃত্বের অধিকার লাভ করিল, এটুকু মাথায় না লইলে তাহার

তাহাকেই এইরূপে আপন মায়ের কোলের তৃপ্তি কথনই অনুভব করিত না। স্নেহ-ভিখারী মিষ্ট লাগিয়াছিল এ কলঙ্ক; যত ভাবিল—তত বেশী মিষ্ট—এনে হইল।

নির্জ্জন আম বাগানের মধ্যে ছেলেটিকে দুধ খাওয়াইয়া দুই হাতের উপর শোওয়াইয়া নাচাইতে আরম্ভ করিল মনের পুলকের আবেগে। কণ্ঠে গুন-গুন করিয়া উঠিল মহাজন কণ্ঠ মহাশয়ের পদ—

"নেচে নেচে আয় রে নীলমণি
একবার তেমনি-তেমনি-তেমনি ক'রে
চরণে-চরণ দিয়ে—
নেচে-নেচে আয় রে নীলমণি—
যতনে খাওয়াই তোরে ক্ষীর-সর নবনী।"

পিছন হইতে কে বলিল—আহা, মা, কি সুন্দর গলা তোমার!

চমকিয়া পিছন ফিরিয়া ব্রজ দেখিল—বাগদীপাড়ারই সেই মেয়েটি যাহার সহিত প্রথম দেখা হইয়াছিল; সে যে কখন আসিয়াছে সে তাহা জানিতে পারে নাই। ফাল্গুনের শেষে বাগানটা ঝরা পাতায় ভরিয়া আছে। গত কাল রাত্রে ঘুমের মধ্যেও সে ঝরা পাতার উপর মহেশ মণ্ডলের পায়ের শব্দ শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। আজ জাগিয়া বসিয়া থাকিতেও মেয়েটির আসার কথা ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারিল না।

মেয়েটি কাছে বসিয়া বলিল—একটুকুন জোরে গাও মা। আহা-হা!

ব্রজ বলিল—খুব ভাল ক'রে গান শোনাব আজ বিকেলে। খঞ্জনী বাজিয়ে।

—খঞ্জনী বাজিয়ে?—অ, হ্যাঁ—তুমি যে বষ্টুমী!

—হ্যাঁ আমি যে—আমি বষ্টুমী! ব্রজ হাসিয়াছিল।

মেয়েটি আরও কাছে আসিয়া বসিয়া বলিয়াছিল—আমি মা প্রথম

ভেবেছিনু তুমি কোন বামুন-কায়েতের ঘরের মেয়ে হবে, ঘন কালো আমাদের পাড়ায় চল না কেন। আমাদের পাড়াতেই একপাশে চুল ফুলিয়া ঠাঁই-ঠিকানা ক'রে দোব, মরদরা আসুক—দণ্ড দু'য়ের মধ্যে করিয়া বস্ত্র চালা তুলে দেবে, খলপা দিয়ে ঘেরে দেবে, আগড় বেঁধে দেবে। করিয়া থাকবা আপনার, রাঁধবা বাড়বা—খাবা। খঞ্জনী বাজিয়ে গান ক'রে—ভিখ মেগে আনবা, ছেলে থাকবে শুয়ে—আমাদের উঠানে, আমরা দেখব-শুনব—সে বেশ হবে। আমি সেই বলতেই এলাম।

ব্রজ বলিল—যাব। কিন্তু তার আগে—একে একটু দুধ খাইয়ে দেবে ভাই? আমি পারছি না ঠিক। আর একবার যদি ও'কে নিয়ে বস—তবে আমি চান করে আসি।

—চান? সে কি গো? কাঁচা সন্তানের মা তুমি—

—ও। ব্রজ হাসিল। তাহার ভুল হইয়া গেছে। কাঁচা সন্তানের মা ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে মাথায় জল চাপিয়া বিকার হইবে। হাসিয়া ব্রজ বলিল—আমি কাপড় কেচে আসি। চান করব না।

স্নান সে করিল। নদীর জল টলমল করিতেছিল। নদীর জলে স্রোত তেমন নাই, তার উপর সেটা একটা দহ।

গত কাল সন্ধ্যায় সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যে মাঠে-প্রান্তরে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া সর্ব্বাঙ্গে ধূলা লাগিয়াছিল, কাপড়খানা হইয়া গিয়াছিল কাদা-মাখা কাপড়ের মত, মাথার চুল এলাইয়া পড়িয়াছিল—তাহাতেও ধূলা লাগিয়া পিঙ্গল ধূসর চেহারা হইয়াছিল তাহার উপর অবশিষ্ট রাত্রিটা শ্মশানে কাটাইয়াছে, শেষ রাত্রে এই শিশুটিকে লইয়া এই উদ্বেগ—তাহার ধূলি-ধূসরিত ওই চেহারার উপরেও একটা কালো ছায়ার মত ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল। নদীর জলে সে যেন ঝাঁপাইয়া পড়িল। স্নান করিয়া ধূলি মালিন্য মুক্ত হইয়া উঠিয়া ফিরিতে গিয়া

ওর ক্লেদাক্ত কাপড়ের কালি গুলির কথা। আপন
.সে, তার পর সে গুলি কাচিয়া আবার স্নান করিয়া ফিরিল
নে বাগদী মেয়েটির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। সে বলিল—ছি মা-
রী করে? আরও হয় তো কিছু সে বলিত কিন্তু ব্রজর সদ্যস্নাত
ন্য মুক্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সে অবাক হইয়া গেল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে
তাহাকে দেখিয়া বলিল—কি রূপ তোমার মা! কিন্তু ছেলে এমন
কেন হল? এ যে কাল—।

ব্রজ হাসিয়া বলিল—ও আমার কাল মাণিক।

ধীরে ধীরে তাহার মনে কি যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। রাত্রির শেষ
প্রহরে যন্ত্রণা সুরু হইয়াছিল, অসহনীয় উদ্বেগ; আখড়ায় ব্রজ ফুল গাছের
যত্ন করিত, বড় শখ ছিল তার, কুঁড়ি ধরিলে দিনে দশবার দেখিত
কতটুকু বাড়িল, কতদিনে কখন ফুটিবে; সে দেখিয়াছে—ফুটিবার
সকালটির আগের প্রহরে—ভোর বেলা কুঁড়ির আবরণ ফাটানোর ছবি,
সে স্পষ্ট অনুভব করিয়াছে—গাছের সে এক মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা—। তারপর,
ফুলটি ফুটিলেই গাছটিকে ওই ফুলটির রূপ রসের আনন্দে বিভোর হইয়া
হেলিতে দুলিতে দেখিয়াছে। সখিদের সূতিকাগৃহ সে কখনও দেখে
নাই। বাউল বৈষ্ণবীর দেখিতে নাই। তাই—ও কথাটা মনে পড়িল
না। মনে পড়িল ফুল ফোটার কথা। তাহার মনে যেন ফুল ফুটিয়াছে।

ব্রজ বলিল চল—তোমাদের ওখানেই যাচ্ছি। কাল মাণিক কোলে
নিয়ে—তোমাদের উঠানে গিয়ে বসব।

* * *

ভাল করিয়া সে আজ সাজিল। তিলক কাটিতে বসিয়া সাজিতে
সাধ হইল।

পথে বাহির হইয়া অবধি সাজে নাই সে। যত্ন করিয়া তিলক কাটিল

রসকলি আঁকিল। স্নান করিয়া চুলের ধূলা ধুইয়া গেছে, ঘন কালো রঙ ফিরিয়াছে, তাহার উপর রুখু স্নান করায় কোঁকড়ানো চুল ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে; সামনে কপালের দিকে বাঁকাইয়া চূড়া করিয়া বদ্ধ করিয়া চুল বাঁধিল। পরিষ্কার শুদ্ধবস্ত্র—কাঁটের কাপড়খানি বাহির করিয়া পরিল। তারপর শিশুটিকে কোলে করিয়া বাগ্দীদের উঠানে আসিয়া—খঞ্জনীতে ঠুং করিয়া একটি মৃদু ধ্বনি তুলিয়া বলিল—হ-রি বোল! গোপালের জয় হোক মা!

মেয়েরা ছুটিয়া বাহিরে আসিল। তাহারা অবাক হইয়া গেল।

ব্রজ বলিল—তোমাদের গোপাল দুধে ভাতে থাক, জন্ম সুখে যাবে গোবিন্দ গোপালের প্রসাদে। আমার গোপালকে নিয়ে তোমাদের আশ্রয়ে এলাম।

ব্রজ দাসী জাঁকাইয়া বসিল। মেয়েরাও তাহাকে ঘিরিয়া বসিল। চমৎকার দেখাইতেছিল ব্রজদাসীকে। তাহার প্রসন্ন রূপশ্রীর দীপ্তির উপর ক্লান্তির একটি করুণ ছায়া পড়িয়াছে; দিগন্তের আসন্ন অন্ধকারে সে তাহাদের আঙিনায় যেন সন্ধ্যা প্রদীপের শিখার অনুজ্জ্বল আলোক মণ্ডলের সৃষ্টি করিয়া বসিল।

ফাল্গুন মাস। গম যব ছোলা মসুর আলু পেঁয়াজ তুলিবার সময়; পুরুষেরা বাড়ীতে তখনও মাঠ হইতে ফেরে নাই, ব্রজদাসী বলিল—আসুন—তোমাদের কর্ত্তারা সব—ফিরুন, তাঁরা কি বলেন দেখি—তারপর গান আরম্ভ করব। কেমন?

মনে মনে সে এরই মধ্যে একটা ঠিক দিয়া ফেলিয়াছে।

সকালবেলার সেই বুড়ী ব্রজর কাছে আসিয়া বসিল। বলিল—কত্তাদের তোয়াক্কা আমি রাখি না। বুয়েচ না মা! কত্তার মাথা আমি 'যৌবতী' বয়সে চিবিয়ে খেয়েছি। এক ডর—খানিক—আদেক করি

আমাদের রতন মাতব্বরকে ; ক্ষেপা-খেপা মানুষ—মায়ের সাধন ভজন করে লোকটি ভাল মানতে হয় ; বুয়েচ না ! তা—আবার সময় বুঝে বলেও দিই দুম-দাম ক'রে দশ বিশ কথা। হ্যাঁ ! আমি তোমাকে ঠাঁই দোব। তাতে ঝগড়া-ল্যাই করতে হয় তা' আমি করব। তুমি মা-পায়ের ধর !—

ব্রজ হাসিয়া গান ধরিল।—

"পথের মাঝে পথ হারালাম-ব্রজে চলিতে—
কোন মহাজন-পথের দিশা পারে-বলিতে ?"

মেয়েরা স্তব্ধ হইয়া গেল—এমনটি শুনিবে সে তাহারা প্রত্যাশা করে নাই। গান থামাইয়া ব্রজ দেখিল পুরুষেরা কখন আসিয়া—মেয়েদের চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে। দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া ব্রজ তাহাদের বাড়ীতেই তাহাদিগে আহ্বান জানাইয়া বলিল—আসুন গো, বাবারা আসুন !

কাল হইলেও সে বলিত—আসুন গো প্রভুরা ! শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদামেরা ! প্রভুর সখারা সব ! বলিয়াই খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিত ! আজ তাহার দেহ-মন সব যেন ভাঙিয়া গিয়াছে। সে হাসিল —কিন্তু সে হাসি রেখায় ফুটিল ঠোঁটের উপর—কণ্ঠস্বরে শব্দ-তরঙ্গে জলধারার মত ঝরিল না।

পুরুষেরা গানের মধ্যেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পাড়া ঢুকিতেই এমন সন্তান কোলে-করা শ্রীসম্পন্ন একটি মা জননীর মধুর কণ্ঠের গান শুনিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু এ দেশে কপালে তিলক গলায় কণ্ঠী পরা বা জটা মাথায় গেরুয়া পরা আগন্তুক এত বেশী বিস্ময় উদ্রেক করে না—যা নাকি সহজাত রস বোধকে ডিঙাইয়া মানুষকে প্রশ্ন মুখর করিয়া তোলে। বিস্ময় জন্মিয়াছিল তাদের ব্রজ-

দাসীর শ্রী দেখিয়া। তবুও তাহারা চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়াছিল; প্রভুর নাম আর এমন কণ্ঠের গান; তাহার মধ্যে কথা বলিবার মত অরসিক যে তাহাকে বলে অসুর!

তাহার উপর পাকা ফসলের তৃপ্তিতে তাহারা এখন পরিতৃপ্ত, প্রফুল্ল; হুঁকা টানিতে টানিতে হাসি-রসিকতায় নির্জ্জন পল্লীপথ ভরিয়া তুলিয়া ঘরে আসিয়া এমন মিষ্ট চেহারার মা জননীকে দেখিয়া তাহার এমন গান শুনিয়া দেখিয়া তাহাদের প্রফুল্ল মন প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

বাগ্দীদের পুরুষেরা তাহাকে বষ্টুমী-মা বলিয়া গ্রহণ করিল এক কথায়।

ব্রজ বলিল—বাবা, খেতে লাগবে না, পরতে লাগবে না, গৃহস্থের দোরে-দোরে আমার জায়গীর জমিদারী প্রভু আমায় দিয়ে রেখেছেন, লাগলে—এক মুঠোর বেশী দু' মুঠো লাগবে না। লাগবে বাবা—একটু আগল বাঁধ, আপনাদের পাড়ার এক পাশে একটি চালা বাঁধব, একটু দেখবেন বাবারা! যেন দুষ্টু লোকে অপমান না করে, চোরে-ডাকাতে মেরে-ধ'রে কেড়ে-কুড়ে না নেয়,—আর বাবা সাপ-খোপ—জন্তু-জানোয়ার! বেশী দিন নয় বাবা, অল্প কিছু দিন। আমার এই অঙ্কুরটি একটু বড় হবার অপেক্ষা—একটু ডাঁটো হোক—দুটো ডাল-পালা মেলুক—চলে যাব ওর হাত ধরে।

বাগ্দীরা বলিয়াছিল, দেখুন দেখি মা-লক্ষ্মী! থাকবেন আমাদের পাড়ায়—সে তো আমাদের ভাগ্যি গো! যাবেনই বা কেনে? এইখানেই বেঁধে দেব আপনার আখড়া, বোশেখেই আরম্ভ করে দোব ঘর, চারি দিকে লাগিয়ে দেব গাছ-পালার বেড়া—আপনি থাকবেন, সন্ধ্যেয় আপনার মুখে প্রভুর নাম শুনব। আপনার গোপাল বড় হবেন, বাবাজী

হবেন—উনিও থাকবেন এইখানে, আমাদের ছেলেরা থাকিবে, আখড়ার সেবা তারাও করবে!

বষ্টুমী বলিয়াছিল—না বাবা। আমাকে যেতেই হবে, প্রভুর ধামে যাব বলে বেরিয়েছিলাম, পথে গোপাল এল কোলে! গোপালকে নিয়েই যাব শ্রীধামে। সেখান ছাড়া আর কোথাও ওকে রেখে আমি শান্তি পাব না। আমি ছাড়া ওর তো আর কেউ নাই, এক আছেন তিনি, তাঁর কাছেই রেখে যাব।

হঠাৎ কে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমনই উচ্চকণ্ঠের বাধা বন্ধহীন পাগ্‌লা ঝোরার মত সে হাসি যে ব্রজ চমকিয়া উঠিল। কাছেই বসিয়াছিল বাগ্দীবুড়ী, সে ফিস ফিস করিয়া বলিল—রতন ক্ষ্যাপা—পাড়ার মাতব্বর!

একজন প্রৌঢ় আসিয়া ব্রজর সামনে বসিল। ঝাঁকড়া পাকা চুল, পাকাদাড়ী-পাকা-গোফ শক্ত সমর্থ মানুষ—যেন অনেক পুরানো কালের শ্যাওলা পড়া খস্-খসে—একখানা অক্ষয় পাথর; সে যেন এখানকার এই নরম মাটি সবুজ ঘাসের দেশের নয়—কোন পাথুরে অঞ্চলে পাহাড় খসিয়া গড়াইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। সামনে বসিয়া সে নিজেই বলিল—আমি ক্ষ্যাপা, মা। এদের পাড়ার মাতব্বর।

ব্রজ বলিল—গোবিন্দ তোমার ভাল করবেন বাবা। কিন্তু আপনি এমন করে হাসলেন কেন?

—তোমার কথা শুনে হাসলাম মা। তবে এমন করে হাসলাম, ক্ষ্যাপা বলে, আমার এমনিই হাসি। আমি ক্ষ্যাপা—দু তিনবার ক্ষেপেছি মা।

—আমাকে ঠাঁই দেবেন না আপনি?

—তারা তারা বল মন। সে জন্যে নয় মা। তাই তো পাড়ার লোকে দিয়েছে গো।

—তবে?

—তোমার কথা শুনলাম—সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম—একটা বাছুর চেঁচাচ্ছে—হাম্বা-হাম্বা-হাম্বা। এই দুটো এক হয়ে গেল। আর হাসি এল। তুমি বললে তুমি ছাড়া ওর কেউ নেই; তার মানে ও নিজেও নাই, শুধু তুমিই আছ! গরুর বাছুরটা বললে—হাম্-বা। মানে হাম—হ্যায়। তোমার বাচ্চাও হাম্-বা বলে ডাকবে গো। এই বোল ফুটতে দাও। দুনিয়ার বোলই হ'ল হাম্-বা।

ব্রজ স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিয়ে চাহিয়া বলিল—আপনি কি বলছেন বাবা?

পাশ হইতে বুড়ী বলিল—গাও গাও তুমি! ওর মাথার ঠিক নাই। তার ওপর গাঁজা খায়।

বুড়ী হা-হা করিয়া হাসিয়া পাগলের মতই বলিয়া উঠিল—হাম্-বা, হাম্-বা। গরু মা—আমি গরু তুমি গরু ওই বুড়ী গরু—তোমার ওই কোলের বাচ্চা—ওটা কেনে বাছুর।

ব্রজ মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না বাবা। আমরা প্রভুর চরণের রজ। এ দেহ তাঁর, এরূপ তাঁর—এ কণ্ঠ তাঁর—আমাদের প্রাণ যে তিনি। আমাদের তো আমি নাই—আমির সাধ আমার মিটেছে—সে মরেছে বাবা, আমাদের সব—তুমি। সেই শেখাবার জন্যেই তো একটু বড় হলেই ওর হাত ধরে বেরিয়ে পড়ব পথে; ওকে বুঝিয়ে দোব দেখিয়ে দোব, চিনিয়ে দোব আমির মেকি—তুমির আসল দাম! ওর যে বড় দুর্ভাগ্য বাবা, নইলে ওর মুক্তি কিসে হবে বল!

বুড়া তাহার রাঙা চোখ দুটা বড় বড় করিয়া বলিল—ওরে বেটী—

ওরে বেটী। ওরে আমার হারামজাদী; এঁ্যা—এত কথা—এসব বুলি ফুটল কি ক'রে তোর মুখে? ওমা—তোর সঙ্গে আমার মিলবে ভাল। কিন্তু গাঁজা খাস মা? না-খেলে তো জমবে না?

ধমক দিয়া উঠিল বুড়ী-এই দেখ—এই দেখ—ক্ষ্যাপামী আরম্ভ করলে দেখ! গাঁজা খাবে কি? কি আবোল্ তাবোল বকছ? যাও সব চান করে এস, খেয়ে নাও। বষ্টুমী গান শোনাবে।

—কালী কালী—তারা তারা—হরি-হরি বল মন। তাই বটে। ক্ষ্যাপার মন বৃন্দাবন, এমন মধুর নাম ছেড়ে বকে যাচ্ছে আবোল-তাবোল। হাম্ বা-মা এ হ'ল ওই হাম্-বা! তোমার কাছে শিখব মা, এই হাম্বা বুলি ছাড়ব। তোমাকে ছাড়ব না। ঠিক বলেছ—হাম্-বা ঘুচলেই তুঁহু-তুঁহু রব ওঠে। গরু মরে—তার হাম্-বা বুলি ঠাণ্ডা হয় তখন তাঁর তাঁত থেকে—ধুনুরীরা ধুনুচি করে তুলো ধোনে—তখন তাতে বুলি ওঠে তুঁহু-তুঁহু তুঁহু-তুঁহু। তুই আমার ধুনুচি মা! কালই তোর আখড়া আমি বানিয়ে দোব! ক্ষ্যাপা রতন সব পারে মা!

পুরুষেরা গেল স্নানাহার সারিতে, মেয়েরা উঠিল—সন্ধ্যা জ্বালিতে—পুরুষদের ভাত দিতে। ব্রজ একা বসিয়া রহিল, পর্ব্ব-পার্ব্বণের গোবর নিকানো আঙিনার মাঝখানে আঁকা শুভ্র আল্পনা খানির মত! মন তাহার অজস্র ফোটাফুলে ভরা সন্ধ্যামণি গাছটির মত প্রসন্ন—কত কল্পনা মৌমাছির মত উড়িয়া উড়িয়া গুঞ্জনে গুঞ্জনে মুখর করিয়া তুলিল তাহার চিত্তকে।

একটি আখড়া গড়িবে; প্রশস্ত আঙিনা রাখিবে, পরিপাটি করিয়া নিকাইয়া রাখিবে, যেন এতটুকু ধূলা না থাকে, একটি ইট-পাথরের কুচি উঠিয়া না থাকে। দামাল ছেলে উঠানময় হামা দিয়া ঘুরিবে, গায়ে যেন ধূলা না থাকে, হাঁটুতে যেন ইট-পাথরের কুচিতে ক্ষত না হয়!

ঘরের দাওয়াগুলি হইবে নিচু নিচু, পড়িয়া গেলে যেন কাটিয়া-কুটিয়া না যায়! বেড়ার গাছের মধ্যে বিশল্যকরণী ও ঈশের মূলের গাছ পুঁতিয়া দিতে হইবে; ঘরে ভাঁড়ে একটি মনসার গাছ পুঁতিয়া ফুল জল দিবে,—যেন সাপ না আসে! এখন হইবে একখানি ঘর, তারপর একখানি ছোট উঁচু দেবতার ঘর, প্রভুর সেবা প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, সে না-হইলে তো বৈষ্ণবের আখড়া হয় না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল সে। যুগল-বিগ্রহ মনে পড়িল তার! মনে পড়িল তার বিগত জীবনের স্মৃতি! প্রেমের দেবতাকে যুগলরূপে সম্মুখে রাখিয়া কত খেলাই খেলিয়াছে। দোলে আবীরে-কুমকুমে গাঢ় লাল রঙে—ফুলের মালায় রাধাশ্যামের পূজা করিয়া সেই প্রসাদ লইয়া প্রেমাস্পদের সঙ্গে কত মাতামাতি! সে বাজাইত খোল—নিজে করতাল বাজাইয়া গাহিত গান। ঝুলনে যুগল দেবতাকে ঝুলনায় চাপাইয়া দু' জনে দাঁড়াইত দুই দিকে, ওদিক হইতে সে ঝুলনা ঠেলিত—এদিক হইতে ঠেলা দিত নিজে বষ্টুমী। গুন-গুন করিয়া সে গান গাহিত।—"অপরূপ ঝুলন—নানা ফুল শোভন—তা'-পর কিশোরী-কিশোর।"

রাস-পূর্ণিমার রাত্রি মনে পড়িল। সে কি জ্যোৎস্না আকাশে! দুটি-চারিটি নক্ষত্র মাত্র ফুটিয়া থাকিত, এ ছাড়া আকাশে শুধু চাঁদ। আকাশটাকে দেখিয়া মনে হইত, নীল আকাশটা যেন ঘামিতেছে—গলিতেছে! আখড়ার আঙিনায় গাছের ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া মাটির উপর রূপের টুকরার মত পড়িয়া থাকিত!

ভাবিতে ভাবিতে চোখে জল আসিল। টপ্-টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল ছেলেটির উপর। ছেলেটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। বৈষ্ণবীর চমক ভাঙিল তাহার সে চঞ্চলতায়। দোলা দিয়া একটি হাত তাহার বুকে রাখিয়া অন্য হাতে আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া সে ঘাড় নাড়িল—না।

না। দেবতা নহিলে ঘর নয় এ কথা সত্য, তবু যুগল বিগ্রহ আর সে স্থাপন করিবে না। এই সব পর্ব্ব-পার্ব্বণ পালন করিতে গিয়া সে আর কাঁদিতে পারিবে না। সে এবার মহাপ্রভুর সেবা প্রতিষ্ঠা করিবে। —"আমার গৌরাঙ্গ জানে প্রেমের মরম!

ভাবিতে ভাবিতে ভেল রাধার বরণ।"

সেদিন গানও সে ধরিল—ওই গান।

গানে গানে সন্ধ্যাটিকে সে মহোৎসব সন্ধ্যা করিয়া তুলিল।

উৎসবের আনন্দে শুধু হাসি, এদেশের মানুষেরা বলে—মহোৎসবের আনন্দে হাসি নয়—কান্না; যে কান্নায় বিলাপ নাই—শুধু চোখের জল ঝরে, সেই কান্না। এ দেশের মানুষ এ কান্না কাঁদিতে জানে—কাঁদিতে ভালবাসে। তাহারা ঘন-ঘন চোখের জল মুছিতেছিল।

হঠাৎ গানের একটি স্বল্প বিরতির মধ্যে কে যেন বলিল—কি রে রতন দাদা এ যে তোরা গানে গানে নদে ভাসিয়ে দিলি! আহা-হা—এমন গান তো বড় একটা শুনতে পাই না ভাই!

ব্রজ চোখ তুলিল।

কলরব করিয়া গানের ব্যাঘাত করিবার প্রবৃত্তি তখন কাহারও ছিল না, কিন্তু মজলিসের সকলেই অল্প চঞ্চল হইয়া উঠিল। চাপা-গলায় মাতব্বর বুড়া নিঃশব্দে এক-গাল হাসিয়া বলিল—মণ্ডল ভাইটি!

মণ্ডল বষ্টুমীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া মাতব্বর বুড়াকে হাত-ইসারায় চুপ করিতে ইঙ্গিত করিল। বষ্টুমী তাহাকে দেখিয়াই চিনিল। সে শিহরিয়া উঠিল।

পরমুহূর্ত্তটি ছিল পুনরায় গান ধরিবার মুহূর্ত্ত। সে গান ধরিয়া গান খানি কোন রকমে শেষ করিয়া খঞ্জনী রাখিয়া বলিল—আর পারছি না বাবা! আজ থাক।

লোকটি হাত জোড় করিয়া বলিল,—আমিই কি এমে অপরাধ করলাম—মা জী ?

ক্ষ্যাপা রতন বলিল—হে-ই মা! ওরে আমার মা মণি, আর একখানি। ভাইটি আমার এল,—আর এমন মধুর নাম—থামিয়ে দেবে তুমি—তা হ'লে আমার খেদ থাকবে মা। ভাইটি আমার ভক্ত, রসিক! ও—ও পাগল মা। আর একখানি। নইলে আমি পায়ে ধরব।

অপ্রসন্ন চিত্তেই এবার ব্রজদাসী গান ধরিল।

* * * * *

লোকটি এ-অঞ্চলে সম্মানিত ব্যক্তি তাহাতে বৈষ্ণবীর সন্দেহ রহিল না। শুধু সম্মানিতই নয়, মানুষটির সঙ্গে এই সব পাড়ার লোকের একটি হৃদ্য অন্তরঙ্গতাও আছে। সম্ভ্রম ভরে তাহাকে তাহারা মোড়া দিল বসিবার জন্য। লোকটি বলিল—না। মোড়া সরাইয়া দিয়া বলিল—একখানা নতুন চ্যাটাই থাকে তো দে। প্রভুর নাম হচ্ছে—যিনি গাইছেন, তিনি মাটিতে বসে,—আমি ওপরে বসব কি রে? আক্কেল আর তোদের হবে কবে?

ব্রজদাসী লোকটির কথা গানের মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছিল। কাল সে বলিয়া গিয়াছিল আজ আসিবে। ব্রজ কথা দিয়াছিল—তাহার জন্য সে অপেক্ষা করিবে। সে ছিল একটা সঙ্গীন আবেগময় মুহূর্ত্ত! আজ ব্রজর চিত্ত তাহাকে দেখিবামাত্র কিরূপ তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে যাহা বলিতে আসিয়াছে—সে তো ভাল করিয়াই জানে, অক্ষরে-অক্ষরে জানে।

কাল গাছের ফাঁস লাগানো দড়ি সত্য সত্যই বাঁধা দেখিয়া মানুষটির প্রতি করুণা তাহার হইয়াছিল। আজ আর কোন মমতা নাই।

লোকটার অবস্থা ভাল, নিজের মুখেই সে বলিয়াছে কাল। আজ কিছু টাকা আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিবে—এই ক'টি তোমায় নিতে হবে। না বললে আমি শুনব না। তোমাকে দিচ্ছি না, এ ওই ছেলেটার জন্যে। এ তোমাকে নিতেই হবে। তুমি ওর ভার নিলে, ওকে মরণের মুখ থেকে রক্ষা করলে, আমাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালে—এর দাম টাকায় হয় না, মানুষ দিতে পারে না, সে যা দেবার, যে দেবার—সেই দেবে—তোমার জীবন ভ'রে দেবে, গাছকে যেমন ফুলে ভ'রে দেয়, নদীকে যেমন জলে ভ'রে দেয়, দিনকে যেমন আলোয় ভ'রে দেয়, তেমনি ক'রে দেবে। এ টাকা ক'টা—ওর জন্যে খরচ করো, যদি কখনও অসুখ-বিসুখ করে—কখনও কোন বিপদ আপদ হয়—কখনও যদি অনবুঝের মত কোন দামী কিছুর জন্য ঝোঁক ধরে—তবে এই থেকে খরচ করো।

* * *

ব্রজদাসী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—প্রভু সমস্ত দিন ধ'রে মনের মধ্যে একটি বীজকে জল দিয়ে দিয়ে তা' থেকে একটি অঙ্কুর বের করেছিলাম। তাতে পাতা মেলবে—ডাল মেলবে—ফুল ধরবে, ফল ধরবে—এই সাধের নেশা পেয়ে বসেছিল আমাকে। ওই লোকটিকে দেখে আমার সে নেশা ছুটে গেল; ও যেন এসে পড়ল এক ঝলক আগুনের মত।—শুর আঁচে বীজটির তাজা অঙ্কুর 'সামনে' নেতিয়ে পড়ল।

আক্ষেপ করিয়া উঠিল ব্রজদাসী—আঃ! ওই সুমতি যদি তখন হ'ত আমার! ওই মজলিসে সকলের সামনে ছেলেটাকে ওর কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বলতাম—নাও, তোমার পাপের ফল তুমি নাও, তুমি বয়ে মর, আমি কেন—বইব—কেন মিথ্যে—কলঙ্কের পসরা মাথায় নিয়ে, সাধের বাঁধনে বাঁধা পড়ব? কিন্তু—।

হুতাশায় বষ্টুমী বারবার মাথা নাড়িয়া বলিল—আমি যে তখন বাঁধা পড়েছি; আমার সর্ব্বনাশ তখন হয়ে গিয়েছে। নইলে—লোকটিকে দেখে ওই টাকা দিতে এসেছে অনুমান ক'রে আমার সমস্ত বুকটা ধড়ফড় ক'রে উঠল, মনে হ'ল—টাকা দেওয়ার মানে হ'ল—ওই ছেলে মানুষ ক'রে দেওয়ার দাম—মেটানো। যে দিন খুসী ছেলেকে বলবে—আমার ছেলে তুই বাবা, তোর মা ম'রে গিয়েছিল—বষ্টুমী তোকে মানুষ করেছে টাকা নিয়ে।

"ওকে কথা বলতে দোব না ঠিক ক'রে, আর গাইতে পারব না বলে—আমি আর থামলামই না। দেড় প্রহর রাত্রি পর্যন্ত গানই গেয়ে গেলাম। ভাবলাম—ভিন গাঁয়ের মানুষ, রাত্রি দেখে কথা না-বলেই উঠে যাবে। কিন্তু—।

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল ব্রজ। ব্রজর চোখের উপর ভাসিতেছে, চ্যাটাইয়ের উপর লোকটি অচঞ্চল হইয়া বসিয়া আছে।

* * *

অচঞ্চল মহেশ মণ্ডল।

মাথার উপর কৃষ্ণাদ্বাদশীর নীলাভ অন্ধকার আকাশ, কোটী কোটী নক্ষত্র। মধ্যে মধ্যে নিশাচর পাখী পাখা ঝাড়িয়া—ডাক দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। মজলিসে ছেলেরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, অনেকে ঘুমে ঢুলিতেছে; বাগ্দী মাতব্বর ভাম্ হইয়া বসিয়া আছে, বুড়ী বলিল—এইবার থাম মা। নাম রাখ এইখানে। সব ঢুলছে। তার ওপর মা—তোমার শরীল আছে মা। কাঁচা সন্তানের মা,—ঠাণ্ডা লাগবে—হয় তো লেগেছে।

মাতব্বর পাগল রতন—অকস্মাৎ সজাগ হইয়া উঠিল কথাটা শুনিয়া—আ—হা—হা! সাধে কি বলে গাঁজা বড় পাজী নেশা!

কথাটা খেয়ালই হয় নাই আমার। কিন্তু—তোমার নিজের তো স্মরণ করা উচিত ছিল মা! আর বুড়ী—আর রমনের মা—তোরা? তোরা তো নেশা করিস নাই! ছি—ছি—ছি! ওঠ মা—ওঠ! ওরে—মা জননীকে একটা বড় বাটীতে করে দুধ দে! ভর্তি করে দিবি। বুকে দুধ আসা চাই!

লোকটি তবু উঠিল না।

ব্রজদাসীর চোখ দুটি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। সে আক্রোশভরে—মাতব্বরের কথার উত্তর দিবার ছল করিয়া বলিল—আমি তোমাদের ঘরের লোক হয়ে গিয়েছি বাবা, আমার জন্যে ভেবোনা, ব্যস্ত কেন হচ্ছ—আমি চেয়ে খাব। আগে অতিথ বিদায় কর বাবা। এই—এঁকে। মনে হচ্ছে—ইনি যেন তোমাদের এখানকার মহৎ লোক, বড় লোক, অনেক খাতির—অনেক টাকা!

মণ্ডল খোঁচাটা হজম করিল। নীরব হইয়া রহিল।

বাগ্‌দী মাতব্বর বলিয়া উঠিল—তা-মা, আপুনি ঠিক ধরেছেন! মণ্ডল ভাইটি আমার এ অঞ্চলের পবিত্র মানুষ, মহৎ মানুষ! ভর্তি জোয়ান বয়সে ভাইটির আমার ঘর ভেঙে গেল—মোল্যান বউমা সীঁথিতে সিঁদুর নিয়ে চলে গেলেন—ভাইটি আমার আর সংসার করলেন না। মাছ ছাড়লেন—থান পরলেন—বামুন ঘরের বিধবার মত আচরণ ওঁর! দেশের গরীবদের ধান দেন বর্ষায়, শকতি ছাড় বাড়ি নেন না।

তা' ছাড়া—আরও—

সে আর কিছু হয়তো বলিত, কিন্তু বৈষ্ণবী আর থাকিতে পারিল না বলিল—একটা কথা বলব বাবা আমি? কিছু মনে করবে না তো বাবা মণ্ডল মশায় যেন রাগ করবেন না। আমি যা বুঝি—তা বলছি। বাইে

দেখে মানুষের ভিতরটা বুঝা যায় না। আমি তো বাবা সারা জীবন ঠকেই এলাম। এই দেখ না বাবা, আমাকেই দেখ। বষ্টোমের মেয়ে —গৃহী-গেরস্থ নাই—। মা-বাপ ছিলেন—গেরস্থ গৃহী। আমি প্রভুর সেবায় প্রেমের গুরু হিসাবে আখড়ার মহান্তের সঙ্গে মালাচন্দন করেছিলাম। প্রভু আমাকে রূপ দিয়েছিলেন—আমাকে দেখেই তোমরা বাবা—আহা-আহা বলে কত মায়া করলে—গান শুনে গলে গেলে—কিন্তু একবার ভাবলে না বাবা—প্রভুর সেবায় দেহ মন যে সঁপে দিলে—তার কোলে এই শিশু কেন? এল কি ক'রে?

সমস্ত মজলিসটা এক মুহূর্ত্তে, ওই শেষের দু'টি প্রশ্নে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কথাটা সত্যই কাহারও মনে হয় নাই। নহিলে প্রশ্ন করিবার কথাই তো! বৈষ্ণবীর ওই কোমল মধুর রূপ তাহাদের চোখে পড়িবা মাত্র তাহারা অন্তরের মমতা বিনা প্রশ্নে ঢালিয়া দিয়াছে অন্তর উজাড় করিয়া। সদ্য উদ্গত বিবর্ণ অঙ্কুরের দল দু'টির উপর সূর্য্যের দৃষ্টি পড়িবা মাত্র বিষবৃক্ষের অঙ্কুর—না—অমৃত পুষ্পের অঙ্কুর বিচার না করিয়াই তাহার উপর ঢালিয়া দেয় সবুজ লাবণ্যের রসধারা—তেমনি করিয়াই ঢালিয়া দিয়াছিল। কিন্তু এ মেয়েটিই বা কেমন মেয়ে যে সকলের চোখে চোখ রাখিয়া এমন উঁচু গলায় সেই কথা বলে? সকলে হতবাক্ হইয়া বষ্টুমীর দিকে চাহিয়া রহিল। মণ্ডল বসিয়া রহিল মাথা হেঁট করিয়া। কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষ বাগ্দী মাতব্বর ওই রতন। সে নিজের কথা শেষ করিয়া সদ্য ছোট তামাকের কল্কে হাতে করিয়াছিল, বষ্টুমী কথা বলিতে বলিতে একটা টানও দিয়াছিল, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ধোঁয়া চাপিয়া সে বাকী কথাগুলি শুনিল; লোকে যখন হতবাক্ হইয়া মেয়েটির দিকে চাহিয়াছিল তখন সে ধোঁয়াটা ছাড়িল, তার পর বলিল—ওরে বেটী কথাটার জবাব আমি দিই। তোমার কোলে ছেলে দেখে আমরা ও-সব

ভাবতে যাব কেন মা? যে গাছে ফুল হয় মা—সেই গাছেই ফল হয়। আবার এমন ফুলও আছে মা—যার ফুলের মধ্যেই থাকে তার বীজ। দেবতার পূজোর জন্যেই যে ফুল গাছ লাগালাম মা—তাতে কোন ফুল যদি তুলতে ছুট হয়ে ফলই হয় মা—তবে কি তা গাছের পাপ? না—সেই জন্যে কি সে গাছের গোড়ায় জল দেবে না মানুষ? বেশ ত' মা, ফুলে পূজো না হয়ে থাকে—ফলে পূজো হবে ঠাকুরের। শেষে শুধু মণ্ডলের দিকে চাহিয়া সে বলিল—কি বল গো মণ্ডল ভাইটি?

মণ্ডল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তোর কথা আলাদা রতন দাদা, তুই হলি রতন পাগল। কিন্তু সংসার তো তোর চোখ পায় নাই, —তোর মনও পায় নাই! উনি সেই দিক দিয়ে ঠিক বলেছেন। সংসারের মানুষের ভেকই সর্ব্বস্ব। বাইরে দেখে চেনা তাকে যায় না। এই পাঁচ জনে আমাকে ভালো লোক বলে। কিন্তু আমি তো জানি, লোককে আমি কত ঠকিয়েছি!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মণ্ডল বৈষ্ণবীকেই বলিল—মানুষের ভাগ্য বড় খারাপ। ভাগ্যই বই কি, তা ছাড়া আর কি? ভগবানকে পাওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে পথ চলতে চলতে হঠাৎ হুঁচোট খেয়ে কি পা-পিছলে যখন আছড়ে পড়ে, তখনকার কথা একবার ভেবে দেখুন দেখি! স্নান করে শুদ্ধ হয়ে কপালে তিলক একে পূজোর থালা নিয়ে যেতে গিয়ে পড়ল পা পিছলে পথের পাঁকে—সর্ব্বাঙ্গে লাগল কাদা,—লোকে হো-হো ক'রে হাসলে—

বাধা দিয়া রতন মাতব্বর বলিল, ওরে ভাই, এইখানেই তোর হার হ'ল। কাদা মেখে যেদিন পূজো করতে যেতে পারবি—সেদিন আর পথে পড়ে গিয়ে ঘরে ফিরতে হবে না কাপড় ছাড়তে চান করতে। পড়বি—উঠবি—আবার পড়বি—অবার উঠবি—পথ চলবি। ওই

মায়ের দিকে চেয়ে দেখ—যা বললেন নিজের মুখে—তাই যদি মানি—ও যদি হয় কাদার তাল—পাপের ছাপ—তাই কেমন কোলে নিয়ে বসেছেন দেখ। কেমন হাসিমুখে উঁচু গলায় বললেন মনে কর। ওঁর পথ আটকায় কে? মা, তুমি পাবে—পাবে।

অবাক্ বিস্ময়ে বষ্টুমী বাগ্‌দী মাতব্বের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বলিল—কে বাবা, তুমি তো সহজ মানুষ নও!

হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল মাতব্বর। পাগ্‌লা পাগ্‌লা মা। রতন পাগ্‌লা আমি! বার দুয়েক ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম তা—। বুড়া আঙুল দু'টি নাড়িয়া বলিল—খটো খটো লবডঙ্কা! একবার ঐ বাগ্‌দিনীর মুখ মনে পড়ে ফিরে এলাম—আর একবার ফিরলাম—রমনের মায়ায়। এখন আবার রমনার দু'টো বেটা হয়েছে। ক'ষে কোদাল চালাচ্ছি মা। ঠিক করেছি—ওই ছোড়া দু'টোকেই ভজে শেষ পর্যন্ত দেখব। আবার প্রাণখোলা হা-হা হাসিয়া বুড়া গড়াইয়া পড়িল।

মণ্ডল বলিল—এতক্ষণে যেন খানিকটা চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল সে, বলিল—রতন দাদা, হাসাবি পরে। এখন একটা কাজের কথা বলি শোন! শরীরটা যেন খারাপ হয়ে পড়ল মনে হচ্ছে!

বুড়া হাত বাড়াইয়া দিল, বলিল—দেখি, নাড়ীটা দেখি।

মণ্ডল বলিল—থাক, নিদেনের দিন আসে নাই—হাত তোকে দেখতে হবে না। এক কাজ কর, বাড়ীতে আমার কাউকে পঠিয়ে দে। খবর দিয়ে আসুক, আজ আর আমি ফিরব না।

—তার লেগে আর ভাবনা কি? ভাবনা—। বুড়া ভাবনায় যেন নিমগ্ন হইয়া গেল এক মুহূর্ত্তে। ক্ষুধায় হাসি ফুটিয়া উঠিল বষ্টুমীর ঠোঁটে।

সে বেশ বুঝিয়াছে—মণ্ডল তাহার সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলিবার

সুযোগ খুঁজিতেছে। আরও বুঝিয়াছে যে, সে তাহার পাপের দাম দিতে আসিয়াছে। সে বলিল—তাই তো! শরীর খারাপ হ'ল আপনার—আর আপনার মত মানুষ সুখের শরীর নিয়ে—এখানে এই—

—সে ওর অভ্যেস আছে মা। কত দিন ভাইটি আমার নদীর চরে সারা রাত ঘুরে বেড়ান। বাগ্‌দী বুড়া বলিল—শরীর ওর খারাপ নয় মা—মন ওর খিঁচড়ে গিয়েছে। আজ ও সারা রাত নদীর গর্ভে বসে থাকবে। হাসিয়া বলিল—ও জানে, কেউ জানে না,—কেউ দেখে না—কিন্তু ক্ষ্যাপার মন বৃন্দাবন, কখন যে বাঁশী বাজবে সেখানে, তার তো ঠিক নাই। রতন পাগল রাত দুপুরে কত দিন দেখেছে, ভাইটি আমার আকাশ পানে চেয়ে আছে। কাছে যাই না, ভাইটি চমকাবে বলে, তবে বুঝতে পারি চোখে জল গড়াচ্ছে! নদীর গর্ভে যে কাটাতে পারে সারাটা রাত, সে আর একটা রাত আমাদের পাড়ায় কাটাতে পারবে না। এই ঘরে বিছানা করব তোমার, পিঁড়েতে থাকবে ভাইটি, উঠোনে থাকব আমরা সবাই। বাস্, এক রাত্তির তো! তার ওপর মানুষের দেহ। শুলো—না—ঘুমলো; ঘুমলো—না—মরলো! আবার সেই হা-হা করিয়া হাসি।

* * *

রতন বুড়া সহজ মানুষ নয়।

লোকে পাগল বলে, কিন্তু ব্রজদাসী আন্দাজ করিয়াছিল ঠিক। পাগলের মধ্যে বস্তু আছে। সে ঠিক আন্দাজ করিয়াছিল। আন্দাজ করিয়াছিল—মণ্ডল ভাইটির কথা আছে বষ্টুমীর মায়ের সঙ্গে।

সেদিন গভীর রাত্রে উঠিয়া বসিয়া সেই বলিয়াছিল, ভাইটি! মা জমুনী গো!

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই বলিয়াছিল—শুনছ আমার কথা?

তোমাদের কথা যা আছে, সেরে নাও। ঘুমিয়েছে—সবাই ঘুমিয়েছে। আমি জানি, আমি বুঝেছি, তোমাদের কথা আছে! বল তো না হয়, আমি খানিক ঘুরে আসি চাঁদের আলোয়। সত্যই বুড়া চলিয়া গেল।

বৈষ্ণবীর ক্রোধের আর সীমা ছিল না। ক্রোধ হইয়াছিল লোকটির উপর। সে নিজেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—কি তোমার কথা শুনি?

মণ্ডল বলিল,—এইটি নিতে হবে তোমাকে।

কাগজের একটি ঝাণ্ডল সে বাহির করিল। বলিল—আমার বোঝা তুমি নিজের ঘাড়ে নিলে, আমার অঙ্গের কালী নিজের অঙ্গে মেখে কলঙ্কিনী সাজলে তুমি। তার জন্যে আমি দিচ্ছি না। ওর জন্যে তোমার মত মানুষকে যে দাম দিতে যায়, তার মত মূর্খ নাই। আমি দিচ্ছি ওর জন্যে। ওই হতভাগা—ওর জন্যে তো দরকার হবে—

—না। তুমি নিয়ে যাও। নিয়ে যাও তোমার পাপের বোঝা!

বলিয়াই বষ্টুমী ঘরে ঢুকিয়া মুহূর্ত্তে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। বিছানায় শুইয়া এতক্ষণে সে অস্থির হইয়া উঠিল। রাত্রে শিশুটা পাশে শুইয়া কিলবিল করিতেছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে; মধ্যে মধ্যে কাঁদিতেছে, এ কিন্তু ক্ষুধার সুধা তাহার নাই, তাহাকে দুধে-ভিজানো ন্যাকড়ার শলিতা মুখে দিয়া শান্ত করিতে হইতেছে। হঠাৎ এই মুহূর্ত্তে মনে হইল—এ যে চরম দুর্ভোগ বলিয়া মনে হইতেছে! এক দিন নয়, দুই দিন নয়, কত দিন এই দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইবে, হিসাব করিতে গিয়া সে কূল-কিনারা পাইল না! আতঙ্কে অভিভূত হইয়া গেল। চোখে জল আসিল। মনে মনে বার বার বলিল, এ আমি কি করলাম! গোবিন্দ, এ আমাকে কোন্ জালে জড়ালে?

বাহির হইতে বাগদী বুড়া ডাকিল, মা জননী!

সে সাড়া দিল না।

বুড়া আবার বলিল—মোড়ল কি চলে গেল মা?

শুইয়াই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে আবার বলিল—কে চলে গেল?

—মোড়ল ভাইটি!

—তা তো জানি না।

—চলে গিয়েছে! চাদর লাঠি কিছুই নাই। ও—ও এক ক্ষ্যাপা মা।

বৈষ্ণবী বাহিরে আসিয়া বলিল—সাধের ক্ষ্যাপা বাবা!

বুড়া হাসিল। ও কথাটা বাদ দিয়া বলিল—কথা হয়ে গেল!

বৈষ্ণবী এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইল—তার পর বলিল—ওর সঙ্গে কথা আমার ছিল না বাবা। কিন্তু তোমাকে আমি গোটা কতক কথা বলব না-বলে আমি আর পারছি না।

—বল মা! না।—এখানে নয়। এরা সব উস্‌খুস্‌ করছে। ঘুম পাতলা হয়েছে। মনে হচ্ছে, উঠবে এক বার। চল, আমার মায়ের থানে চল।

মায়ের থান?

—আমার এক মা আছে মা। পাথুরে মা। বলেছিলাম না—বার দুয়েক ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম,—ক্ষ্যাপামি চেপেছিল ঘাড়ে। সেই ক্ষ্যাপামির ও একটা বোঝা। শেষ বার ছিলাম বামা ক্ষ্যাপা বাবার তারাপীঠে। মায়ের থানে পেসাদ পেতাম আর বামা বাবার কাছে বসে থাকতাম। বাবা গাল দিতেন, আর বলতেন—ভাগ বেটা! আমি বলতাম—আমাকে মা দাও তবে যাব। শেষে এক দিন নিজের মনই ঘর-সংসারের জন্যে কাঁদল। বললাম বামা বাবাকে—তাই ভাগলাম আমি। নিজে আগুলে রাখলে মা-কে, আমাকে দিলে না—সে তোমার

[illegible]ামার ঠাঁই ভাগের জন্যে আমিও নালিশ ক'র

[illegible]আমার বাবা ওরে হারামজাদা বেটা, নালিশ ক'রে

[illegible]—[illegible] নিবি কি। [illegible] বললাম—দেখবে কি লোব! কিছু না থাকে

[illegible]আমার—তোমাকেই ক্রোক করব আমি। এমন খাটুনী তোমাকে খাটাব—বুঝবে মজা! বাবার হাতের কাছে ছিল একটা পাথর—বাবা পাথরটা ছুঁড়ে আমাকে মারলে—মাথাটা সরিয়ে না-নিলে ফেটে যেত মাথাটা। তার পরে ত্রিশূল নিয়ে মারতে ছুটল। আমি মা ওই পাথরটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুট দিলাম। বাবা দিয়েছে। ওই আমার মায়ের ভাগ। আম বাগানের কোণে বুড়ো শিমূল গাছতলায় মাটির বেদী করে সেইখানে রেখেছি—ফুল-বেলপাতা-সিঁদুর দি। দুঃখ হলে বলি। কাঁদি। সুখ হ'লেও গিয়ে বলে আসি। ওতেই আমার মন সন্তুষ্ট। চল, সেইখানে চল।

গ্রাম-প্রান্তের সেই আম বাগানের এক কোণে বাগদী বুড়ার মায়ের স্থান। চারি পাশে নিবিড় জঙ্গল; জ্যোৎস্না তখন উঠিয়াছে, সেই আলোয় বৈষ্ণবী দেখিয়া বুঝিল—জঙ্গলটা তৈরী করা জঙ্গল; আর একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেই দেখিল—গাছগুলির অধিকাংশই বেল, কল্কে, করবী, জবা আর ধুতুরার। ভিতরে ঢুকিয়া দশ-বারো হাত পরিমিত একটি পরিচ্ছন্ন স্থান, সম্মুখেই একটা বড় গাছের তলায় একটি মাটির বেদীর চারি পাশে—ফুল-বেল-পাতার রাশি জমিয়া আছে। বুড়া বলিল—বস মা। বল কি বলবে বল!

ছেলেটিকে প্রাঙ্গণে নামাইয়া দিয়া ব্রজ বুড়ার মাকে প্রণাম করিল। তার পর বলিল—আমি কি করি বল তো বাবা? এ যে আমি বন্ধনে পড়লাম।

কিসের বন্ধন? ওর?—ছেলেটাকে দেখাইয়া দিল।

বাবা। ও তো আমার নয়।

-তোমার নয়? আমার খানিকটা যেন ছিল মা। তা —বয়স হয়েছে, দৃষ্টির জোর তো কমে এসেছে ... মুখ ঠিক ঠাওর করতে পারি নাই।

চমকিয়া উঠিল বৈষ্ণবী।—কিসে তোমার মনে হ'ল বাবা?

—তোমার চেহারা দেখে। চাষ করি মা—গাছ দেখে ফলন্ত-না-অফলন্ত বুঝতে পারি। গরু আছে ঘরে, শিঙের গাঁট গুণে দেহ কতটা ভারী হয়েছে দেখে বুঝতে পারি—ক' সন্তানের মা হয়েছে গাই। তা মা, মানুষের পেটে জন্মেছি, মানুষ নিয়ে ঘর করি, তোমার চেহারা দেখে বুঝতে পারব না? মেয়েগুলোর বুঝতে পারা উচিত ছিল—ওদের সন্দও হয়েছিল—আমাকে বললে—রমনের মা। বললে—বষ্টুমীর দেহ কি না, দেখে কে বুঝবে যে সন্তানের মা হয়েছে! তা ওকে কোথায় পেলে মা?

ব্রজ তাহাকে সব বলিয়া গেল। তার পর বলিল—বল তো বাবা, এবার আমি কি করি?

—কি করবে?

—হ্যাঁ?

—যা তোমার মন চায় মা, তাই কর। যদি বন্ধন সহ্য না হয়, তবে ওকে গাছতলায় শুইয়ে রেখে রাত্রে উঠে চলে যাও তোমার পথে। বল তো বুড়ো ছেলে তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসবে, যতটা বলবে।

—কিন্তু এর কি হবে?

—সে ভাবনা তুমি ভাববে কেন মা?

—তুমি ওর ভার নেবে বাবা?

-না। সে আমি পারব না। সে কথা আমি বলিছিও না।

—তবে?

—ওর ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে। কারুর দয়া হয় নেয়। নয় হয় তো—! বুড়া বিচিত্র হাসি হাসিল।

ঝঙ্ক বিস্মিত হইয়া বুড়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর বলিল তুমি এত নিষ্ঠুর বাবা?

বুড়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে জ্যোৎস্না-প্লাণ্ড স্তব্ধ রাত্রি যেন চমকিয়া উঠিল। নদীর ওপারে সে হাসির প্রতিধ্বনি উঠিল। বুড়ার মায়ের স্থানে শিমূল গাছের মাথায় কোন বৃহদাকার পাখী পাখার সাপট দিয়া নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। হঠাৎ হাসি থামাইয়া বুড়া বলিল—আমি যে ব্যাটাছেলে মা। আমরা নিষ্ঠুরই বটে। তার পর আবার বলিল—মা গো, বয়স হল অনেক। ঠেকে-দেখে বুঝলাম অনেক। তুমি নিষ্ঠুর বললে মা, কিন্তু বল তো, ওকে ঘাড়ে চাপালে ওই বাঁচবে না, আমি বাঁচব? পুরুষ মানুষ খেটে খেতে হয়, সকালে যাই সন্ধেয় আসি। কে ওকে দেখবে, বল? রমেনের মা ভাববে, রমেনের ভাগীদার এল, রমেনের বউ ভাববে—তার ছেলের অংশীদার এল। পাড়ার কারুর যদি সুস্থ সন্থ থাকত কোলের ছেলে—তবে তাকে দিলে হয়তো নিতে পারতো। কিন্তু তেমন তো নাই কেউ পাড়ায়।

তার পর বলিল—ওঠ মা, রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল। চল, বাড়ী চল। বরং সারাটা দিন কাল ভেবে নাও। যা তোমার প্রাণ চাইবে, তাই কর। ফেলে যেতে চাও, রাত্রে উঠে চলে যেও, পিছন ফিরে চেয়ে দেখো না। ওর কি হবে তা' ভেবো না। চলে যেও সামনে চক্ষু রেখে। আর প্রাণ যদি চায়—তবে ওকেই বুকে জড়িয়ে ধর, নিজেকে ভেঙ্গে-চুরে গড়, ঘর বেঁধে দি—থেকে যাও এখানে; আমি যত দিন আছি তোমার কোন কষ্ট হবে না। আমি মরলে—।

হাসিয়া বুড়া বলিল—তা' আমি এখনও দশ বছর বাঁচব মা। বেশ জোটো আছি এখন। চল—এখন ফিরে চল।

বৈষ্ণবীর মনে হইতেছে সে যেন জলে ডুবিয়া যাইতেছে। জলমগ্ন মানুষ ভাসিয়া উঠিয়া যেমন করিয়া মাথা নাড়ে অস্থির ভাবে তেমনি ভাবেই সে মাথা নাড়িল—সেটা হাঁ, অথবা না—কে জানে! বুড়া তাহা বুঝিল—সে বলিল—ভাল কথা মা। আজ তুমি ভাব। কাল যা' হয় করবে। ভাল ক'রে ভাব মা! হাম-বা? না-তুঁহু! তুঁহু!

বুড়ার কথা মত পরের দিনটা সে সমস্ত দিন থাকিল, অনেক ভাবিল। কিন্তু কূল-কিনারা পাইল না—ঘর বাঁধিতেও মন উঠিল না—ছেলেটাকে ফেলিয়া যাইতেও পারিল না। সমস্ত দিনটা চোখ মেলিয়া বসিয়া রহিল চোখে কিছু পড়িল না; শুধুই ভাবিল রাত্রে সকলে ঘুমাইয়াছে তাহার চোখে ঘুম নাই—সে ভাবিতেছে। বুড়াই তাহাকে বেশী করিয়া ভাবাইয়া দিয়াছে। সে লোকটা চলিয়া গিয়াছে। বুড়ার কথাই ভাবিতেছে সে। আর এইবার প্রত্যক্ষ ভাবে বোঝার গুরুত্বটা অনুভব করিতেছে।

হঠাৎ বাহিরে কাহার পায়ের শব্দ উঠিল। ব্রজ বুঝিল সে কে। কিন্তু শুনিয়াও—চঞ্চল হইল না। সে শক্তিই তাহার যেন নাই। এইবার কে ডাকিল—মা!

বুড়া ডাকিতেছে। ব্রজ সাড়া দিতে পারিল না। সে যেন আধ-নিদ্রার মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে—প্রাণপণে জাগিবার চেষ্টা করিতেছে তবু জাগিতে পারিতেছে না।

—মা!

এঁ্যা? বদ্ধ কণ্ঠে এবার সে সাড়া দিল।

—যাবে যদি মা—তবে এই সময়। ভরা ঘুমে সব ঘুমোচ্ছে।

বললে—আমার অপরাধ হয়। ভগবান রূপ দিয়েছিলেন—তাতে কালো দাগ ধরেছে বয়সের সঙ্গে, কোলে এই দেখুন—আমার ফুল ফল হয়ে গিয়েছে।

—বেশ তো। ওই ফলে সাজিয়ো প্রভুর নৈবেদ্য। প্রভুর লীলায় কি শুধু রাধাই আছেন? মা যশোমতী নাই?

ব্রজদাসী বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ইংরাজী জানা বাবাজী বলিয়াই হয় তো এমন নূতন মধুর কথা শুনাইতে পারিলেন তাহাকে।

মহেশ মণ্ডল নীরবে বসিয়া সব শুনিতেছিল, আঙুল দিয়া মাটি খুঁড়িতেছিল।

বাবাজী তাহাকে বলিলেন—তুমি এত নীরব কেন মহেশ?

বাগ্দী বুড়া হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল—রব সময়-বিশেষে হ'রে যায় বাবাজী! ঠাঁই-বিশেষেও হ'রে। আবার মানুষ-বিশেষে তার সামনেও হ'রে। কিম্বা হয়তো মনের মধ্যে কোন ভাব উঠেছে আর কি! সুখ হোক, দুঃখ হোক—উঠেছে কিছু!

বাবাজী হাসিয়া বলিলেন—কি ব্যাপার মহেশ?

বুড়া বলিল—ওই দেখ! যে দরজায় ধাক্কা দেবে দাও গোঁসাই—মানুষের ভাবের ঘরটি হল আসল ঘর—ওখানে ধাক্কা মেরো না। লাও গো মা—গান শোনাও বাবাজীকে!

গান শুনাইবার আগেই সে একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। কি জানি, কেন, লোকটির প্রতি আজ আর সে কিছুতেই রাগ করিতে পারিল না। বরং খানিকটা যেন দুঃখ হইল। সে ছেলেটিকে ভালো করিয়া তাহাকে দেখাইবার সংকল্প করিল। দেখিয়া যাক! কেমন হইয়াছে—কত সুন্দর হইয়াছে একবার দেখুক। বাবাজীকে সে

বলিল—একটু বসুন প্রভু! আমার। গান শেষ করিয়া খঞ্জনী রাখিয়া সে চোখ মুছিয়া বলিল—আজ আর আমি পারব না প্রভু!

বাবাজী বলিলেন—আমিও আর শুনতে চাইব না। এর বেশী আর কি শুনব?

ব্রজ বলিল—ও কথা আপনিই বলতে পারেন বাবা। কত বড় মহাজন আপনি! শুনেছি তো সব!

—কি শুনেছ? বড় চাকরী করতাম?

ব্রজ একটু লজ্জিত হইল। বাবাজী হাসিয়া আবার বলিলেন—বেশ তো, তোমার ছেলেকে ইংরিজী লেখা-পড়া শেখাও, ও-ও বড় চাকরী করবে। আমি যদি বেঁচে থাকি তবে যাতে চাকরী পায় তোমার ছেলে—সে চেষ্টা আমি করব। আর আজ নিয়ে এস ওকে—মাথায় হাত দিয়ে সেই আশীর্ব্বাদ করে যাই! আন ওকে।

ব্রজ স্থির দৃষ্টিতে বাবাজীর দিকে চাহিয়া রহিল।

বাবাজী বলিলেন—ভাবনায় পড়ে গেলে?

ব্রজ আরও কিছুক্ষণ ভাবিল। তার পর বলিল—ওকে কি আশীর্ব্বাদ করবেন সে আপনি জানেন বাবা! আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করে যান—আমি যেন ওকে রেখে ব্রজগোপালকে পাই।

বাবাজী বলিলেন—ও পাওয়া-না-পাওয়া তোমার হাতে। মানুষের আশীর্ব্বাদে মানুষ ধন পায় সম্পদ পায়—জ্ঞান পায় বুদ্ধিও পায়, কিন্তু যা চাইলে তুমি তা পাওয়া যায় না! ব্রজগোপাল পাওয়া যায়—দেওয়া যায় না। তবে চাইলে তুমি পাবে।

—এই আমার ঢের বাবা—এই আমার ঢের।

বাবাজী আবার বলিলেন—দুঃখ তুমি পেয়েছ—মুখে তার ছাপ রয়েছে। তার বদলে দুঃখ দিয়েছ কি না জানি না। মুখ দেখে মনে

হচ্ছে দাওনি। ওই তো চেয়ে পাওয়ার সব চেয়ে বড় দাবী গো! দয়া করে কাকে? দয়ার হকদার একমাত্র দুঃখীতেই যে! অন্ন-বস্ত্রের দুঃখের কথা তো নয়। ওটা আলাদা। আপন জনের অভাবে যে দুঃখ পায়—আপন জনে যাকে দুঃখ দেয়—সেই তো আসল দুঃখ। ও দুঃখ মানুষে ঘোচাতে পারে না বলেই তাকে বোঝাতে হয়। হক হয়েছে তোমার। তবে চেও! ভাল করে চেও। না চাইলে পায় না।

বাগ্‌দী বুড়া এতক্ষণ ঝিমাইতেছিল, গাঁজার দমটা তাহার আজ বোধ হয় বেশী হইয়াছে। এই কথাটা তাহার কানে যাইতেই কিন্তু সে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—ঠিক বলেছ গোঁসাই। কানা কুকুর মাড়ে সন্তুষ্ট, পোষা কুকুর এঁটোয় তুষ্ট, কেড়েখাকী হাঁউ ক'রে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে—হাঁড়ি-কুড়ি বেবাকে মেরে দিয়ে চলে যায়। দেখ না কেন আমার অদেষ্ট! পাথর পেয়ে ভাবলাম—রতন পেলাম। ফাঁকি—এক দম ফাঁকি, গোঁসাই এক দম ফাঁকি। কাঠের গুঁড়িতে ঢেকি করলে কাজ হয়—ধান ভানে। পোড়ালে পোড়ে। লাঙ্গল করলে মাটি চষে। ঠাকুর করলে কি হয়? কচু! কচু! আবার হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বুড়ার হাসিতে পাড়াটা গম্‌-গম্‌ করিয়া উঠিল। বষ্টুমী শিহরিয়া উঠিল, বলিল—ছি—[illegible]! ও-সব কথা বলতে নাই।

বুড়া রক্ত-রাঙা চোখ দুইটা মেলিয়া বলিল—কচু জানিস তুই। তুই তা হ'লে মরবি।

মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া গেল বষ্টুমীর মুখ।

বাবাজী উঠিবার সময় বলিলেন—একটা কথা তোমাকে বলবার ছিল। এক দিন এস আমার প্রভুর আখড়ায়! কেমন? গান শুনিয়ে আসবে!

(ঘ)

উদ্বেগ হইয়াছিল। বাবাজী বলিলেন—একটা কথা তোমাকে বলবার ছিল!

কি কথা? ওই মহেশ মণ্ডল বাবাজীর শিষ্য। সে কি গুরুকে বলিয়াছে? বলিয়াছে—দুলাল তাহার দুলাল নয়! বলিলে ক্ষতি হয় তো নাই—কিন্তু না—; মন তাহার—না বলিয়া উঠিল। রতন বুড়া জানিয়াছে—ইহাতেই তাহার মন অস্বস্তি—অশান্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। এ কথা—পৃথিবীর আর কেউ জানিলে—সে সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইবে। দুলাল তাহার নয়—এই কথা বলিয়া সাক্ষী দিবে!

যাই-যাই করিয়াও তাই যাওয়া হইয়া উঠিল না। সংসারে ছোট ছোট কাজগুলি বড় হইয়া উঠিল। কত দিন ভিক্ষায় মানগোবিন্দপুরের দিকের গ্রামের পথে বাহির হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া ফিরিয়া আসিল। পথ বদল করিয়া অন্যদিকের গ্রামের মুখে পথ ধরিল।

একদিন মহেশ আসিয়া দাঁড়াইল।

চোরের মত—মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ভাল আছেন!

হাসিয়া ব্রজ বলিল—ভালই আছি। আমার দুলালও ভাল আছে। দেখবেন আমার দুলালকে?

মহেশ বলিল—ভগবানে মতি আছে আপনার, পুণ্য ছাড়া আপনার জীবনে পাপ নাই—আপনার দুলাল ভাল থাকবে না?

ব্রজ দুলালকে কোলে লইয়া—দোলাইয়া চুমা খাইয়া—বুকে চাপিয়া বলিয়াছিল—কথা বলছে এইবার। আও—আও ক'রে—কত কথা!

মহেশ একবার কোলে লইবার বাসনাও প্রকাশ করে নাই, ব্রজও

দেয় নাই। কিছুতেই তাহার বলিতে মন উঠিল না—একবার নেবেন আমার দুলালকে কোলে?

মহেশ বলিল—বাবাজী আপনাকে যেতে বলেছিলেন—কই গেলেন না?

—রাস্তা যে অনেকটা দু ক্রোশ—আড়াই ক্রোশ পথ!

কথাটা নিতান্তই একটা তুচ্ছ অজুহাত। বলিয়া নিজেই অপ্রস্তুত হইল।

ভিখারিণী বৈষ্ণবী—পথ হাটিতে কষ্ট! ছেলেবেলায় মায়ের সঙ্গে কত হাঁটিয়াছে। হাঁটিয়া নবদ্বীপ গিয়াছিল। তার পর প্রথম যৌবনে হাঁটিয়াছে কত তাহার ঠিকানা নাই। সঙ্গে ছিল গুরু। বাউল বুড়ার সঙ্গ ধরিয়া ঘুরিতেছিল সে—হরিণী যেমন তৃষ্ণায় জলের সন্ধানে ঘোরে তেমনি করিয়া।

ঘুরিতে ঘুরিতে—গুরু সঙ্গ ছাড়িলেন। চলিয়া গেলেন নিজের তৃষ্ণার জলের সন্ধানে। সে সন্ধান তিনি তখন পাইয়াছেন। তার পর একা সে ঘুরিয়াছে। ঘুরিতে ঘুরিতে এক দিন হঠাৎ এক জনের সঙ্গে দেখা হইল। তাহার হাতে ছিল জলের ভৃঙ্গার। সেই জল সে পান করিল, যে জল দিল—তাহার ওই মায়া-মন্ত্রপড়া জল খাইয়া পোষ-মানা জীবের মত তাহার অনুসরণ করিল! কত পথ তাহার পিছনে-পিছনে হাঁটিয়াছে—তাহার হিসাব নাই। হিসাব করিলে বোধ হয় শতেক যোজনের তো কম হইবে না। তাহার মায়া-মন্ত্রপড়া জলের যাদু যেদিন কাটিল, সেদিন অনুভব করিল—জল সে একবিন্দু পায় নাই, পাইয়াছে যাদুর ঘোরে জলের বদলে নেশার পানীয়—সেদিন আবার পথে বাহির হইয়া যে পথটা হাঁটিয়াছে সেটা যে গোটা জেলাটা। সে কথার খানিকটা তো সে মহেশকে সেদিন রাত্রে বলিয়াছিল! আজ কাল

যে সে ভিক্ষা সাধিয়া বেড়ায়—সেও যে অনেক! লজ্জিত হইয়া সে তাড়াতাড়ি বলিল—যাব—যাব একদিন।

তারপর, বলিল—তিনি জানেন—!

—কি?

—দুলাল যে আমার নয়—?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মহেশ বলিল—না!

—গুরুর কাছে বলেন নি?

মহেশ একটু হাসিল। বলিল—না। পারি নি।

ব্রজ বলিল—নিতান্ত খাপছাড়া উত্তর দিয়া বলিল—যবে, বলবেন প্রভুকে, শিগ্‌গীর যাব একদিন।

খোকনকে লইয়াই যাইবে স্থির করিল। এই তো ক্রোশ দুয়েক পথ, কেউ কেউ বলে আড়াই ক্রোশ কিন্তু তা নয়, তাহারা বাড়াইয়া বলে; দুই ক্রোশ পথ—প্রহর খানেক বেলা হইতে-না-হইতে পার হইয়া যাইবে। একটু রৌদ্র হইবে—তা হোক—একখানা গামছা খোকনের মাথায় চাপাইয়া দিবে।

কিন্তু ঠিক আগের দিনই আউলি-বাউলি বাতাস আরম্ভ হইল, আকাশে মেঘ ঘটা-পটা করিয়া চলা-ফেরা সুরু করিল। বাগ্‌দী-পাড়ায় চাষী কৃষাণেরা মাথালি পাতিয়া মেরামত সুরু করিল, কড়া তামাকের পাতাগুলি শুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেগুলি পাড়িয়া কাটিয়া ফেলিল—গুড় দিয়া মাখাইল। যাহাদের চাল মেরামত হয় নাই, তাহারা খড় দিল চালে। বর্ষা নামিবে। আউলি-বাউলি বাতাস বহিতেছে—কাটা কাটা মেঘ রাত্রের আকাশে চলিতেছে—ফিরিতেছে; দু'-চার দিনের মধ্যেই 'দেবতা নামিবেন।' বৈষ্ণবী নিজেও জানে এ সব কথা। যাওয়া বন্ধ করিতে হইল এই কারণেই। ছোট একটা গোয়াল-ঘর

করিয়াছে—সেটা এখনও ছাওয়া হয় নাই। নতুন দেওয়াল—জল পড়িলে গলিয়া যাইবে গুড়ের পাটালির মত !

ঘর ছাওয়া হইল। বর্ষা নামিল। আবার মাস খানেক পর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল। আকাশে মেঘ তখন ধরিয়াছে; শরতের রৌদ্র দেখা দিয়াছে। মনে মনে—"যাও যাও গিরি—আনিতে গৌরী" গানের সুর গুন গুন করিয়া গুঞ্জন করিতে সুরু করিয়াছে; বসন্ত ঋতুতে কোকিলের গলায় পঞ্চমস্বর যেমন জাগিয়া ওঠে, গান গাহিয়া ভিক্ষা মাগিয়া জীবন ধারণ করে যাহারা তাহাদের গলাতেও ঋতুতে ঋতুতে বিশেষ ভাবের গান গুলি তেমনি ভাবে সাড়া দিয়া উঠে। ওই গান গাহিতে গাহিতেই সে বাবাজীর আখড়ায় গিয়া উঠিল।

মনোরম আখড়া। হইবে না কেন? বাবাজী তো ভিক্ষুক নন। তিনি বৈষ্ণব কিন্তু ভিক্ষা করেন না। শিষ্য-সেবক আছে তাহারা দেয় কিছু কিছু; আর নিজে তিনি জমি-জমা কিনিয়াছেন ঠাকুরের নামে। পাকা বাঁধানো আঙিনা, সুন্দর ছোট মন্দির; চারি দিকে ফুলের গাছ। মালতী লতায় তখন ফুল ধরিয়াছে। সাদা ফুলে ঝলমল করিতেছে, গন্ধে চারিদিক ভুরভুর করিতেছে। মৌমাছি ভ্রমরের গুনগুনানিতে যেন একসঙ্গে পাঁচ-সাতটা এক তারার তারে ঝঙ্কার উঠিতেছে। নিবিড়-পল্লব একটা বকুল গাছের মধ্যে কোথায় বসিয়া একটা হলুদমণি পাখী ক্রমান্বয়ে ডাকিয়া চলিয়াছে—গেরস্তের খোকা হোক! গেরস্তের খোকা হোক! গেরস্তের খোকা হোক! এ ছাড়া চারি দিকে ঝিল্লীর একটানা ডাক প্রবাহের মত বহিয়া চলিয়াছে; কোন উদাসিনী যেন গুনগুনানি গুঞ্জরণে মনের গান গাহিতেছে। বউমা পাখীটাকে উদ্দেশ করিয়া হাসিয়া বলিল—মরণ, ও ডাক ডাকতে এখানে কেন? যা-না গেরস্ত বাড়ীতে !

বাবাজী থাকেন একখানি ছোট্ট মাটির ঘরে! একখানি কুঠরী, কোন মতে মানুষ দাঁড়াইতে পারে তেমনি আয়তনে ছোট। মেঝেটি বাঁধানো। কম্বলের বিছানার তলায় দু'খানা ইট দিয়া বালিশ। সামনের দাওয়াটি প্রশস্ত। লোক-জন আসে—বসে, [illegible] হয়!

বাবাজী নীরবে বসিয়া ব্রজদাসীর পুরানো কথা গুলি শুনিতেছিলেন—মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়িয়াছে, চোখ দুটি বেদনায় ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। এতক্ষণে মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন—সে দিনের কথা—আমারও মনে আছে। তুমি পাখীটাকে স্নেহের সঙ্গেই তিরস্কার করলে—কথাটা আমার কানে গেল। কণ্ঠস্বরের মিষ্টতায় মনে হ'ল—এ নিশ্চয় সেই বৈষ্ণবী; বেরিয়ে এলাম—দেখলাম অনুমান আমার মিথ্যে নয়। মা যশোদার মত বসে আছ—[illegible]কে কোলে নিয়ে। দুরন্ত দামাল কালো ছেলে। আমি তোমাকে যা বলেছিলাম—তাও আমার মনে আছে; বলেছিলাম—ওকে তুমি মিথ্যে তিরস্কার করছ গো—বৈষ্ণবী, ও তো এখানে ওই কথা ব'লে ডাকে না, ও কথা ও গেরস্ত বাড়ীতেই বলে, সেখানকার বউদের মেয়েদের মনের কথা ও বুঝতে পারে। এখানে ও অন্য কথা ব'লে ডাকে।

ব্রজ বলিল—হ্যাঁ। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এখানে তা হলে ও কি কথা বলে প্রভু? আপনি বলেছিলেন—এখানে যারা থাকে তাদের মনের কথা ও সব বুঝতে পারে গো। বুঝে দেখ তোমার মনের কথা, মিলিয়ে দেখ, মিলে যাবে। ও এখানে বলে—কৃষ্ণ কোথা হে! আমি চমকে উঠেছিলাম। আপনি বলেছিলেন—চমকালে কেন বৈষ্ণবী? সে দিন মিছে কথা বলেছিলাম আপনাকে। লজ্জায় সত্যি কথা বলতে পারি নি। আমার মনে হয়েছিল সে দিন—পাখী বলছে

বলছে—'খো-কা বেঁ-চে থাক্'! আপনি দেখতে পাননি আমার সে চমক।

বাবাজীর চোখ এড়াইয়া গিয়াছিল।

তিনি সে সময় এক দৃষ্টে দেখিতেছিলেন—দামাল দুলালকে। সুস্থ সবল কালো রঙের দামাল শিশু—মায়ের কোল হইতে নামিয়া—নাট মন্দিরের আঙিনায় হামা দিয়া ছুটিয়া বেড়াইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

ওই চমকিয়া ওঠা টুকুর সত্য গোপন করিবার জন্যই বৈষ্ণবী কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল—আঃ। ছেলে যেন দস্যি। নামবে, ধুলো ঘাটবে, মাটি খাবে। বাপরে, বাপরে!

হাসিয়া বাবাজী বলিয়াছিলেন—এই তো সুরু বৈষ্ণবী।

—কি বললেন প্রভু? কথাটা যে বুঝলাম না।

—আগে ওকে ছেড়ে দাও; ও থাকবে না কোলে। মা—যশোদা—অনেক বাঁধন দিয়ে গোপালকে বাঁধতে চেয়ে ছিলেন। কিন্তু পারেন নি। দাও, ওকে খেলা করতে দাও।

ব্রজ দুলালকে নাটমন্দিরে নামাইয়া দিয়া বলিয়াছিল—নে তবে গোবিন্দের আঙিনায়-গড়াগড়ি দে, গোবিন্দ তোর সকল মন্দ দূর ক'রে দিন।

বাবাজী সস্নেহে বলিয়াছিলেন—নামটি বড় ভাল দিয়েছ—দুলাল। আমি কিন্তু একটু বদল ক'রে দোব। শুধু দুলাল নয় ব্রজ দুলাল।

ব্রজ লজ্জাও পাইয়াছিল, পুলকিতও হইয়াছিল।

বাবাজী বলিয়াছিলেন—কতদিন প্রত্যাশা করেছি—যে তুমি আসবে। কিন্তু এস নি। আজ আমি খুসি হয়েছি—তুমি এসেছ।

অপ্রস্তুত হইয়া ব্রজদাসী—বলিয়াছিল—আসা কি সহজ কথা প্রভু! পা—বাড়াই আর বাধা পড়ে।

—তা হ'লে তুমি বত্রিশ বন্ধনে বাঁধা পড়েছ!

বত্রিশ বন্ধন অর্থে সংসারের মায়ার বন্ধন; বত্রিশ নাড়ির বন্ধন।

হাসিয়াছিলেন বাবাজী—বলিয়াছিলেন—ভাল—ভাল। বন্ধন সত্য না—হ'লে মুক্তিও সত্য হয় না। রসে যখন মজতে হয় তখন রসগোল্লার মত ডুব দিয়ে মজাই ভাল।

তিনি উঠিয়া পড়িয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন—এখানেই থাক এ বেলা প্রসাদ পাও, ও বেলা গান শোনাবে, সন্ধ্যার পর তোমাকে লোক সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।

—কি বলব' বলেছিলেন যে।

—সেও বলব তখন।

প্রসাদ পাওয়ার পর বাবাজী তাহাকে বলিলেন—রতন বুড়ো সম্পর্কে একটু সাবধানে থেকো!

—কেন? চমকিয়া উঠিল বৈষ্ণবী।—ও তো মানুষ খুব ভাল! লোকে বলে—আপনিও বললেন সেদিন—

বাধা দিয়া বাবাজী বললেন—সে কথাও মিথ্যা নয় এ কথাও মিথ্যে নয়। মধ্যে মধ্যে ও পাগল হয়। সত্যি সত্যিই পাগল হয়। তাই সাবধান হ'তে বলছি।

—পাগল হয়?

—হ্যাঁ। তখন ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। আগে পাগলামী উঠলে ঘর ছেড়ে চলে যেত। ঘুরত নিরুদ্দেশ হয়ে। ওটা ওর সাধন যোগ। কিন্তু যোগে শেষ পর্য্যন্ত থাকতে পারত না—খুব অসুখে পড়ত—তার পর ভাল হলেই পালিয়ে আসত। আবার পালাত বছর কয়েক পরে। এখন—

একে-বারেই পাগল হয়ে যায়, ঘর থেকে পালায় না, বাড়ীর সকলকে ঘর থেকে দূর করে দেয়। বলে—সকলকে ছেড়ে বনে পালানোর চেয়ে সবাইকে দূর ক'রে দিয়ে ঘরকেই বন বানিয়ে নাও।

স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ-পৌত্র—সব তখন পালায়। নইলে দা' নিয়ে কাটতে যায়।

—দা' নিয়ে কাটতে যায়?

—হ্যা। বলে ঘর ছেড়ে পথে বেরুতে হবে কেন, তোরা দূর হলেই ঘরই আমার পথ হবে। কখনও কখনও বলে—হ্যাঁ, থাকতে দিতে পারি—কিন্তু এক জনকে কাটতে দিতে হবে। মায়ের কাছে বলিদান দোব। একবার একটা নাতিকে কাটতে নিয়ে গিয়েছিল। শেষে লোক-জনে ধ'রে বেঁধে রাখে—তবে রক্ষা।

—কিন্তু আমাকে—

—হ্যাঁ। তোমাকে নিয়েও যদি পড়ে সেই ভেবে বলছি তোমাকে ভালবাসে—ওই তোমাকে বসবাস করিয়েছে। তোমাকে নিয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। তন্ত্র নিয়ে সাধনার ওই বিপদ!

—তবে? তা'হলে আমি কি করব?

অন্যত্র আশ্রম বাঁধ। বল তো আমি চেষ্টা করি। একটু ভাবিয়া বলিলেন—মহেশকে তো দেখেছ। লোকটি সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থ। ও একটি আখড়া করতে চায়-গ্রামে—

কথার মধ্য স্থলেই ব্রজদাসী বাধা দিয়ে বলিয়া উঠিল—না।

তাহার কণ্ঠস্বরে একটু চকিত হইয়া বাবাজী বলিলেন—তুমি রাগ করলে? রাগ করবার কথা তো বলি নি।

ব্রজদাসী অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না-না। রাগ নয়. মোড়ল কি আপনাকে ওই কথা বলেছে না কি?

—আখড়া করে প্রভুর সেবা প্রতিষ্ঠার সাধ ওর অনেক দি ভবে মধ্যে মধ্যে বলে।

—সে কথা নয়। আমি বলছি আমার কথা।

—তোমার কথা ও কেন বলবে। আমি বলছি সব দিক ভেবে।

ব্রজদাসী হাত জোড় করিয়া বলিল—তা'র চেয়ে আপনার এই আশ্রমে আমাদের মা-বেটাকে একটু ঠাঁই দিন ন।

বাবাজী চুপ করিয়া রহিলেন। উত্তর দিলেন না।

—প্রভু! ব্রজদাসী আবার তাঁহাকে ডাকিল।

—না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বৈষ্ণবী বলিল,—আমার কি কোন অপরাধ আছে প্রভু?

—তা' খানিকটা আছে বই কি! তোমার রূপ আছে ব্রজ!

বৈষ্ণবীর মুখ লাল হইয়া উঠিল! ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ও কথা আমাকে শুনতে নাই প্রভু, আমার পাপ হয়। গোপাল আমার কোলে।

—শুনতে চাইলে ব'লে বললাম। মিথ্যে বলারও তো পাপ আছে!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বৈষ্ণবী বলিল—আমি উঠব প্রভু!

—উঠবে? ভয় পেলে? হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বললেন—না, সে ভয় করো না। সব কথা তো বলতে পারলাম না। বললে বুঝতে।

বৈষ্ণবী উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাবাজী বললেন—বস'। আর একটা কথা বলব! প্রভুর নাম নিয়ে বল্‌ছি—ভয় নাই তোমার!

বৈষ্ণবী বসিল না, দাঁড়াইয়াই বলিল—বলুন, কি বলবেন।

একে-বারে...জী বলিলেন—মন্ত্র বদল—ইষ্ট বদল বড় কঠিন বৈষ্ণবী। তুমি থেকে ...ও পার নাই।

সব ... চমকিয়া উঠিল বৈষ্ণবী। স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

বাবাজী বলিয়াই গেলেন—রামপ্রসাদের গানটি বড় ভাল—মা হওয়া কি মুখের কথা?

ব্রজ এবার বসিয়া।—কেন? এ কথা বল্‌ছেন কেন?

বাবাজী বলিলেন—বুঝে দেখ।

ব্রজ একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বাবাজী বলিলেন—তুমি যে ভাবের ব্রজে যাবার মন করেছ—সে ভাবের ঘোরে যদি ভোর হ'তে পারতে—তবে যে পৃথিবীর সব তোমার কাছে ওই তোমার দুলালটি হয়ে যেত গো। তা হ'লে কি রূপের কথায় তুমি লজ্জা পেতে? আমি যুগল ভাবের ভাবী, আমি যদি ওই ভাবে ভোর হতে পারতাম—তবে কি তোমার রূপকে ভয় করতাম। ওরই মধ্যে যে আমি তাঁকেই পেতাম গো। শ্রীমতী আমার শ্যামকে ভালবেসে জগৎ দেখেছিলেন শ্যামরূপে ময়-ময়। তমালকে দেখে শ্যাম ব'লে জড়িয়ে ধরতেন। সেই তো প্রেম—সেই তো পাওয়া।

ব্রজ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। এই পাওয়ার কথায় তাহার মন উদাস হইয়া উঠিল। মনে মনে অনেকদিন পর প্রশ্ন জাগিল—এ কি করিল সে? এ কোন মায়ায় আবদ্ধ হইয়া কোথায় চলিয়াছে? মনে পড়িল বৃন্দাবন যাত্রার সঙ্কল্পের কথা তাহার ইচ্ছা হইল এই মুহূর্ত্তে বাবাজীকে সব কথা খুলিয়া বলিয়া প্রশ্ন করে-এ আমি কি করলাম? কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই—বাবাজী বলিলেন—রতন বুড়ো যত দিন সুস্থ আছে তত দিন কেমন থাক ওখানে। ভালো লোক পুণ্যও আছে। তবে যদি বোঝ'—কেমন ভাবগতিক—তুমি চলে যেয়ো।

—কোথা যাব ?

—সে তো বলা মুস্কিল। আচ্ছা, তখন এখানে এস—আমি ভেবে রাখব কিছু।

*　　*　　*

ব্রজ আজ বারবার আক্ষেপ করিয়া বলিল—আঃ! আমি যদি সে দিন সব কথা আপনাকে বলতাম প্রভু।

বাবাজী বলিলেন—আমি সব জানতাম ব্রজ।

—জানতেন ? ব্রজ থমকিয়া উঠিল।

—জানতাম! দুলালের জন্ম কথাও জানতাম, আবার দুলালের কর্ম্মও যে এমন হবে—তাও যেন বুঝতে পেরেছিলাম। হ্যাঁ ব্রজ বুঝতে পেরেছিলাম।

তবে ? তবে কেন সেদিন আমাকে সাবধান করেন নি প্রভু!

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বাবাজী বলিলেন—বলিনি। বলতে পারি নি!

ব্রজ বলিল বাগ্দীদের আশ্রয় যে দিন ছেড়ে এলাম—সে দিন রতন আমায় বলেছিল।

(৬)

বৎসর পাঁচেক পর ব্রজদাসী বাগ্দী পাড়া পরিত্যাগ করিয়াছিল।

দুলাল তখন শৈশব পার হইয়াছে। বৎসর ছয়েক বয়স। রতন বাগ্দী পাগল হয় নাই, তাহার জন্য নয়, ওই দুলালের জন্যই বাগ্দীপাড়ায় থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। দুলালের বাল্য লীলার রূপ দেখিয়া সে শঙ্কিত হইয়া ছুটিয়া আসিল—বাবাজীর কাছে। ছয়

বৎসরের দুলালকে দেখিয়া মনে হয়—আট-দশ বৎসরের ছেলে। দুরন্ত-পনায় চীৎকার করিয়া ধূলা উড়াইয়া গোটা পাড়াটা মাতাইয়া বেড়ায়।

রাজ্যের ইট-পাথর কুড়াইয়া ঘরে আনে, ঠাকুর পাতে, পূজা করে; ফড়িং ধরিয়া বেড়ায়। কখনও কখনও চলিয়া যায় ও-পাড়ার লোহার বাগ্দীপাড়ার লোহাশালায়। হাপরের ফুঁয়ে আগুন জ্বল-জ্বল করে, লোহা গলে, লোহার উপর হাতুড়ী পড়ে, আগুনের ফুলকী ছোটে, দুলাল আহার-নিদ্রা ভুলিয়া দেখে। ছেলেকে কোথাও না পাইলে ব্রজ ওখানে যায়। বকিতে বকিতে আসে—বোষ্টমের ছেলে—কামার শালে—কি সুখ পাস? শেষে প্রভুকে ভুলে লোহা পিটবি? পৌষ মাঘ মাসে দুলাল সারাটা দিন পড়িয়া থাকে মাঠে। ওই বাগ্দী বুড়ীর সঙ্গে যায়, ধানের শিষ কুড়াইয়া আনিয়া জড়ো করে।

ব্রজ তাহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ধরিয়া আনে—গায়ের ধূলা মুছাইয়া দিয়া তিরস্কার করিয়া বলে—ধানে দরকার কি তোর? ধানে কি হবে? সুদে কারবার করবি? মহাজন হবি? হতভাগা কোথাকার?

দুলাল বলে—পালো খাব না? পিঠে খাব না?

ধান কুড়ানো বন্ধ হয়, ধানের সময় যায়, বর্ষায় আবার দুলাল ছুটিয়া মাঠে যায়—বাগ্দীদের ছেলেদের সঙ্গে বুড়ীর সঙ্গে মাঠের মাছ ধরিয়া বেড়ায়।

ব্রজ তাহাকে প্রহার করিতে সুরু করিল। দুলালের কর্কশ গলায় কান্নার চীৎকারে—পাড়াটা যেন অশান্ত অধীর হইয়া উঠিল।

ব্রজ তাহাকে অনেক বুঝাইল। হৃদয়ের ক্ষোভ বেদনা মিশাইয়া তিরস্কার করিয়া বুঝাইল—তোর কি মনে থাকে না তুই বৈষ্ণবের ছেলে, তুই কি তোর ভবিষ্যৎ ভাবিস না রে? তোর গতি কি হবে ভেবে তোর এতটুকু ভাবনা হয় না রে!

ছেলেটি ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে।

প্রথম-প্রথম তিরস্কারের সুরে আহত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিত। ক্রমে সেটা সহ্য হইয়া গেল। সে মুখ গোঁজ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। তার পর সে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে সুরু করিল।

হঠাৎ একদিন ব্রজর মনে হইল—ভূমিকম্প হইয়া সব ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল।

সে দিন দুলাল অশ্লীল ভাষায় গাল দিয়া উঠিল।

চমকিয়া উঠিল ব্রজ! পরক্ষণেই সে একটা বাখারি টানিয়া লইয়া বলিল—কি বললি?

দুলাল কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া বন্য জন্তুর মত স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্রজদাসীর ক্ষোভের আর সীমা রহিল না, সে বলিল—বলবি আর?

দুলাল আরও কয়েক পা পিছাইয়া গেল—দাঁত বাহির করিয়া হিংস্র ভঙ্গিতে বলিল—বলব। বলবই তো।

—বলবি? বোষ্টমের ছেলে হয়ে এই সব শিখছ তুমি?

—হ্যাঁ শিখছি। শিখবই তো!

ব্রজের আর সহ্য হইল না। সে ছুটিল। দুলালও ছুটিয়াছিল—গাল দিতে দিতেই ছুটিয়াছিল—বলব—বলব—বলছি— — —। কিন্তু বাড়ীর আগড়টা ছিল বন্ধ। আর ছোট পায়ে ছুটিয়া মায়ের সঙ্গে তাহার পারিয়া ওঠার কথাও নয়। তাহাকে ধরিয়া ব্রজ নিষ্ঠুর ক্রোধে ঘা-কতক বসাইয়া দিল। ছেলেটার জেদ চাপিয়াছিল—প্রহারের সঙ্গে সমানে গাল দিয়া চলিল, অশ্লীলতম গালাগাল—কুৎসিততম ভঙ্গি—পশুর মত কণ্ঠস্বর। ব্রজ সভয়ে হাতের লাঠি ফেলিয়া দিয়া পিছাইয়া আসিল। ছেলেটা মুহূর্তে দুরন্ত ক্রোধে একটা ঢেলা কুড়াইয়া লইয়া সজোরে ছুঁড়িয়া

মারিল। শিশুর লক্ষ্য—তাই রক্ষা, বুকে মুখে বা পেটে লাগিলে কঠিন আঘাত পাইত ব্রজদাসী, কিন্তু ঢেলাটা আসিয়া লাগিল কাঁধের নীচে হাতে। মনে হইল—হাতখানা যেন অসাড় হইয়া গেল।

দুলাল এবার বেড়ার একটা ফাঁক দিয়া, বোধ হয়, সর্ব্বাঙ্গ ছিঁড়িয়াই বাহির হইয়া পলাইয়া গেল। ব্রজদাসী সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। সে যেন কাহারও অভিশাপ—এক মুহূর্ত্তে পাথর হইয়া গেল।

* * *

সে বাঁধিল না, বাড়িল না। ভাবিল। কাহার অপরাধ? কোন্ অপরাধে এমন ঘটিল?

অপরাধ কি উহার জন্মের? অপরাধ ব্রজর অদৃষ্টের? আর কি? আছে আরও একটা অপরাধ। এই পল্লীটির মধ্যে সে ঘর বাঁধিল কেন? ও-পাড়ার লোহার বাগ্দী-পাড়া এমন নয়। আরও বাগ্দী-পাড়া সে দেখিয়াছে—সেগুলিও এমন নয়। এখানকার অবস্থা ওই রতন পাগল এমনটা করিয়া তুলিয়াছে। তান্ত্রিক সাধুদের মুখের আগল নাই; তাহাদের কাছে শ্লীল-অশ্লীল নাই, তাহারা এই ভাবে কদর্য কুৎসিৎ গালাগাল করিয়া থাকে। ব্রজ শুনিয়াছে—পঙ্ক চন্দনে তাহাদের কাছে কোন প্রভেদ নাই। আলো-অন্ধকার,—পঙ্ক-চন্দন—হীরক-অঙ্গার—কাঞ্চন-বিষ্ঠা সব তাহাদের কাছে এক—এমন কি জীবন এবং মৃত্যু দুইকে তাহারা এক করিয়া ফেলিয়াছে। কেহ করে ঘৃণা, কেহ করে পূজা, তাহারা ভ্রূক্ষেপ করে না। হয়তো তাহারা পাগল—সত্য সত্যই পাগল—অথবা তাহারা পাগল নয়, আর কিছু। তবে তাহাদের আচরণ সংসারীর পক্ষে বিষম। ওই অর্দ্ধ তান্ত্রিক—সাধনা ছাড়িয়া ঘরে আসিয়া সেই বিষ ছড়াইয়া দিয়েছে গোটা পাড়ায়। সে ভ্রূক্ষেপহীন হইয়া এই সব অশ্লীল গালি-গালাজ ব্যবহার করে। তাহার ফলে

গোটা পাড়াটার মনে ঘঁাটা পড়িয়া গিয়াছে। পাখীর লজ্জা পাইবার দল—বুলির মত শুনিয়া শুনিয়া এই সব শিখিয়াছে। দুলালও তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া।

অনেক ভাবিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল—মানগোবিন্দপুরের পথে২ মনে পড়িল—বাবাজী তাহাকে বলিয়াছিলেন—তখন এখানে এস।

বাবাজীর সম্মুখে বসিয়াছিল অল্পবয়সী একটি ছেলে। মোটা চটের মত কাপড় পরনে, গায়েও তেমনি জামা। চোখ দু'টি ছোট, কিন্তু প্রখর দৃষ্টি তাহাতে। ঘন ভ্রূ এবং কপালের কুঞ্চন-রেখার সারিতে মিলিয়া কেমন যেন বৈশাখ-অপরাহ্ণের পশ্চিম দিগন্তের মেঘের ছায়ার মত ছায়া ফেলিয়াছে তাহার তরুণ মুখশ্রীর উপর; বৈষ্ণবী একটু থমকিয়া গেল।

বাবাজী প্রসন্ন মুখে বৈষ্ণবীকে বলিলেন—এস—এস।

বৈষ্ণবী প্রণাম করিল।

বাবাজী বলিলেন—বস তুমি। বিশ্রাম কর। এখন আমি একটু ব্যস্ত রয়েছি।

ব্রজ আসিয়া নাটমন্দিরে বসিল। বিগ্রহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—সুমতি দাও, তুমি আমার দুলালকে সুমতি দাও। তাকে দয়া কর। তার জন্মের পাপ কৃমিকীটের মত তাকে ডুবিয়ে রেখেছ—তুমি তাকে উদ্ধার কর!

চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতে সুরু করিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া সে আবার উঠিয়া সসঙ্কোচে বাবাজীর ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। দেখিল একাই বাবাজী বসিয়া আছেন। ছেলেটি কখন চলিয়া গিয়াছে।

বাবাজী তাঁহার সযত্ন বিন্যস্ত চুলে আঙুল চালাইতেছিলেন এবং গুন-গুন করিয়া গান গাহিতেছিলেন। মৃদু হইলেও ব্রজদাসীর বুঝিতে কষ্ট

ধারিল। শি...বলী তো তাহার অজানা নয়, সুর শুনিয়া ঠোঁট নড়া
আঘাত পা... বাবাজী গাহিতেছেন—
হতে।   "আজু কে গো মুরলী বাজায়?
এতো কভু নহে শ্যাম রায়!

গানের তালের মাথায় ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—বস।

গান শেষ করিয়া বলিলেন—গান গাইছিলাম। হাসিলেন।

বৈষ্ণবী হাসিল না। হাসি আসিল না।

বাবাজী বলিলেন—তুমি খুব উৎকণ্ঠিত। জোরে পথ হেঁটে এসেছ—হাঁপাচ্ছিলে—এখনও দেখছি মুখ অপ্রসন্ন। কি হয়েছে বল তো? দুলাল ভাল আছে? তাকে অনেক দিন দেখিনি।

বৈষ্ণবীর চোখ দুইটার ভিতরে কাজল দিঘীর মোহনা ভাঙ্গিয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে বহু কষ্টে সে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া বলিল—বলুন আমি কি করব?

বাবাজী দীর্ঘক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণবী অধীর হইয়া তাঁহাকে ডাকিল—প্রভু!

—হ্যাঁ। কি বলছিলে—বেন? অপরাধীর মত হাসিয়া বলিলেন—আজ আমার মনটা একটু চঞ্চল আছে! ওই যে ছেলেটিকে দেখলে না? ওটি আমারই ছেলে। স্বদেশী করছে আজকাল ভদ্র-ঘরের ছেলেরা—শুনেছ তো? ও তাই করে। আগে দু'বার জেলে গিয়েছে। একবার জেল—একবার এমনি আটক ক'রে রেখেছিল। —এবার আবার না কি খুব বড় একটা স্বদেশী মাতন আসছে। আমার কাছে এসেছিল দেখা করতে। বলে গেল—। একটু চুপ করে থেকে চুলে আঙুল চালিয়ে বললেন—এবার না কি গুলী-গোলা চলবে। তাতে যদি মারা যায় তবে

বৈষ্ণবী শিহরিয়া উঠিল, তাহার চোখের জল যেন লজ্জা পাইল। সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বলিল—তবে আজ আমি যাই।

—না। বস, ওর পথে ও চলে—আমার পথে আমি চলি। যে সময়টুকু মুখোমুখি দেখা হ'ল—থেমেছিলাম। ও চলে গেল। আমারই বা বসে থাকলে চলবে কেন?

ব্রজ মাটির দিকে চাহিয়া মেঝের উপর নখের দাগ কাটিতে কাটিতে বলিল—আপনি বলেছিলেন—যদি কখনও ওখানে থাকতে না পার, তবে আমার এখানে এস। এখানে ইস্কুল আছে—আমি ওকে ইস্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দোব।

বাবাজী বলিলেন—আরও অনেক কথা বলেছিলাম ব্রজ। বলেছিলাম—তোমার রূপ আছে! আমার ভাবে, এখনও নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারি নি বৈষ্ণবী।

ব্রজ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিল—মোড়ল তার গাঁয়ে আশ্রম করতে চেয়েছিল বলেছিলেন।

—ভাল। দিন কয়েক পরে খবর দোব। তুমি এস না। আমি পাঠাব খবর।

* * *

খবর আসিল। দিন কয়েক প্রায় মাস খানেক হইয়া গেল। ব্রজ অধীর হইয়া উঠিয়াছিল!

দুলাল ইতিমধ্যে এক দিন একটা শালিকের বাচ্চা ধরিয়া বলিদান করিয়া রক্তের ফোঁটা কপালে পরিয়া নাচিতে নাচিতে ঘরে ফিরিল। ব্রজ শিহরিয়া উঠিয়া নিজেরই কপালে ঘা-মারিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

রতন আসিয়া বলিল—কাঁদিস কেন অনবুঝ মেয়ে! ওকে আমি আমার চেলা করব। আমই তো বললাম ওকে—দে মায়ের নাম ক'রে

কেটে। পিদীম জ্বললেই জ্বালা—নিভলেই ঠাণ্ডা। শালিক ছানাটার ডানা ভেঙেছে—সে ওটাকে কেটে।...পাখাই যখন ভেঙেছে—তখন পাখী জন্মে কাজ কি ওর। তা জন্ম তারা বলে দিব্যি কেটে দিলে। ওকে আমি চেলা করব।

ব্রজ বলিল—না! তার চেয়ে ও মরে যাক, মরে যাক্,।

—মরে যাক! চীৎকার করিয়া উঠিল রতন।

—হ্যাঁ! হ্যাঁ! হ্যাঁ!

পাগল রতন, যে পাগল রতন সেও ব্রজদাসীর সে মূর্ত্তি দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। ব্রজ বলিল-খুব-খুব শাস্তি হল আমার তোমার আশ্রয়ে থেকে। আমি চলে যাব বাবা—আমি চলে যাব।

পাগল অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল তারপর আপন মনে বকিতে বকিতে চলিয়া গেল।

ব্রজ গুম হইয়া বসিয়া রহিল। দুলালের শাস্তিটা আজ কঠোর হইয়াছিল, ব্রজদাসী জীব হত্যার অপারাধ সহ্য করিতে পারে নাই। রক্তাক্ত হত্যার নৃশংসতা তাহার দৃষ্টিকে আতঙ্কিত করিয়া তাহাকে যেন দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারই ক্ষোভে সে দুলালকে প্রহার করিয়াছিল, তাহাতেও তাহার ক্ষোভ প্রশমিত হয় নাই, তখন সে নিজের কপালে ঘা মারিয়াছিল। দুলাল দুর্দ্দান্ত, সে ব্রজদাসীকে অমান্য করিতে শিখিয়াছে, সেও হতভম্ভ হইয়া কাঁদিতেছিল।

কিছুক্ষণ পর সে হঠাৎ উঠিয়া পড়িল—কর্কশ কণ্ঠে কদর্য চীৎকার করিয়া বলিল—বেশ ক'রব। খুব করব। করবই তো। কাটব, আমি কাটব, আরও কাটব। ছুটিয়া সে পলাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর কাহার বাড়ী হইতে একটা জ্বলন্ত কাঠি লইয়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া —হিংস্র পশুর মত গর্জ্জাইয়া উঠিল—আগুন লাগিয়ে দোব।

ব্রজ একটি কথাও আর বলিল না। দেয় দিক। আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যাক ঘর সংসার, সব—সব! মুক্তি হোক তার।

দীর্ঘকাল পরে তার মনে পড়িল—বৃন্দাবনের পথ।

কথা বলিতে গিয়া ব্রজদাসী আজ আবার কাঁদিয়া আকুল হইল। বাবাজী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সান্ত্বনা দিলেন না, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন না, উদাস দৃষ্টিতে শান্ত প্রৌঢ়ত্ব রূপময়ী হেমন্তের প্রান্তরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর বলিলেন—আমারই ভুল। তুমি আমায় বলে গেলে। আমি তোমাকে বলতে পারলাম না, ব্রজ আমি জানি—দুলালের জন্য কথা, কর্ম্ম যা হবে তাও, বুঝতে পারছি, তুমি আর মায়ায় জড়িয়ো না। তুমি পথ ধর! তার পরিবর্ত্তে—আমার ভুলের বোঝা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলাম—মহেশকে ব'লে—গোপালের আখড়া প্রতিষ্ঠা করে তোমাকে—একবন্ধন থেকে বের ক'রে এনে নতুন বন্ধনে বেঁধে দিলাম।

সত্য কথা। সেই দিনই সন্ধ্যায় বাবাজী নিজেই আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন।

* * *

বাবাজী একা নয়, সঙ্গে মহেশ মণ্ডল এবং আরও দুইজন স্থানীয় আখড়ার মহান্ত।

রাত্রির অন্ধকারে বন্যায়—ভাসিয়া-যাওয়া মানুষের চোখের সামনে শুধু সূর্য্যোদয়ই হইল না—সঙ্গে সঙ্গে যেন পায়ের তলায় মাটির স্পর্শ পাইল; সে মাটিতে দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম জানাইয়া গদগদ চিত্তে প্রভুকে জানাইল—তোমার অসীম দয়া, অকূলে—তুমি

কুল দিলে, অরণ্যে তুমি পথ দিলে। জয় গোবিন্দ, জয় গোবিন্দ, জয় গোবিন্দ!

তাহারই মনের কথার প্রতিধ্বনি—তুলিয়াই যেন বাবাজী বলিলেন —জয় গোপাল।

জয় গোবিন্দ! তোমার দরবারে যে এলাম বৈষ্ণবা। প্রভুর আদেশ নিয়ে এসেছি।

—আসুন প্রভু! আসুন! ব্যস্ত হইয়া উঠিল ব্রজদাসী!

বাবাজী হাসিয়া বলিল—তুমি ব্যস্ত হয়ো না। অভ্যর্থনা তোমাকে করতে হবে না। আমরাই তোমাকে বরণ করতে এসেছি।

অবাক হইয়া গেল ব্রজ।

বাবাজী বলিলেন—আমি স্বপ্ন দেখেছি—কয়েক দিনই দেখেছি যে আমি নাড়ুগোপাল বিগ্রহ সেবা প্রতিষ্ঠা করছি। আয়োজনও করছিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল, নাড়ুগোপালের সেবা—এ কি আমার দ্বারা চলবে? এ সেবা চালাতে হলে গোপাল-ভাবের ভাবিকা চাই—সেবিকা চাই। বুঝেছ; আর আমার আখড়ার মধ্যেও ভাবগ্রাহী আর ভাবিকায় আলাপ ঠিক নির্বিঘ্ন হবে না। তা'—মহেশ বললে—ওর সাধ এ ভার ও নেয়, আখড়াটি নিজের গ্রামে প্রতিষ্ঠা করে। আমি বললাম—ভাল কথা, আমার স্বপ্নের সাধ পূর্ণ হলেই হ'ল। সবই ঠিক। এখন তোমার কাছে এসেছি আমি—এ গোপাল সেবার ভার তোমাকে নিতে হবে। আমি তোমাকে বরণ করতে এসেছি!

ব্রজ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অজস্র ধারায় কাঁদিল। এ কি অভাবনীয় সৌভাগ্য তাহার! আর ভাবনা নাই। বাবাজী তাহার জীবনে মঙ্গলময়ের মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহার সকল দুশ্চিন্তা ঘুচাইয়া দিয়াছেন। আখড়ার পূজা-অর্চনা উৎসব-অচার-আচরণের মধ্যে দুলাল

রেশম-কীটের মত পাকে পাকে জড়াইয়া পড়িবে, তার পর এক দিন সে বাহির হইবে ব্রজদাসীর কল্পনার রঙে রঙীন বিচিত্রিত পাখা লইয়া। হঠাৎ তাহার বুকখানা ধড়াস করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এত সমাদর! ইহার অর্থ লইয়া মানুষ কুৎসিৎ কথা বলিবে না তো? সে তো জানে! সে তো জানে—তাহার আড়ালে মানুষ—গোপালের জন্য তাহাকে কলঙ্ক দেয়!

গোটা বাগ্দীপাড়াটা কাঁদিয়া আকুল হইল।

শুধু রতন বুড়া হা-হা করিয়া হাসিল। বুড়া সেই দিন হইতে ব্রজদাসীর বাড়ীতে আসে নাই। শুধু তাই নয়, বুড়ার ভাবভঙ্গিও কেমন যেন হইয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই হাতের বুড়া আঙ্গুল দেখাইয়া চীৎকার করে— কচু-কচু-আমার কচুটা!

বাড়ীর লোক—পাড়ার লোক—সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ব্রজকে সাবধান করিয়া গিয়াছে বাগ্দী বুড়ী—বলিয়া গিয়াছে—ক্ষেপবে মনে লাগছে মা। সাবধান হবা যেন!

বিদায় লইতে গিয়া ব্রজদাসী তাকে হাত জোড় করিয়া প্রণাম জানাইয়া বলিল—কন্যের আদরে রেখেছিলেন বাবা, আপনার ঋণ আমার শোধ হবার নয়। কিন্তু দেবতার ডাক এসেছে—আমাকে যেতে হবে! আপনি যে—সে লোক নন—মহাজন, আপনি অনুমতি করুন।

রতন বুড়া গাঁজা খাইয়া ভাম হইয়া বসিয়াছিল। সে লাল চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল কিছুক্ষণ, তারপর —হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল—বলিল—কচু-কচু-আমার কচুটা।

তারপর বলিল—পালাচ্ছিস। তা—[illegible] ক'রে পালিয়ে যা না কেন? তেঁতুল গাছ ফেলে পালা। তেঁতুল বীচিতে গাছ, টকো ফলে

কুল, বাতাসে চর্ম্মরোগ। পালাবি তো ফেলে পালা! যাবি তো ব্রজে যা। বুঝলি। নইলে মরবি। ছেলেটাকে দিয়ে যা—ওকে আমি ভাতে সেদ্ধ ক'রে খেয়ে দেব!

তারপর চীৎকার করিয়া উঠিল—আবোল তাবোল চীৎকার—

জয় তারা—জয় তারা, ঘুরিয়ে দে মা খাঁড়া। দে—সব-রক্তে ভাসিয়ে দে। কেটে কুটে দে। ভাত মাস দে মা! গাঁজা দে মা।

ব্রজর দিকে চাহিয়া আবার বলিল—পালা—পালা ছুটে পালা।

ম্লান হাসিয়া ব্রজ সরিয়া আসিল।

পাগলের জন্য বেদনার আবধি ছিল না তাহার। শুধু পাগলের জন্যই নয়। বাগ্দীপাড়ার মমতাও কম নয়। বাগ্দী বুড়া কাঁদিয়া সারা হইল।

বাগ্দী-পাড়ার এ মমতা—এ যে বত্রিশ নাড়ীতে জড়াইয়া গিয়াছে। ছিঁড়িতে যে সমস্ত টনটন করিতেছে! এত ভালবাসা—এত যত্ন—এ ফেলিয়া যাইবে কেমন করিয়া! অকৃতজ্ঞ—সে অকৃতজ্ঞ!

(চ)

অকৃতজ্ঞতার অপরাধও সে মাথা পাতিয়া লইল; মনে মনে বলিল—তুমি তো অন্তর্যামী, কিছুই তো তোমার অগোচর নাই। আমাকে তুমি ক্ষমা করো। না-হয় সাজাই দিয়ো। শুধু এইটুকু করো—সে সাজার এতটুকু আঁচ যেন দুলালকে স্পর্শ না করে। তোমার চরণে তার মুক্তি হোক—তার জন্মের অপরাধের খণ্ডন হোক—সেই মুক্তির পুণ্যে। দুলাল আমার সব কিছুর উপরে।

দুলাল তাহার সব কিছুর উপরে। কৃতজ্ঞতা অকৃতজ্ঞতা, পাপ-পুণ্য

কলঙ্ক-প্রশংসা সব কিছুর উপরে। অকৃতজ্ঞতার অপরাধের বেদনা অন্তরে বহিয়া—চোখের জল মুছিতে মুছিতে নূতন আখড়ায় আসিয়া উঠিতেই লোকে তাহাকে মাথায় কলঙ্কের কালো জলে স্নান করাইয়া দিল। যে কলঙ্কের কথা লোকে তাহার আড়ালে বলিত—সে কলঙ্ক সে নিজেই একদা সকলের সমক্ষে বলিয়াছিল। সে-দিন ভাবে নাই ওই মিথ্যা কলঙ্ক যেদিন পরে ফিরাইয়া দিবে—সেদিন আর তাহার সহ্য করিবার শক্তি থাকিবে না।

ব্রজদাসী আক্ষেপের হাসির সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তাও সহ্য করলাম—ওই—দুলালের মুখ চেয়ে। আখড়ায় এসে উঠলাম, আখড়াটি দেখে মন একেবারে ভরে উঠল। চোখ জুড়িয়ে গেল। আজ ষোল বছর হয়ে গেল—কিন্তু সে দিনের আখড়ার সেই ছবি আমার চোখে ভাসছে আজও। মণ্ডলকে সেদিন মনে মনে বলেছিলাম—তোমার সব পাপ খণ্ডন করলে তুমি—প্রভু যেন তোমাকে মার্জ্জনা করেন।

সুন্দর আখড়াটি। পরিপাটি করিয়া গড়া হইয়াছে। বাঁধানো মেঝে মাটির ঘর, আটপলা কাঠের খুঁটি দেওয়া বাঁধানো পিড়ে। বাঁধানো উঠান। আখড়ার ধারেই একটি নালা—শাখা-নদী ডাহুকীর প্রশাখা। আখড়া হইতে খালে নামিবার ঘাটটি পর্য্যন্ত ছোট্ট কয়েকটি পাকা সিঁড়ি এবং অল্প একটু চাতাল করিয়া বাঁধানো। নাড়ুগোপালের ঘরখানি আড়ে-দীর্ঘে চার হাত-চার হাত, সামনে তিন দিকে তিন টুকরা বারান্দা। সামনের বারান্দাটুকুতে তিনটি থামে দুইটি খিলান। চারি পাশের এক দিকে নালা—বাকী তিন দিকে পুরানো বাগান। কাঁটাল, শিরীষ এবং আমের গাছ। আর জন্মিয়াছে বন্য বাবলা গাছ।

আখড়ার চারি দিকে ঘন করিয়া কাঞ্চন গাছের চারা লাগানো হইয়াছে গাছের ডাল।

গ্রামখানিও নেহাৎ ছোট নয়। দোকান-দানিও কয়েক খানা আছে। পাঠশালা আছে। গ্রামের যে সব ছেলেগুলি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তাহাদের দেখিয়া ব্রজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। পরিচ্ছন্ন বেশভূষা, মিষ্ট চেহারা—ভারী ভাল লাগিল ব্রজর। গোপালের বাল্যভোগ দিয়া প্রসাদ লইয়া সে বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিল—এস আমার গোপালের সখারা সব। শ্রীদাম-সুদাম-দাম-বসুদাম! আমার সুবল কোন্‌টি হবে গো? সব চেয়ে সুন্দর কে গো?

প্রতিটি ছেলের মুখে যে হাসি ফুটিয়া উঠিল—তাহার শ্রীতে তাহার দৃষ্টি জুড়াইল গেল—মন অনাবিল প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল; মনে মনে সে বাবাজীকে সহস্র প্রণাম জানাইল—গোবিন্দকে নিবেদন করিল—যিনি দুঃখিনীর দুলালের জন্য এত করিলেন—তোমার কৃপা যেন তাঁহার উপর অজস্র ধারায় ঢালিয়া দিও। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল বাগ্‌দীপাড়ার ছেলে-দের। মনে পড়তেই লজ্জা অনুভব করিল সে। মনে হইল—এ মুক্তি সে লাভ করিল একটা অপরাধের মূল্যে; তাহাদের সাহচর্য্য হইতে দুলালকে সরাইয়া আনিয়া দুলালের জীবনের পথ সে পরিসর করিল; কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ হইতে রাজপথে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল, কিন্তু যাহারা এত দিন ওই বন্ধুর পথে দুলালের হাত ধরিয়া চলিয়াছিল—তাহাদের সম্মুখের অন্ধকারের কথা তো ভাবিল না। চোখে তাই জল আসিল। বলিল—ওদের পথ ধরাইয়া দিবার দায়িত্ব বহন করিবার শক্তি যেন তুমি দুলালকে দিয়ো। ওই ভারটাই যেন জীবনে সে বহন করিতে পারে।

বাবাজী বসিয়াছিলেন কর্ম্মকর্ত্তার আসনে। আখড়ার ব্যয়ভার বহন

রিয়াছে মহেশ মণ্ডল, আখড়ার সেবার ভার গ্রহণ করিবে ব্রজদাসী কিন্তু আখড়াটি বাবাজীর মানগোবিন্দপুরের আখড়ারই অঙ্গ স্বরূপ। এমন আখড়া আরও কয়েকটি আছে। বৈষ্ণব মহান্ত কয়েকজন বাবাজীকে ঘিরিয়া বসিয়াছিলেন। হঠাৎ ব্রজদাসীর কানে গেল—রাধিকাপুরের মহান্ত—ছি—ছি করিয়া সারা হইয়া গেলেন।

সে চকিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সমবেত বৈষ্ণবেরা সকলেই রাধাগোবিন্দ স্মরণ করিয়া বলিল—রাধা গোবিন্দ, রাধা গোবিন্দ! হায়রে মানুষের রসনা! হায়রে অন্তরের কলুষ!

ব্রজদাসী সঙ্কোচ ভরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাবাজী সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া বলিলেন—এই যে ব্রজদাসী এসেছে! অবসর হ'ল তোমার? নাও—তা হ'লে বস—নাম কীর্ত্তন কর।

—হ্যাঁ। মিথ্যাকথা—খারাপ কথা—শোনাও পাপ। ভগবানের নামে খণ্ডন হোক। বসুন মা-জী!

ব্রজ কিন্তু জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিল না—কি হ'ল বাবা?

—কিছু না। সে তুমি—নাম ধর।

রাধিকাপুরের বাবাজী প্রবীণ কিন্তু খানিকটা পাগল মানুষ, তিনি বলিলেন—সংসারে তো জটিলে কুটিলেই বেশী মা-জী তাদের কথাই হচ্ছে গো! ফোঁটা কাটলেই বৈষ্ণব হয় না, তা হ'লে তো—নালা মাত্রেই নদী হ'ত। ইতর জনে নানা কথা বলছে।

—কি বলছে?

—সে আর শুনতে হবে না আপনাকে। দেখছেন না—মহান্তরা সবাই আসেন নি।

ব্রজদাসীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

—থাক বাবাজী ওসব কথা—

—থাকবে কেন? মা-জী সন্তান কোলে নিয়ে বসে প্রথম দিনই তো—

বাধা দিয়া নরোত্তম দাস বাবাজী বলিলেন—থাক ওসব কথা। শ্রীমতী কলঙ্ককে অঙ্গের ভূষণ করেছিলেন। কলঙ্কের লজ্জাতো তোমাকে ভয় দেখাতে পারেনি ব্রজ! আমি তো শুনেছি প্রথম দিনই তুমি বাগ্দীপাড়ায় নিজের মুখে কি বলেছিলে! নাও তুমি নাম আরম্ভ কর। আন, খোল আন। আমি খোল বাজাব।

গৌরচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বন্দনা করিয়া ব্রজ গান ধরিল—

"জয় ব্রজরাজ-কোঙর
গোকুল উদয় গিরি চান্দ উজোর!"

প্রাণ ঢালিয়া সে গান করিয়া গেল। বার বার ফিরাইয়া ফিরাইয়া গাহিল—কিন্তু তাহাতে স্বাদ ম্লান হইল না। গান শেষ করিয়া ব্রজ দেখিল—দুলাল মন্দিরের দুয়ারের পাশে দাওয়ার উপরটিতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নরোত্তম দাস বাবাজীকে একটা প্রণাম করিয়া বলিল—আপনার দয়ার ফল এরই মধ্যে ফলে গেল প্রভু, দুলাল আমার গোপালের দরজায় গড়িয়ে পড়েছে।

নরোত্তম দাস হাসিলেন। বলিলেন—তাই সত্যি হোক। প্রভু দয়া করুন। দুলালকে তুমি মনের মত ক'রে মানুষ ক'রে তোল। তোমার জীবনের দুঃখ—

ব্রজ অভিভূত হইয়া গিয়াছিল—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল—গোবিন্দের দয়া, আপনার আশীর্ব্বাদ, ওর অদৃষ্ট আর আমার—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমার যে কোন সম্বলই নাই।

—তোমার অনেক পুণ্য ব্রজ। যতখানি তোমার ওর ওপর ভালবাসা ততখানি পুণ্য। অফুরন্ত! অফুরন্ত!

—না। ছেলেকে কোন্ মা ভাল না-বাসে বলুন।

—যে কলঙ্ক তুমি স্বীকার ক'রে ওকে কোলে নিয়ে জগতের হাটে দাঁড়িয়েছ ব্রজ—সে তো মা হ'লেই মানুষে পারে না। তুমি যদি কলঙ্কের ভয়ে ওকে পথে ফেলে দিতে—

ব্রজ শিহরিয়া উঠিল। তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল কৃষ্ণা একাদশীর রাত্রির শেষ প্রহরের শ্মশান। সে বলিল—না-না—সে কথা—মনে পড়াবেন না।

বাবাজী হাসিয়া বলিলেন—তাই তো কলঙ্ক তোমার ফুল হয়ে ফুটল। আজও মানুষের কলঙ্ক দেবার চেষ্টার বিরাম নাই। কিন্তু সে তো তোমাকে স্পর্শ করলে না।

—আজও কলঙ্ক দিচ্ছে!

—দিচ্ছে বৈকি। বাবাজী হাসিলেন—এবার আমাকেও রেহাই দেয় নি। বলেছে—এমন আয়োজন ক'রে সমারোহ ক'রে ওই কলঙ্কিনীকে এনে যখন গোপালের আখড়া করেছে—তখন-ওই-ওই। অর্থাৎ আমি।

হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন নরোত্তম দাস। বলিলেন—আমি ধন্য হলাম। তোমার কলঙ্কের ভাগ পেয়েছি।

ব্রজ কাঁদিয়া ফেলিল।

বাবাজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন—তুমি কাঁদছ?

ব্রজ বলিল—আমার এ আখড়ায় কাজ নাই প্রভু! আমি বরং আপনার আখড়ায় দাসীর মত থাকব। আমার কলঙ্ক আমি সইতে পারি—কিন্তু ওই দুগ্ধপোষ্য শিশু ও যদি দুঃখ পায় লজ্জা পায়—

বাবাজী অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন।

ব্রজ চোখ মুছিয়া অবগেবে বলিল—গোবিন্দ দিলেন যে রসনা, যাতে নামের মধু ঝরে পড়ে—সেই রসনায় ওদের এত বিষ প্রভু!

এতক্ষণে বাবাজী হাসিলেন সহজ হাসি।—সে বিষেও তুমি জর্জর হয়ে ঢলে পড়নি, তাই তো তোমাকে এত স্নেহ করি! মনের মধ্যে যার বাঁশী বাজে, তার কালিদহের নাগকে ভয় কিসের? আচ্ছা চলি।

বৈষ্ণবী সমস্ত রাত্রিটা আজ আবার কাঁদিল। দুলালের মাথায় হাত বুলাইল। ছয় বছরের দুলালের আজও স্তন পানের তৃষ্ণা মেটে নাই। মধ্যে মধ্যে বৈষ্ণবীর চোখে কথাটা ভাবিয়া জল আসে। ওই অমৃত সে দুলালকে দিতে পারিল না। সুস্থ সবল ছেলে দুলাল—কিন্তু ওই অমৃত যদি বুক পুরিয়া সে তাহাকে পান করাইতে পারিত তবে রূপে—আকারে—শক্তিতে আরও কত সুন্দর হইয়া উঠিত, সে কথা সে জানে! সে ছবি সে আঁকে, আঁকিতে পারে।

* * *

ব্রজদাসী অকস্মাৎ অতীত কথায় ছেদ টানিয়া বলিল—কালিদহের নাগের বিষে অঙ্গ আমার একদিন জর জর হয়ে গেল—তাও আমি সহ্য করলাম। ওরই মুখ চেয়ে। ভস্মে আমার ঘিঢালা হ'ল। ওর মতি পালটাল না। মোড়লদের ছেলেরা পড়ত গাঁয়ের পাঠশালায়—দুলালকে ভর্তি করে দিয়েছিলাম, বছর খানেক পরে পণ্ডিত এসে বললে—মা-জী তোমার ছেলেকে পড়ানো আমার সাধ্য নয়। ওর যত বুদ্ধি তত দুষ্টুমী। দুপুর বেলা পাঠশালা থেকে পালাবে—গিয়ে উঠবে বাগ্দী পাড়ায় সেখানকার বুড়ীর সঙ্গে মাঠে মাঠে বেড়াবে।

বুড়ীর সহিত দুলালের একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আছে। ধানের শিষ কুড়াইবার সঙ্গী ছিল দু'জনে। দুলালের আঁচলে যখন আর শিষ ধরিবার জায়গা থাকিত না তখন শিষ কুড়াইয়া বুড়ীর ঝুড়িতে দিত দুলাল। মাছ

ধরিয়া সবই দিত বুড়ীকে। বুড়ীর ঘরে তখন হইতেই লুকাইয়া মাছ খাইয়া আসিত। বুড়ী অনর্গল বকিত, পাড়ার লোককে গালি-গালাজ করিত, ভগবানকে গাল দিত; দুলাল কখনও কোন প্রতিবাদ করে নাই। বরং প্রতি কথায় সায় দিয়াই চলিত। বুড়ী বলিত—ওই রতন—ও সর্ব্বনেশে পাগল ভয়ঙ্কর লোক!

দুলাল বলিত—ভারী দুষ্টু। যে চোখ।

বুড়ী মনের আক্ষেপে গাল দিত—ভগমান চোকখেকোর বিচার নাই।—

দুলাল বলিত—লাঠির বাড়ি মারতে হয়।

দুলাল এখনও মাছ ভাতের লোভে বুড়ীর বাড়ী যায়। বুড়ী লুকাইয়া মাছ ভাত খাওয়াইয়া তাহাকে পাঠশালার ছুটির আগে বাড়ী পাঠাইয়া দেয়।

রতন-বুড়ী পাড়ায় থাকিলে বুড়ীর কাছেই সারা ক্ষণটি বসিয়া থাকে। রতন বুড়া তাহাকে দেখিলে যেন ক্ষেপিয়া উঠে। চীৎকার করিয়া গালি-গালাজ করিয়া বলে—বেরো—বেরো—বেরো বলছি পাড়া থেকে। খবরদার এ পাড়া মাড়াবি না।

মধ্যে মধ্যে পাগলের মত বলে—তোকে কেটে ভাতে সেদ্ধ ক'রে খাব। বোষ্টমের মাংস কি না। সেদ্ধ করে আলুর মত খাব। মা তারার ভোগ লাগাব।

বুড়া পাড়ায় না-থাকিলে ছেলেদের সঙ্গে গুলি-দাঁড় খেলিয়া পাড়া মাতাইয়া তুলিয়া তবে ফেরে। ফিরিবার সময় চীৎকার করিয়া একে-চন্দ্র দুইয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র ঘোষিয়া নিজের বিদ্যা জাহির করিয়া ফেরে। ব্রজদাসী কোন কথা জানিতে পারে না।

বাড়ীতে সে শান্ত শিষ্ট।

মহেশ মণ্ডলের সঙ্গে বড় ভাব।

আখড়ায় এখন নিত্য সন্ধ্যায় নাম-গান হয়—গ্রামের মাতব্বরেরা আসেন। তামাক খান। গানের পর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাদের বিদ্যা বোধ মত শোনা ধর্ম্মের কাহিনী বলে। মহেশ মণ্ডল, মণ্ডল না থাকিলে পাঠশালার পণ্ডিত চরিতামৃত পাঠ করে।

মহেশ মণ্ডল পণ্ডিত নয়, কিন্তু এ গ্রামে সে সকলের চেয়ে ভাল লেখা-পড়া জানে। এমন শুভঙ্করীর হিসাব মুখে-মুখে কেউ করিতে পারে না। শুধু এ গ্রাম কেন—পাঁচখানা গ্রামে কেউ পারে না। দলিল, চেক রসিদ এ সব সে নির্ভুল দেখিয়া লইতে পারে। সব চেয়ে বড় কথা—লোকটি মিথ্যা বলে না। সকলেই এ কথা বলে। মহেশ হাসে। কিন্তু বৈষ্ণবীর আখড়ায় এ কথা বলিলে সে মাথা হেঁট করিয়া গভীর স্বরে যেন আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠে—গোবিন্দ! গোবিন্দ! দয়া কর প্রভু!

বৈষ্ণবী আর তাহাকে ব্যঙ্গ করে না, আর তাহাকে তীক্ষ্ণ কথা বলে না। মিষ্ট হাসিয়া বলে—গোবিন্দ তো তোমার উপর নিদয় নন মণ্ডল! মিছে দুঃখ কর কেন?

মহেশ আকাশের দিকে চাহিয়া বলে—জানি না মা-জী। তবে দুঃখ তো অনেক!

আজকাল সে বৈষ্ণবীকে মা-জী বলিতে সুরু করিয়াছে। ব্রজ তাহাতে খুসী হইয়াছে।

বৈষ্ণবী বলে—দুঃখ করো না। আজকের দুঃখ কালকে সুখ হ'য়ে ওঠে। কাঁটায় ভরা ডালের আগায় ফুল ফোটে। নাও, ও-সব কথা রেখে একবার ভাল ক'রে তামাক খাও। আর দুলালকে একটু পড়া দেখিয়ে দাও। দুঃখিনীর ছেলের যদি দু' কলম হয়—যদি শাস্ত্র পড়ে প্রভুর সন্ধান পায়—তবে তোমার তার আশীর্ব্বাদে সব দুঃখ ঘুচে যাবে। দুঃখীর আশীর্ব্বাদেই তো তাঁর ভাঁড়ারে টিপ্‌ কাটা যায় গো!

দুলাল পড়িতে গিয়া মণ্ডলের কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া প... তাহাকে ... কথা

মণ্ডল ডাকে—মা-জী। দুলালকে তোল। ঘুমিয়ে গেল।

—এই দেখ। ঘুম পাড়াতে তোমাকে বললাম বুঝি? বললাম—পড়াও খানিকটা—

—পড়বে। বয়স হলেই পড়বে।

—বয়স হলে পড়বে কি? এখনই তো পড়ছে। যা চেঁচিয়ে পড়তে পড়তে বাড়ী আসে! তুমি পড়া শুধাও না ওকে।

মনে মনে ব্রজদাসী সোণার মন্দির গড়িয়া তোলে—সেই গড়ার আনন্দের খানিকটা ঝলক তাহার মনের পাত্র উপচাইয়া গড়াইয়া পড়ে।

হঠাৎ পণ্ডিতের কথা শুনিয়া ব্রজদাসী চমকিয়া উঠে। মনে হয় একটা বজ্রাঘাত হইয়া গেল ওই মন্দিরের উপর।

দুলাল দুষ্ট, দুলাল পাঠশালা হইতে পলাইয়া গিয়া বাগ্দী পাড়ায় মাছ ভাত খাইতে যায়। এখনও পর্য্যন্ত প্রথম ভাগ তাহার শেষ হইলনা—হে গোবিন্দ!

পাঠশালার পণ্ডিত বলিল—আপনি ওকে মানগোবিন্দপুরের মাইনর স্কুলে ভর্তি ক'রে দেন।

* * *

অন্ধকারের মধ্যে আবার আলো দেখিতে পাইল ব্রজ! তাহার মন বলিল ভাল হইবে! ইহাতেই ভাল হইবে।

বাবাজীর আশ্রমের গ্রামেই মাইনর ইস্কুল! ওখানে ভর্তি হইলে অন্তত এক বেলা দুলাল বাবাজীর পায়ের ধুলা লইয়া আসিতে পারিবে। এ ছাড়া তাহার মায়ের মন প্রত্যাশাতেও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পাঠশালা হইতে মাইনর ইস্কুলে যাইবে দুলাল। আল-পথ হইতে মেটে গাড়ীর পথ পাইবে, সে পথ গিয়া আরও বড় পথে পড়িয়াছে।

আ[illegible]ার কল্পনা যেন আশ্বাসের জল সিঞ্চনে বীজ ফাটিয়ে অঙ্কুর—অঙ্কুর আ[illegible]ত সবুজ একটি ছোট চারা গাছ হইয়া উঠিল

মহেশ বলিল—না। দুলাল তোমার ঘরেই পড়ুক!

—কেন?

—না—বৈষ্ণবের ছেলে ও-সব লেখাপড়া শিখে করবে কি?

বৈষ্ণবী আর একটি কথা বলিল না। মহেশের উপর সমস্ত ভাল ধারণা এক মুহূর্তে চুরমার হইয়া গেল।

সে নিজেই দুলালকে সঙ্গে করিয়া একদিন রওনা হইল। প্রথমেই বাবাজীর আখড়ায় গিয়া উঠিল। মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দুলালকে লইয়া প্রণাম করিল। দুলালও খুব খুসী। জামা গায়ে দিয়াছে; একটি ছিটের কোট, পরনে একখানি নতুন কাপড়, তাহার উপর সখ করিয়া ব্রজ একখানি পাড়ওয়ালা ছোট চাদর গলায় জড়াইয়া দিয়াছে। মুখখানি ফুটফুট করিতেছে, মাথার চুল তেলে চকচক করিতেছে, কপালের উপর আঙুল দিয়া চুলের ডগাগুলি এক-মুখ করিয়া টানিয়া দিয়াছে, কপালের মাঝখানে পরাইয়া দিয়াছে গোপালের আঙিনার মাটি ও দইয়ের একটি ফোঁটা!

দেবতাকে প্রণাম করিয়া সে বাবাজীর কাছে গেল।

কিন্তু থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল।

বাবাজীর সামনে বসিয়া আছে বাবাজীর সেই ছেলে। ছেলেটি শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই মোটা কাপড়-জামা-চাদর পরনে, মাথার চুলগুলি রুক্ষ তামাটে, চোখে প্রখর দৃষ্টি, মোটা ভ্রূ ও কপালের কুঞ্চনে সেই কালবৈশাখীর মেঘের ছায়া—সে ছায়া যেন আরও ঘন হইয়া উঠিয়াছে। মৃদু অথচ কঠিন কথাবার্ত্তা চলিতেছে! তাহার দিকে চাহিয়া ছেলেটির দৃষ্টি যেন আরও কঠোর হইয়া উঠিল। সঙ্কোচ ভরে ব্রজ দুলালকে লইয়া

মন্দিরের সামনে আসিয়া থামিল। ছেলেটি রাগ করিয়াছে তাহাকে আসিতে দেখিয়া। তা' করিবে বই কি! নিজের বাপের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলিবার সময়ে ব্যাঘাত করিলে রাগ কার না হয়! তাও আজ বোধ হয় বৎসর দেড়েক পর বাপের কাছে আসিয়াছে ছেলে। গোবিন্দকে সে মনে মনে বার বার প্রণাম করিল। ছেলেটি গুলী খাইয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দেশের কাজ করিতে গিয়াছিল। এ লইয়া রাজার জাত সাহেবদের সঙ্গে হাঙ্গামা। শান্ত পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত কত খবর—কত জটলা—কত মজলিস। নুণ তৈরী, মদ খাওয়া বারণ, চরকা এই সব লইয়া শহরে বাজারে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। যাক, সেই 'মন্বন্তরা'র মধ্য হইতে সে যে বাঁচিয়া অক্ষত শরীর লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, বাবাজীর বুকে যে অগ্নিবাণ হানেন নাই বিধাতা, সে কেবল গোবিন্দের দয়া। বিধাতার বিধাতা যে তাহাদের গোবিন্দ!

বসিয়া থাকিতে দুলাল ঢুলিতেছিল। ওদিকে কথাবার্ত্তা যেন চড়া সুরে উঠিতেছে দেরীও অনেক হইয়া গেল! অবশেষে ব্রজ দুলালকে বলিল—দুলাল, এইখান থেকে প্রণাম কর বাবাজীকে। চল, ওদের দেরী আছে। আমরা বরং ইস্কুলে গিয়ে ততক্ষণে ভর্ত্তির কাজ সেরে আসি।

গোবিন্দকে স্মরণ করিয়া সে মাষ্টারের সামনে জোড় হাত করিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরেই বজ্রাহতের মত এক রকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া আসিল।

ভর্ত্তি করিতে গিয়া মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বাপের নাম?

স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল ব্রজ।

—ওর বাপের নাম কি! এই খোকা—তোমার বাবার নাম কি?

দুলাল বোকার মত একবার বলিয়াছিল—এঁ্যা?

—তোমার বাবার নাম কি ?

—জানি না।

—জানি না ? বাবার নাম নইলে ভর্ত্তি হবে কি করে ? বাবার নাম বলতে পার না ? তা'হলে তোমাকেই যে বলতে হবে।

ব্রজ মুহূর্ত্তে একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। দুলালের হাত ধরিয়া টানিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। রাস্তায় পড়িয়া এতবড় ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া গোটা বাজার পার হইয়া একটা গাছতলায় আসিয়া বসিয়া পড়িল।

দুলাল জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'ল মা ?

ব্রজ অঝোর ঝরে কাঁদিয়া আকুল হইল।

তাহার মনে হইল—কালীয় নাগের বিষে জীবন সমুদ্রে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এত বিষ, এত বিষ! সে দুলালকে বুকে চাপিয়া ধরিল। মনে হইল বুকটা জুড়াইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পর আসিয়া আবার উপস্থিত হইল বাবাজীর আখড়ায়। বাবাজী প্রবেশ-পথেই দাঁড়াইয়াছিলেন। বলিলেন—কোথায় গিয়েছিলে ? আমি তো ভেবেই পাই না।

ব্রজ আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

—কি হল ?

বহু কষ্টে ব্রজ ব্যাপারটা জানাইল। বাবাজী শান্ত বিষণ্ণ হাসি হাসিলেন, বলিলেন—আর একটু অপেক্ষা করতে পারলে না ? আমি তাহ'লে যেতে দিতাম না।

তার পর বলিলেন—কেঁদো না তুমি। করবে কি বল ? পৃথিবীর দেনাপাওনা—ও তো না-মিটিয়ে উপায় নাই।

ব্রজ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বাবাজী বলিলেন—বস।

তিনি চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া কয়েকখানি বাতাসা, কয়েক টুকরা শসা, নারিকেল, দুলালের হাতে দিয়া বলিলেন—খাও। তোমার মুখ শুকিয়েছে—বুঝতে পারছি ক্ষিদে পেয়েছে তোমার? ব্রজ—তুমি—

ব্রজ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—তবে কি আমার দুলাল পড়তে পাবে না? ওর পড়া হবে না?

—আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। আমি পড়াব ওকে।

দুলালের মহা ভাগ্য—পরম ভাগ্য। ভাঙা-গড়ার মধ্যে কি অপরূপ তাঁর লীলা—বৈষ্ণবী ভাবিয়া অভিভূত হইয়া গেল; ভাঙা ঘরের ভিতের উপরেই পত্তন করিয়া দিলেন সোনার কলস দেওয়া শ্রীমন্দিরের।

(নয়)

ব্রজ থামিল। কাহিনী তাহার ফুরাইয়া আসিয়াছে। নীরবে সে অনেকক্ষণ ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিল। তার পর দিন বলিল—আমার কোন্ পাপে কোন্ অপরাধে এমন হ'ল? আমি যতবার গড়তে গেলাম—ততবার—প্রভু আমার—। কথা সে শেষ করিতে পারিল না। হু-হু করিয়া চোখের জল ঝরিয়া তাহার মুখ ভাসাইয়া দিল। নিঃশব্দ কান্না। খুনী ফাঁসীর আসামীর মায়ের মত লজ্জায় তাহার কণ্ঠরুদ্ধ কিন্তু চোখের জল অজস্রধারায় বহিয়া যাইতেছে।

বাবাজী বলিলেন—ব্রজর গড়ার কথা ধরিয়াই বলিলেন—ভাঙা আর গড়া, গড়া আর ভাঙা—এই তো তাঁর লীলা ব্রজ! সোনার কলস দেওয়া শ্রীমন্দির—

—না। সবেগে ব্রজ মাথা নাড়িল।—না—সে আশা আমি অনেক-দিন ছেড়েছি। আপনার কাছে পড়তে দিলাম, ও আপনার চরণ ছেড়ে দিয়ে—মানগোবিন্দপুরের বাজারের পথে কুড়িয়ে বেড়ালে—সুধার বদলে গরল, বৈষ্ণবের মতি ওর হল না, ও শেষ পর্য্যন্ত মটরের চাকরী নিলে। আমি তাতেও কিছু বলি নি। আমার ভাঙা মন্দির আর গড়তে চাইনি প্রভু। চেয়েছিলাম—ওই ভাঙা দেওয়ালের উপরেই পাতার ছাউনি করে বসতের একটু আশ্রয়। তাতেও গোবিন্দ আগুন ধরিয়ে দিলেন। দুলাল শেষে মদ খেতে ধরলে প্রভু!

নরোত্তম দাস বাবাজী বিষণ্ণ দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কি বলিবেন? দুলালকেই বা কি দোষ দিবেন? তাঁহার বিচারে দুলালের দোষ নাই।

প্রথম প্রথম সে বাবাজীর আশ্রমে আসিয়া পরমানন্দে
মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া ফিরিত। নির্জ্জন মন্দিরের আবেষ্টনীর ম
কোন পাখী ডাকিল তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিত। হাতে থাকিত
গাছে গাছে ঢেলা মারিয়া পাখীটাকে উড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা ক
প্রজাপতি ফড়িংয়ের পিছনে পিছনে সন্তর্পণে অনুসরণ করিত। ফু
তুলিত—ছিঁড়িত। মন্দিরের দেবতার বেশ-পরিবর্ত্তন দেখিত। বাবাজীর
কাছে পড়িতে বসিত, গল্প শুনিত। মায়ের আখড়া গ্রাম, বাগ্‌দীদের
গ্রাম পার হইয়া এখানে আসিয়া অনেক কিছু পাইয়াছে, মনে হইয়া-
ছিল। এখান হইতে মধ্যে মধ্যে এই বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামখানির ভিতর ঢুকিত
কিন্তু ভয় লাগিত। প্রথম যে দিন সে একা আখড়া হইতে বাহির
হইয়া এখানকার বাজারের দিকে গিয়াছিল, সে দিন হাঁ করিয়া চারি
পাশ দেখিয়া চলিতে গিয়া একটা গরুর গাড়ীর সামনে পড়িয়া প্রচণ্ড
ধমকে চমকিয়া উঠিয়াছিল; ছুটিয়া সে আখড়ায় ফিরিয়া আসিয়াছিল।
ক্রমে ক্রমে তাহার সাহস বাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সে যেন ডাক শুনিল।
বিচিত্র বিস্তৃত পৃথিবীর ডাক। মস্ত বাজার, সপ্তাহে দু'দিন হাট, ইস্কুল,
ডাকঘর—এ সবের চারি পাশে মানুষ ভিড় করিয়া দলে দলে আসিতেছে—
যাইতেছে। বাজারে কত জিনিষ—বর্ণে গঠনে চোখকে ডাক দেয়,
কত খাবার গন্ধে আকৃষ্ট করিয়া তাহাকে টানে। বৈকালে ইস্কুলের ছেলেরা
মাঠে ফুটবল খেলিতে যায়। সেখানে গিয়া খেলা দেখিয়া সে একেবারে
লোলুপ হইয়া উঠিল। নিত্য গিয়া সে বসিয়া থাকিত মাঠের ধারে।
খেলার বলটা বাহিরে গেলেই ছুটিয়া সেটাকে দুই হাতে তুলিয়া বুকে
ধরিয়া আনিয়া ছুড়িয়া দিত। ক্রমে পায়ে করিয়া মারিয়া দিতে সুরু
করিল। এখন সে দলের একজন খেলোয়াড় হইয়া উঠিয়াছে। অনেক
ছেলের চেয়েই তাহার পায়ের শট জোরালো। ওখান হইতেই এক

...াছিল জংসন ষ্টেশন—রেলগাড়ী দেখিয়া আসিয়াছে।
লাইনের উপর দিয়া ছুটিয়াছে। ওখানেই দেখিয়া আসিল
ওখানেই দেখিল টেলিগ্রাফের খুঁটি—কান পাতিয়া শব্দ
...ব্রল—গোঁ-গোঁ করিতেছে।

...আশ্চর্য পৃথিবী! ছুটিয়া চলিয়াছে, লোহার গাড়ী ছুটিতেছে, মোটর গাড়ী ছুটিয়াছে, তারে তারে খবর ছুটিয়াছে, মানুষও ছুটিয়াছে, দেহের শক্তিতে কুলাইতেছে না, তবু সে ছুটিতেছে—চোখে তাহার প্রখর দৃষ্টিতে দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা। প্রচণ্ড তাহাদের গতিবেগের আকর্ষণ। শান্ত মন্থরগতি একটি স্নিগ্ধ নীলাভ গ্রহের, একটি মণ্ডল হইতে একটি গ্রহ-পিণ্ড আর একটি প্রচণ্ড গতি-বেগে ঘূর্ণমান উজ্জ্বল লাল এক প্রদীপ্ত গ্রহমণ্ডলীর কাছে আসিয়া—তাহারই আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হইয়া উল্কাখণ্ডের মত ছুটিয়া চলিল তাহারই দিকে। এ আকর্ষণ বেগ সম্বরণ করার শক্তি তাহার কোথায়? সে কি করিবে?

শেষ আকর্ষণ ও শ্রেষ্ঠ বৈচিত্র্য লইয়া একদা এই গ্রামে আসি... মোটর বাস। এখান হইতে নিয়মিত যাতায়াত করিবে জংসন ষ্টেশন।

ব্রজদাসী বলিল—ও যদি ম'রে যেত, তবে বুকে শেলের আঘাত নি... চলে যেতাম আপনার পথে। আমি কি করব?

—আমি একটা কথা বলব ব্রজ? পারবে?

—পারব। বলুন। এ আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

—যে পথে যাত্রা করেছিলে, যে পথের মাঝখানে ওই ওকে জীব... দেবার জন্যে থেমে রয়েছ, সেই পথে বেরিয়ে পড় তুমি। তোমার কা... তো হয়ে গেছে। দুলাল তো এখন জোয়ান হয়ে উঠেছে।

ব্রজদাসী কথা বলিতে পারিল না, শুধু বাবাজীর মুখের দিকে চাহি... রহিল।

বাবাজী বলিলেন—অনেক দিন আগে ব্রজ, তুমি যে দিন প্রথম আমার আখড়ায় এসেছিলে—সে দিন একটা কথা তোমাকে বলেছিলাম, তুমি কথাটা শুনে তার আঁচ পেয়েছিলে কিন্তু অর্থ বুঝতে পারনি। একটু চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করেছিলে—কি বললেন প্রভু! আমি কথাটার উত্তর দিই নি। অন্য কথা পেড়েছিলাম। তুমিও ভুলে গিয়েছিলে। তোমার মনে নাই, আমার মনে আছে। দুরন্ত দামাল ছেলেটি তোমার কোলে থাকতে চাইছিল না, তুমিও ছেড়ে দিচ্ছিলে না, অবশেষে আমিও বললাম—তুমিও ছেড়ে দিলে—ও মনের আনন্দে আখড়ার নাটমন্দিরময় ছুটোছুটি সুরু করে দিলে। আমি বলেছিলাম—এই তো সুরু। ফল কি গাছের বোঁটার বাঁধনে চিরদিন বাঁধা থাকে। গাছের যত বেদনাই হোক, সে খসবে—সে মাটির বুকে গাছ হয়ে মাথা তুলবে—ফুল ফলাবে—ফল ধরাবে। এই নিয়ম।

তত্ত্ব কথায় ব্রজদাসীর মন প্রবোধ মানিল না। সে বিষণ্ণ অপ্রসন্ন মন লইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

—ব্রজ!

ব্রজ এবার বলিল—ও যে মদ ধরলে!

—ধরুক। ওর পথ এখন ওর চোখে, তোমার দেখানো পথে তো চলবে না। এই তো তোমার কথাই ধর না, তুমি যে দিন প্রভুর আশ্রয়ে যাবার জন্যে পথে বেরিয়ে—ওকে পেলে—সে দিন ওকে কোলে নিয়ে আবার উল্টো মুখে পথ হাঁটতে সুরু করলে—সে দিন তো রতন পাগল তোমাকে বলেছিল—ও যাক—ওর ভাগ্যে যা আছে হবে—তুমি চলে যাও নিজের পথে। তুমি তা' যাও নি। গেলে ভাল করতে দুলালও আজ তাই করেছে ব্রজ।—তোমাকে আমি ভালই বলছি তুমি চলে যাও। তোমার ডাক এসেছে।

ব্রজ হঠাৎ উঠিয়া বলিল—আমি আজ যাই। গোপালের আমার আরতি আছে।

সে চোখ মুছিল, মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিল, বলিল—পাপীর মন প্রভু, হতভাগার কথাই শুধু চিন্তাই করছি, আমার গোপাল যে ঘরে বন্ধ রয়েছেন—সে কথা মনেই নাই। যাক—হতভাগা আপন পথে, আমার গোপাল আছেন।

পিছন হইতে বাবাজী ডাকিলেন—শোন ব্রজ।

ব্রজ ফিরিল।

বাবাজী বলিলেন—বস'। বাবাজীর মুখ দেখিয়া ব্রজ বিস্ময়ে শঙ্কায় অভিভূত হইয়া গেল। বাবাজীর চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছে, আত্মসম্বরণের চেষ্টায় তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন

ব্রজ পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল, কথা বলিতে পারিল না, বসিবার সামর্থ্যও হইল না।

হাতের আঙুল নাড়িয়া ইসারায় বাবাজী বলিলেন—বস।

ব্রজ বসিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পর বাবাজী বলিলেন—আমার অপরাধের কথা তোমায় বলব বলে ডাকলাম! বস!

ব্রজ আক্ষেপ করিয়া হাসিয়া মনে মনেই বলিল—আপনার অপরাধ! সে আর কতবার শুনব! প্রায়ই বাবাজী বলেন—শিক্ষার দোষ আমার, আমি ঠিক দিতে পারলাম না বলে ও নিলে না।

বাবাজী বলিলেন—তোমার কাছে আমার অনেক ঋণ, অনেক অপরাধ। দুলাল মহেশের সন্তান নয়, ও আমার পাপ!

ব্রজদাসী চমকিয়া উঠিল—শব্দহীন কণ্ঠে প্রশ্বাস দিয়া সে বলিয়া উঠিল—প্রভু!

—হ্যাঁ ব্রজ! ও আমার পাপ। মহেশ ওর মাকে দেখে পাগল হয়ে উঠেছিল, তাকে ঘরে এনেছিল। কিন্তু ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করতে পারে নি। মনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আমার কাছে এসে পড়ল—বললে—আপনি আমার গুরু—আমাকে রক্ষা করুন, ত্রাণ করুন। আমি তাকে পরিত্রাণ করতে মেয়েটিকে আশ্রয় দিলাম—এই আখড়ায়। মানুষকে পরিত্রাণ করা সহজ নয় ব্রজ; পরকে মুক্ত করতে গিয়ে নিজেকে বন্দী হতে হয়, পরকে ঠেলে তুলতে নিজেকে নীচে নামতে হয়। আমি পড়লাম, আমি—।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া—ও যখন তার দেহের মধ্যে এল—তখন তার আনন্দ দেখে আমি ওকে নষ্ট করতে পারি নি। নইলে—। অনেক যত্নে তাকে লুকিয়ে রাখলাম, ভাবলাম—সন্তান কোলে এলে—ওকে দূরে দূরান্তরে সরিয়ে দেব। কিন্তু প্রসব করেই সে মারা গেল। অনেক ভাবলাম, অবশেষে মহেশকে ডেকে বললাম—তুমি আমায় ত্রাণ কর। ওকে শ্মশানে ত্যাগ ক'রে এস। মহেশ বলেছিল—শ্মশানে? বলুন কাউকে দিয়ে আমি পালন করাই। আমি বলেছিলাম—না। পাপের দহন অন্তরে-অন্তরে সহ্য করা যায় ব্রজ কিন্তু মূর্ত্তি ধরে পাপ এসে সামনে দাঁড়ালে তাকে সহ্য করা যায় না। মহেশ মাথা হেঁট ক'রে ওকে নিয়ে গেল। পরদিন ওর মায়ের সমাধি দিলাম এই আখড়ায়; ওকেও এইখানে সমাধি দিলেই ভাল হত। কিন্তু জীবন্ত শিশু—বৈষ্ণবের আখড়া—তা পারি নি। ওর মায়ের সমাধি শেষ হয়েছে—এমন সময় মহেশ এল—বললে—শ্মশানে কোল পেতে বসেছিলেন মা-যশোদা। আমার কলঙ্ক মাথায় নিয়ে মহেশ ওকে তোমার কোলে তুলে দিলে।

তোমার ওখানে গিয়েছিলাম—তোমার গান শুনতে নয়, তোমাকে ভুল। দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম—তোমার পুণ্যে—

আমার পাপ মুক্তি পাবে। তাই মনের বাসনা সম্বরণ করেছিলাম প্রাণপণে। নইলে সেদিন সাধ হয়েছিল—তোমার হাত ধ'রে বলি—বৈষ্ণবী ওকে যখন কোলেই নিয়েছ—তখন—আমারও হাত ধর, এস আমরা ঘর বাঁধি। আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—এই জন্যেই যখনই তুমি বলেছ—আপনার এখানে আমায় আশ্রয় দিন—আমি বলেছি—না।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল—দুজনের কাহারও খেয়াল ছিল না। হঠাৎ কল কল করিয়া পাখী ডাকিয়া উঠিতেই দুজনেরই চমক ভাঙিল। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, চারিদিক হইতে গোল হইয়া অন্ধকার তাহাদের দুজনের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। বাবাজী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আমার কারণে তুমি কষ্ট পেলে—সেইটেই আমার আক্ষেপ—সেই আমার দেনা। নইলে—।

হাসিয়া বাবাজী বলিলেন—নইলে এ কষ্ট পেতেই হয়। আমার নিজের ছেলেকে দেখেছ তো। স্বদেশী ক'রে জেল খাটে;—তোমার দুলাল সেখানে যায়—শোভা দিদির কাছে। সে আমার কাছে সে দিন এসেছিল—এবার আবার না কি খুব বড় একটা স্বদেশী মাতন আসছে। আমার কাছে এসেছিল দেখা করতে। বলে গেল—। এবার নাকি গুলী-গোলা চলবে। তাতে যদি মারা যায় তবে দেখা হবে না। আমার যন্ত্রণা তোমার চেয়েও বেশী। অনেক ভেবে পরিত্রাণের পথ পেয়েছি। আমি চলে যাব, প্রভুর আশ্রমেই যাব। পরিত্রাণ যদি চাও তবে তুমি—

—আমার সঙ্গে যেতে বলব না। আমার যেতে দেরী হবে। তুমি দেরী কর না। মন যদি স্থির করতে পার, সঙ্গে সঙ্গে চলে এস, আমি তোমাকে টিকিট করে ট্রেনে তুলে দেব।

দশ

দুলাল প্রতিজ্ঞা করিল—সে আর ওই রাক্ষসীর কাছে ফিরিবে না। কিছুতেই না। তাহার গায়ে মদের গন্ধ পাইয়া সে তাহাকে কুষ্ঠ রোগীর মত দূরে ঠেলিয়া দিয়া ছুটিয়া গেল। রাস্তার উপর দুলাল লোকের হাতে লাঞ্ছিত হইল ওই রাক্ষসীর জন্য। কখনও আর সে ওই বৈরাগিনীর মুখ দেখিবে না। মা-হইয়াছে তো কি হইয়াছে? ওই মায়ের জন্য তাহাকে কত ইঙ্গিত সহ্য করিতে হয়। লোকে তাহার মুখের সম্মুখে বলিতে সাহস করে না আড়ালে বলে, অস্পষ্ট হইলেও কানে তাহার আসে। হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল; ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া ওই রাক্ষসীকে গিয়া ধরে, বলে—বল-বল আমাকে আমার বাবার নাম? বল কেন বাবাজীকে—জড়াইয়া—ওই মোড়লকে জড়াইয়া তোর নামে বাঁকা হাসি হাসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলে? বল্ কেন তুই আমাকে জন্ম মাত্র মারিয়া ফেলিস নাই?

কয়েক পা গিয়া—আবার থমকিয়া দাঁড়াইল। —থাক। তোর জন্য সহ্য করিয়াছি। সে লইয়া তোর উপর কোন রাগ নাই আমার কিন্তু তুই আমাকে মাথা মুড়াইয়া—কণ্ঠী পরাইয়া—বৈরাগী বানাইবি—কোথা হইতে একটা ভূতের মত মেয়ে আমার গলায় গাঁথিয়া দিবি—তাহা সে কোন মতেই সহ্য করিবে না। তাহার উপর তুই আজ বিনা অপরাধে আমাকে অস্পৃশ্যের মত ঘৃণা করিয়া পথের মাঝখানে ছুড়িয়া ফেলিয়া চলিয়া গেলি, যা—তুই তোর পথে চলিয়া যা, আমি আমার পথে যাইব।

পথ খুঁজতে গিয়া দুলালকে আবারও দাঁড়াইতে হইল।

বাঁশের আড্ডার পথটা সোজা চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ওই শিউচা আর ওই দেওকীর কার্য্য হাসিভরা কুৎসিৎ মুখ মনে পড়িয়া গেল। রঙ্গিকে মনে পড়িয়া গেল। রঙ্গি আসিবে তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে। না—সেও তাহার সহ্য হইবে না।

হঠাৎ সে বাঁ দিকের একটা পথ ধরিয়া হন হন করিয়া হাটিতে সুরু করিল। আসিয়া উঠিল রাধাচরণের চরখার আখড়ায়। চীৎকার করিয়া ডাকিল—শোভা দিদি।

শোভা দিদি বাহির হইয়া আসিলেন।—কে? এ কি—দুলাল? এ কি চেহারা তোমার?

দুলাল হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—আমাকে ধ'রে জোর করে মদ খাইয়ে দিলে।—ওই—শিউচা, ওই-দেওকী!

অবাক হইয়া গেলেন শোভা দিদি।

দুলাল অপন মনে অনর্গল বলিয়া গেল তাহার দুঃখের কথা। এক নিশ্বাসে সমস্ত কথা বলিয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল বলিল—আমাকে একটু ঠাঁই দাও শোভাদি। আমাকে যা বলবে তাই করব।

শোভা দিদি হাসিলেন—বলিলেন—না, তুমি বাড়ী যাও। তোমা: মা বড় দুঃখ পেয়েছেন বল তো!

দুলাল সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল।

—দুলাল!

—না। সে হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাত মুঠা করিয়া আস্ফাল করিয়া বলিল—হাস ব্রিজনন্দন, কোইকে পরোয়া নেহি করতা হ্যায় চলো মুসাফের—।

বাহির হইয়া সে চলিতে সুরু করিল কোথায় যাইবে ঠিক নাই কিন্তু ব্রিজনন্দন কাহারও তোয়াক্কা রাখে না। দুনিয়াতে কাহাকেও র

করে না, কিছুকেও ভয় করে না। আপন মনেই সে চাৎকার করিতে আরম্ভ করিল—বন্দেমাতরম, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, গান্ধীজী কি জয়, সুভাষবাবু কি জয়, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক ; আপ্-আপ্ ন্যাশানাল ফ্ল্যাগ মারোডাণ্ডা তোড়ো ছনিয়া ! শালা মার ডালো—। বনমে যায়ে গা—বাঘ মারে গা। হাতীকে দাঁত তোড়ে গা।

বনে যাইবে বাঘ মারিবে হাতীর দাঁত [illegible] যাইবে—রাজাকে মারিবে—উজীরকে মারিবে। নদীতে ডুবিয়া কুমীর সে মারিয়াছে। এমনি সব অর্থহীন চাৎকার করিতে করিতে পাগলের মতই সে চলিল। মানগোবিন্দপুর পার হইয়া চলিল সে। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। হোক। সারা রাত্রি পথ চলিবে। সদর রাস্তার পথ নয়। পদচিহ্ন হীন মাঠের প্রান্তরের পথে। যে পথে লোকের সঙ্গে দেখা হইবে না। কাহারো কোন প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে না। রক্তে যেন তাহার বান ডাকিয়াছে—মদের প্রভাব আর তাহার নাই, কিন্তু অদ্ভুত উত্তেজনা তাহার শিরায় শিরায় !

হঠাৎ সে একটা শব্দ শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

কে যেন কিসে প্রচণ্ড আঘাত করিতেছে।

ঠুই-ঠুই-ঠক্ ঠক্। ঠুই-ঠুই -ঠক্-ঠক্।

সামনে ঘন জঙ্গল।

দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া ছলাল্ ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।—কোথায় আসিয়াছে সে ? —এ তো—! এ—তো বাগ্দীপাড়ায় নদীর ধারের জঙ্গল—! এটা তো শ্মশানটা ! ওই তো সামনেই রতন পাগলার পাথর বুড়ীর আস্তানা।

অবিরাম শব্দ উঠিতেছে—ঠক্—ঠক্—ঠুই—ঠুই !

সে চীৎকার করিয়া উঠিল—কে রে ?

ওদিক হইতে রতন বুড়ার হুঙ্কার উঠিল—নিকাল ! নিকাল !

দুলাল আবার চীৎকার করিয়া বলিল—এও—পাগ্‌লা!

প্রচণ্ড জোরে আঘাতের শব্দ উঠিল—ঠক্—ঠক্—ঠুই—ঠুই। সঙ্গে সঙ্গে রতন হাঁক দিল—নিকাল। আভি নিকাল!

দুলাল রতনের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। বুড়া—শয়তান—! সকল আক্রোশ যেন তাহার উপর গিয়া পড়িল। অসুস্থ মস্তিষ্কে মুহূর্ত্তে তাহার অভিপ্রায় জাগিয়া উঠিল—রতন বুড়াকে, মহেশ মণ্ডলকে, আর ওই বাবাজীটাকে আজই রাত্রে মারিয়া সে ফেরার হইবে। তারপর দেশান্তরে বনে হোক—নগরে হোক—সে চলিয়া গিয়া বাস করিবে। বায়ুমণ্ডলে একটা ঘুষি চালাইয়া সে বলিল—যেখানে গিয়ে ডাণ্ডা গেড়ে বসব—সেইখানেই হম্ রাজ বনায়েগা। চলো মুসাফের! সে শ্মশান পার হইয়া আসিয়া উঠিল—রতন ক্ষ্যাপার পাথর বুড়ীর আশ্রমে!

সে অবাক হইয়া গেল।

অন্ধকারের মধ্যে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়াছে পাগল। সেই আগুনের লালচে আলোয় পাগলকে দেখাইতেছে প্রেতের মত; চোখ দুইটা কুঁচ ফলের মত লাল—তাহাতে এক বিচিত্র ভয়াল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, সর্ব্বদেহের পেশীগুলি দড়ির মত শক্ত এবং প্রকট হইয়া উঠিয়াছে; একটা হাতুড়ি লইয়া ওই পাথরটার উপর আঘাত করিয়া প্রকাণ্ড বড় পাথরটাকে ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। এখন সে কুড়ুল লইয়া আঘাত করিতেছে শিমুলগাছটার গোড়ায়—আর চীৎকার করিতেছে—নিকাল—নিকাল।

বাগ্দীপাড়ার লোকগুলি সভয় দৃষ্টিতে চাহিয়া সারিবদ্ধ মাটির পুতুলের দূরে দাঁড়াইয়া আছে। নিস্পন্দ নির্ব্বাক।

দুলাল ডাকিল—এই বুড়ো—! ও কি হচ্ছে?

রতন গর্জ্জন করিয়া উঠিল—ক্যা—ও! হাতের কুড়ালখানা ফেলিয়া দিয়া আগাইয়া আসিল—

—তুই এখানে কেন রে—বৈরেগীর বাচ্চা ?

—হচ্ছে কি ?

বাগ্দী বুড়ী ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—সরে আয় দুলাল, সরে আয়। আজ ওর মা জাগবে। পাথর ভেঙেছে মা বেরিয়ে গাছে লুকিয়েছে—গাছ কেটে মাকে বের করবে রে !

দুলাল—হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বুড়াও সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—এই ঠিক হয়েছে। তোকে বলিদান দিলেই মা জাগবে ! শ্মশানে বোষ্টুমী মায়ের কুড়ানো ছেলে—বুড়াও হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

* * * * * *

রাত্রির অন্ধকারে দুলাল আসিয়া আখড়ার উঠানে দাঁড়াইল। প্রেতের মত মুর্ত্তি হইয়াছে তাহার। চোখ দুইটা জ্বলিতেছে ! দাঁতে দাত ঘষিতেছে নিষ্ঠুর আক্রোশে !

ডাকিল—মা !

কেহ উত্তর দিল না।

আবার সে ডাকিল—মা !

কোন সাড়া পাইল না। সে এবার দরজায় ধাক্কা দিল। বন্ধ দরজার শিকল তালা-শব্দ করিয়া উঠিল। কোথায় গেল।

যেখানে যাক্, ফিরিবে তো ! দুলাল মায়ের প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল !

ব্রজদাসীর কাছে সে কৈফিয়ৎ চাহিতে আসিয়াছে। রতন পাগল তাহাকে বষ্টুমী মায়ের কুড়ানো ছেলে বলিয়াছে। শুনিয়া সে উন্মত্তের মত অতর্কিত বুড়াকে চাপিয়া ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া বুকে বসিয়া বলিয়াছিল—বল, কি বললি ?

বুড়া ভয় পায় নাই। বুড়া তাহাকে বলিয়াছে—মহেশের অজাত পুত্র সে। শ্মশানে তাহাকে ফেলিয়া দিয়াছিল—বৈষ্ণবী তাহাকে কুড়াইয়া লইয়া মানুষ করিয়াছে।

দুলাল স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে।

বুড়াকে ছাড়িয়া দিয়া সে পলাইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিল, পথ হইতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে ব্রজদাসীর কাছে। জিজ্ঞাসা করিবে—কথাটা সত্য কি না! সত্য যদি হয়—তবে কেন সে তাহাকে কুড়াইয়া লইয়াছিল! কেন—কেন?

—কে?

ব্রজদাসীর শঙ্কিত কণ্ঠস্বর। কতক্ষণ দুলালের খেয়াল ছিল না. স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ব্রজদাসী আবার প্রশ্ন করিল—দুলাল!

দুলাল যে তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিবে—এমনই একটা প্রত্যাশা লইয়া সে আখড়ায় প্রবেশ করিয়াছিল। সেও যে ফিরিতেছে ওই বাগ্দী পাড়া হইতে।

বাবাজীর ওখান হইতে ফিরিয়া সে বৃন্দাবনে যাইবার উদ্যোগই করিতেছিল।

মহেশকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া বলিয়াছিল—তুমি দেবতা! তোমাকে আমি অনেক কটু বলেছি আমাকে তুমি মাপ কর। বাবাজী আমাকে সব বলেছেন।

মহেশ বিষণ্ণ হাসিয়া বলিয়াছিল—আপনি আমার মহাপাতক ঘটালে মা-জী। আপনার প্রণাম নেবার মত লোক আমার চোখে দেখি

নাই। গুরুর কলঙ্ক মাথায় নিয়েছিলাম—তাতে আমি সুখ পেয়েছিলাম—মা-জী। তাকে আমি বড় ভালবাসতাম! তার সন্তান!

বৈচারী কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

ব্রজ বলিয়াছিল দুলালের ভার তা' হ'লে তোমার ওপর রইল।

—সে কি? আপনি—

—আমি বৃন্দাবনে যাব। কাল সকালেই। বাবাজী আদেশ করেছেন, আমারও মন উঠেছে।

হাত জোড় করিয়া মহেশ কি বলিতে গিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ব্রজ হাত দুটি জোড় করিয়া বলিয়াছিল।—কিছু বলবেন না; আমার আর সহ্য শক্তি নাই!

মাথা হেঁট করিয়া মহেশ চলিয়া গিয়াছিল। ব্রজ বসিয়াছিল—বৃন্দাবনে যাইবার আয়োজন করিতে। কি-ই বা আয়োজন! খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিল—পুরাতন ঝোলাটি। সে ঝোলাটির ভিতরের জিনিষগুলি তেমনি আছে। ওটি সে নাড়ে নাই। একবার ঝোলার মুখ খুলিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। দুই একটা পুরানো জিনিষ পাল্টাইয়া লওয়া, পুরাণো আয়নাখানা আজ ষোল বৎসরে অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছিল সেখানা বাহির করিয়া দিয়া—নূতন আয়না লওয়া, পুরানো তেলের শিশি পাল্টানো, তিলক মাটি পুরানো চন্দন কাঠ টুকরাটাও বদলাইতে হইল। দুইখানা নূতন কম্বল, একটা বালিশ—।

হঠাৎ কাহার পায়ের শব্দে সে চমকিয়া উঠিয়াছিল—কে?

মহেশ মণ্ডল হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিয়াছিল—মা-জী! রতন পাগলের না কি শেষ অবস্থা!

—সে কি?

—হ্যাঁ—আমি যাচ্ছি। যাবেন দেখতে!

—যাব। কিন্তু হঠাৎ কি হল?

—লোকে বলছে গাছ চাপা পড়েছে।

—গাছ চাপা!

—হ্যাঁ। বলছে—গাছ কেটে মাকে বের করতে গিয়েছিল—যাকে তো এস।

—চল।

—ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল ব্রজদাসী। যাইবার আগে রতনবাবার পায়ের ধূলা লইবার ইচ্ছাও তাহার ছিল।

রতন পাগল গাছ চাপা পড়িয়াছে। গাছ কাটিবার সময় দুলাল আসিয়া বাধা দিয়াছিল। দুলাল চলিয়া যাইবার পর—উঠিয়া কুড়ালখানা কুড়াইয়া লইয়া একবার তাহার পিছনে ছুটিবার উদ্যোগ [illegible] সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া—দ্বিগুণ উৎসাহে গাছে কোপ মারিয়া বলিয়াছিল—

—ছলনা—আমার সঙ্গে ছলনা। ওই বৈরোগীর বাচ্চাকে পাঠিয়ে আমাকে ভুলাবি? ওর পিছনে ছুটব আর তুই এদিকে পিটটান দিবি?

কয় দিন হইতে রতন উন্মাদ পাগল উঠিয়াছিল। এবার তাহার উন্মত্ততার ধারা অন্য রকম। অন্য-অন্য বারে সংসারের সকলকে কাটিবার ঝোঁক লইয়া হইত। এবার সে দিন কয়েক ওই মায়ের স্থানে আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া পড়িয়াছিল। খাওয়া-দাওয়া ছিল না। শুধু গাঁজা খাইয়াছে আর চীৎকার করিয়াছে! দু'দিন হইতে চীৎকার করিয়া গোটা আম বাগানময় ছুটিয়া বেড়াইয়াছে। সন্ধ্যায় হঠাৎ বাড়ী আসিয়া বলিয়াছিল—হাতুড়ি দেখি—হাতুড়ি!

হাতুড়ি হাতে করিয়া গোটা পাড়ায় ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিল—

আজ রাতে মাকে বার করব। খবরদার কেউ বাইরে বেরুবি না। খবরদার! খবরদার!

গাঢ় অন্ধকার-ভরা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রি। লোকগুলি জানালা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। ছেলেরা কাঁদিলে সভয়ে মুখ চাপা দিয়া বলিয়াছে—চুপ! ওদিকে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে জমাট অন্ধকারের একটা বিরাট স্তূপের মত ওই আম বাগানটার মধ্যে অনবরত সমান তালে দুইটা কঠিন বস্তু সংঘর্ষের শব্দ উঠিতেছে, ঠুই—ঠুই ঠুই—ঠুই!

মধ্যে মধ্যে রতন পাগলের হিংস্র চীৎকার উঠিতেছে—নিকাল! নিকাল!

কখনও কখনও চীৎকার করিতেছে—আ—ই।

হাতুড়ী মারিয়া সে যেন আঁধার ঘরের লোহার কপাটে হানা দিয়াছে।

কিছুক্ষণ পর শব্দ থামিল। পাগল ফিরিয়া আসিয়া কুড়াল লইয়া বাহির হইয়া গেল। চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল—আয় সব দেখবি আয়।

ফিরিয়া গিয়া আগুন জ্বালিল। আগুনে জঙ্গলটা আলো হইয়া উঠিল। পাড়ার লোক সভয়ে আসিয়া দূরে দাঁড়াইল—সারিবদ্ধ মাটির পুতুলের মত।

পাগল গাছ কাটিতেছিল হঠাৎ কুড়াল চালানো বন্ধ করিয়া বলিল—বেরিয়েছিল।

অর্থাৎ পাথরের মধ্যবর্তিনী তাহার ইষ্ট দেবী।

—বেরিয়েছিল। পাথরটা ভাঙলাম, বেরিয়ে ঢুকে গেল শিমূল গাছটার গোড়ায়। এইবার গাছটা কাটব। নইলে গেল কোথা? যাবে কোথা?

সাধারণ মানুষ এ প্রশ্নের উত্তর কি দিবে। পাগল গাছ কাটিতে সুরু করিয়াছিল।

দুলাল চলিয়া যাইবার পর সে দ্বিগুণ উৎসাহে গাছের উপর কুড়াল চালাইল। বারবার বলিল—বৈরেগীর বাচ্চাটাকে পাঠিয়ে আমাকে ছলনা!

দেখিতে দেখিতে মড়মড় শব্দ উঠিল।

পাগল গাছটা পড়িবার দিক ঠাওর করিতে ভুল করিল না, বিপরীত দিকেই সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—নিকাল! অব্ নিকাল!

মুহূর্ত্তে একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল—বড় গাছটা পড়িবার সময় আর একটা গাছের উপর পড়িল—সেই গাছটার একটা ডাল আছাড় মারিয়া পড়িল পাগলের উপর।

মুমূর্ষু অবস্থা—এখনও কিন্তু চীৎকার করিতেছে মধ্যে মধ্যে—নিকাল!

নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণার মধ্যেও রক্তাক্ত পিষ্ট বিকৃত মূর্ত্তি পাগল কঠোর মুষ্টি প্রসারণ করিয়া কিছু যেন আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিল। শেষ, হাতটা পড়িয়া গেল—বাঁকানো আঙুলের খোলা মুঠি মেলিয়া।

কে যেন বলিল—দে হাতে পাথর দিয়ে দে। বল—এই তোমার আপনার। এই নিয়ে যাও তুমি। ছেলে-পিলে যারা রইল—তাদের দিকে হাত বাড়িয়ো না। কিন্তু কেহই সে সাহস করিল না। ও মুঠির মধ্যে যাহাকে পাইবে—তাহাকে ছাড়াইয়া লইবার শক্তি বোধ করি যমেরও হইবে না। মরিলেও ও মুঠি খুলিবে না।

বৈষ্ণবী পাড়ার প্রান্ত হইতেই ফিরিলি। দেখিবার শক্তি হইল না তাহার। সে তাহরে বাপের চেয়ে বেশী স্নেহশীল ছিল। একদিন গরুড়ের মত পক্ষ মেলিয়া তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। বনবাসের মধ্যে আশ্রয় দিয়াছিল সেকালের মুনি-ঋষির মত। তাহার এ শেষ দশা দেখিবার মত শক্তি সে সংগ্রহ করিতে পারিল না।

বাগদী বুড়ী বলিল—ভাগ্যে দুলাল পালিয়েছিল মা। নইলে—তাকে

নিয়েই ও যেত। তাকে আর কুবাক্যি বলতে বাকী রাখে নাই? বললে মহেশের—ওই মোড়লের—। ছি—ছি—ছি—।

সব শুনিয়া ব্রজর মনে হইয়াছিল—সে আসিবে। সে হয় তো রতনের মতই আজ তাহাকে কাটিয়া—খুঁজিয়া দেখিবে তাহার মা-কে সে পায় কি না।

অন্ধকারে আখড়ায় ঢুকিয়াই দেখিল উঠানে প্রেতের মত দুলাল দাঁড়াইয়া আছে। তবু সে প্রশ্ন করিল—কে?

দুলাল এবার ফিরিয়া দাঁড়াইল—

—দুলাল?

চীৎকার করিয়া উঠিল দুলাল—কোথা গিয়েছিলি?

—রতনবাবুকে দেখতে।

আবার দুলাল চীৎকার করিয়া উঠিল—রতন পাগল আমাকে ও কথা বললে কেন? তুই আমার মা নোস?

ব্রজ ভাবিয়া পাইল না কি উত্তর দিবে। অন্ধকারের মধ্যেও দুলালের মুখ সে দেখিতে পাইতেছে। অন্ধকার যেটুকু অস্পষ্ট করিয়া রাখিয়াছে তাহার অন্তরের মমতার প্রদীপের আলোয় সেটুকু স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে; তাই বা কেন—ওই আলোতে শুধু দুলালের বাহিরটাই নয়—ভিতরটাও দেখিতে পাইতেছে। দুলালের চোখে আগুন জ্বলিতেছে—কিন্তু ব্রজ দেখিল—ওই আগুনের মধ্যে চোখের জলের পাথার ঢেউ তুলিয়াছে। দুলালের ওই কর্কশ রূঢ় চীৎকারের অন্তরালে বুক ফাটানো আর্ত্তনাদ প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সে কি করিয়া বলিবে? আজ তাহার সত্য বলাই উচিত। কাল সে যাত্রা সুরু করিবে; দীর্ঘকাল পূর্ব্বে পিছনে ফেলিয়া আসা পথের উদ্দেশ্যে সে চলিতে আরম্ভ করিবে—আজ সকল মিথ্যার ঘর পৃথিবীর সম্মুখে খুলিয়া দিয়া সব দায় চুকাইয়া

দেওয়াই উচিত। [illegible]—তাহার পরিচয়, সে যদি আজ বলে কেন তুই আমাকে কুড়াইয়া বাঁচাইয়াছিস ? তবে সে বলিবে—ওরে আমি যে বৈষ্ণবী, জাত আমার কাছে বড় নয়—জীব আমার কাছে সব চেয়ে বড়, তাই জাতি বিচার করি নাই, তাই আমার স্বর্গের পথে চলায় ছেদ টানিয়া তোকে শ্মশান হইতে কুড়াইয়া এত বড় করিয়াছি—তুই এখন যা—আপন পথে চলিয়া যা, আমার আজ মুক্তি। আমি আজ প্রভুর নাম লইয়া আমার পথে চলিলাম। আমি তোকে গর্ভে ধরি নাই, তবে প্রতারণা তোকে করি নাই, তোর মরা-মা বোধ হয় আমার বুকেই বাসা বাঁধিয়া আছে, বিশ্বাস না হয়—তুই আমাকে হত্যা কর ;—ওই রতনবুড়া পাথর ভাঙিয়া যেমন তাহার মাকে খুঁজিয়াছে—তেমনি করিয়া আমাকে খুন করিয়া দেখ—রতনের পাথরের মায়ের মত তোকে আমি ঠকাইব না, তুই তোর মাকে খুঁজিয়া পাইবি।

দুলাল আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—মা! বল!

ব্রজ এবারও উত্তর দিতে পারিল না। সে চোখে দেখিতে পাইতেছে দুলাল ছুটিয়া পলাইতেছে—অন্ধকারে প্রান্তরের মধ্য দিয়া—

—মা! তোর পায়ে পড়ি—বল বল্।

এবার মৃদুস্বরে ব্রজদাসী বলিল—কি বলব ?

—তুই আমার মা নোস ?

ব্রজ বলিতে গেল—না। কিন্তু অকস্মাৎ কি যেন একটা জমাট-বাঁধা বস্তু বুক হইতে উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিল—প্রাণান্তকর যন্ত্রণায় তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল, সে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

দুলাল তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—তুই কাঁদছিস ? তবে তুই—তুই—

ব্রজদাসী দুই হাতে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—তুই আমার ছেলে দুলাল,—আমি তোকে গর্ভে ধরেছি বাবা। দশ মাস দশ দিন—

দুলালের চোখের আগুনের অন্তরালে সত্যই জলের পাথার ছিল—আগুন নিভাইয়া সে পাথার এবার উথলিয়া উঠিল—বলিল তবে—তবে কেন খুড়ো—

—পাগল,—পাগলের কথা বাবা। নইলে পাথর ভেঙে—দেবতা বের করতে যায়!

—না-না, তুই মিছে কথা বলছিস। আমার জাত নাই। আমার মা, সে—

—আমি তোর মা।

ব্রজদাসীর চোখে এবার আলো জ্বলিয়া উঠিল যেন।

দুলাল বলিল—তুই অমন ক'রে তাকাচ্ছিস কেন?

—আয়, আমার সঙ্গে আয়।

—কোথায়?

—আয়। সে মন্দিরের দুয়ার খুলিল। প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিল। বলিল—শোন—এই আমার প্রভু সামনে, বল্ ওঁর সামনে তোকে যদি বলি—বিশ্বাস হবে তোর?

বিবর্ণ পাংশু হইয়া গেল দুলালের মুখ।

—শোন্—আমি তোর মা। আমার গর্ভে তোর জন্ম। পথে গাছতলায় তোকে আমি প্রসব করেছিলাম।

—আমার বাবা? লোকে পাঁচজনে গুজ-গুজ করে—

—আমার স্বামী তোর বাপ।

—সে তোর স্বামী?

—হ্যাঁ। স্বামী

—কে? কে আমার বাবা? ওই-ওই মোড়ল?

—গোবিন্দ! গোবিন্দ! না—না—

—তবে? ওই বাবাজী?

ব্রজ দুলালের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

—বল্?

ব্রজ বলিল, বলিল ঠিক নয়; বলিয়া ফেলিল, কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়াই বলিয়া ফেলিল—হ্যাঁ।

—তবে—। দুলাল কাঁদিয়া সারা হইয়া গেল।

ব্রজ বুঝিল। সে বলিল—আমরা দুজনে বৈষ্ণবের সাধন পথে মিলেছিলাম বাবা। তারপর সে পথে—ওই রতনের মত—আমাদেরও হ'ল পতন। তুই এলি আমার বুকে। লজ্জায়—আমি ওকে ছেড়ে পথে বেরিয়েছিলাম। তারপর।

মিথ্যার পর মিথ্যা জুড়িয়া সে বলিয়া গেল। সে মিথ্যাকে সত্য করিয়া তুলিবার ভার মন্দিরের দেবতার পায়ে সমর্পণ করিয়া মনে মনে বলিল—সকল সাজা তুমি আমাকে দিয়ো। দুলালকে এ নিষ্ঠুর সত্যের আঘাত দিতে আমি পারব না, পারব না, পারব না!

দুলাল—হঠাৎ উঠিয়া বলিল—আয় আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—বাবার কাছে।

ব্রজদাসী মন্দিরের দাওয়ার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। বলিল—আর আমি পারছি না দুলাল। আমাকে আজ তুই ক্ষমা কর, বাবা!

—তবে আমি চললাম।

—কোথায়?

—তার কাছে।

সে সেই অন্ধকার কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রেই বাহির হইয়া গেল। ভয় তাহার নাই। সে দুর্দ্দান্ত—প্রচণ্ড শক্তি তাহার দেহে—তাহার উপর প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাস তাহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল।

সমস্ত রাত্রি সে তেমনি ভাবে পড়িয়া রহিল। কোন প্রার্থনা জানাইল না। মন মস্তিষ্ক সব যেন পঙ্গু হইয়া গিয়াছে তাহার।

অমাবস্যার অন্ধকারের চেয়েও গাঢ় অন্ধকার চোখ বন্ধ করিয়া আপনার চারিপাশে সৃষ্টি করিতে পারে। সেই অন্ধকারের মধ্যে সে পড়িয়া রহিল।

পৃথিবী নিস্তব্ধ।

কতক্ষণ পর কে জানে! নিস্তব্ধ অন্ধকার পৃথিবীতে যেন প্রথম আলোকরেখার স্পর্শ লাগিল। ব্রজ অনুভব করিল, কে যেন তাহার কপালে স্পর্শ বুলাইয়া দিতেছে—মৃদু সে স্নেহ, সে স্পর্শ। হাতখানা কঠোর কর্কশ, কিন্তু সেই হাতেরও স্পর্শটুকু মধুর, পাছে কর্কশ হাতের রূঢ়তা আঘাত করে—তাই মৃদু স্পর্শে হাত বুলাইতেছে।

—মা!—দুলাল ফিরিয়াছে।

—বাবা!

—আমি মদ খাই নি মা। ওরা আমাকে জোর ক'রে—। ছোট ছেলের মত দুলাল কাঁদিতে সুরু করিল।

—কখনও খেয়ো না বাবা। বৈষ্ণবের ছেলে তুমি—। আমি কাল চ'লে যাব, তোমার নিজের ভাল মন্দ—

—চলে যাবি? কোথায়? চীৎকার করিয়া উঠিল দুলাল।

—আমি বৃন্দাবনে যাব বাবা।

—হ্যাঁ। স্বা না। দুলাল এবার উপুড় হইয়া মায়ের বুকের

—গুঁজিয়া পড়িল। আমি আর—আর—। সে কথা বলিতে পারিল

না—শুধু দীর্ঘ হাতখানা প্রসারিত করিয়া ব্রজদাসীর পায়ে ধরিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

—পা ছাড়, দুলাল।

না। এবার সে বলিল—তোর পায়ে হাত দিয়ে বলছি। তুই যা বলবি—আমি শুনব।

ব্রজ এবার উঠিয়া বসিল। দুলালের কপালে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল—গিয়েছিলি? দেখা হ'ল?

প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে দুলালের বিলম্ব হইল না। সে বলিল—না।

—কেন?

—না। পথ হ'তে ফিরে এলাম। একটু নীরব থাকিয়া দুলাল বলিল—না। তাকে আমার দরকার নাই। আমরা বেশ আছি। তুই যা বলবি আমি শুনব। শুধু—

—কি? বল্?

—বিয়ে আমি করব না। না।

—বেশ। ব্রজ হাসিল। ষোল বছরের দুলাল—তাহার মনে বিবাহের সাড়া আজও জাগে নাই।

(এগার)

ব্রজদাসী থাকিয়া গেল।

তাহার গোপালের আশ্রম—সত্য এবং প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল। দুলাল মস্তক মুণ্ডন করিয়া গলায় কণ্ঠী ধারণ করিয়া কপালে তিলক আঁকিল। ব্রজদাসীই তাহাকে বহির্বাস পরিতে দিল না, নহিলে সে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিল। ব্রজদাসী গোপালের গৃহদ্বারে লুটাইয়া পড়িয়া আনন্দে চোখের জলে গৃহদ্বারের সম্মুখটুকু মার্জ্জনা করিয়া দিল।

নরোত্তম দাস বাবাজী কিন্তু চলিয়া গেলেন।

বলিলেন—আমার ডাক এসেছে। আর থাকব না আমি।

ব্রজদাসীকে ডাকিয়া বলিলেন—মানগোবিন্দপুরের আখড়ার ভার তুমি নাও। তোমার দুলালকে তুমি দিয়ে যাবে।

ব্রজদাসী হাত জোড় করিয়া বলিল—না। আমি গোপালকে ছেড়ে যাব না। মানগোবিন্দপুরকে আমি ভয় করি।

বাবাজী বলিলেন—তবে মহেশকে ভার দিয়ে যাচ্ছি। দুলাল যদি—

—যদি? যদি কেন বলছেন?

—বলব না। দুলালকে সে-ই বুঝিয়ে দেবে। তুমি কিন্তু দুলালের শিগ্গীর বিয়ে দিয়ো।

হাসিয়া ব্রজ বলিল—বিয়ে ও করবে না এখন। সেইটুকু আমি শপথ করেছি ওর কাছে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বাবাজী বলিলেন—তুমি নিজের পথ ধরলেই ভাল করতে ব্রজ।

দুলালকে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—নীরবে, কোন কথা বলিলেন না, শুধু চোখ হইতে দু ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

দুলালও কোন কথা বলিল না।

ব্রজ শেষ ক্ষণটি মুখর করিয়া তুলিল, বলিল—চলুন আপনি এগিয়ে, আমরা মা-বেটায় যাব একবার শ্রীধামে, আপনার সঙ্গে যে বোঝাপড়া বাকী রইল, সে সেইখানে হবে। দেখবেন, দুলাল কেমন নিষ্ঠাবান হয়েছে।

বাবাজী হাসিলেন। বলিলেন—তোমার অসম্পূর্ণ সোনার কলস দেওয়া মন্দির এবার সম্পূর্ণ হোক।

সে মন্দির ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল। আর বোধ হয় সামান্য বাকী।

দুলাল, দুর্দ্দান্ত দুলাল পাল্টাইয়া যাইতেছে। ভোরে উঠিয়া স্নান করে, ফোঁটা তিলক কাটে, সে-ই ফুল তোলে; তাহার মা তাহাকে গৃহ মার্জ্জনা করিতে দেয় না। তাহার পর সে ফুলগাছগুলির পরিচর্য্যা করে। বৈষ্ণবী ভিক্ষায় বাহির হয়, দুলাল ঐটুকু পারে না।

বলে—না মা। ও পারব না। না। আমি—

সে যে কি বলিতে চায় বলে না, ব্রজদাসী তাহা বুঝিতেও চায় না। সে যতদিন আছে ততদিন কোন চিন্তা নাই। তাহার গান শুনিয়া লোকে দু হাত ভরিয়া দেয়, সে সেই দু হাতের ভিক্ষার এক হাতেরটুকু সঞ্চয় করিয়া যায়—দুলালের জন্যে।

দুপুরে দুলাল একা বসিয়া থাকে। আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। পায়ে শিকল বাঁধা বাজপাখীর মত আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে।

মধ্যে মধ্যে মেল ট্রেনের শব্দ আসে। কখনও কখনও মানগোবিন্দ-পুরের প্রান্তভাগের মজা দিঘীর ঘাটে মোটর বাসগুলাকে ধুইতে আনিয়া ইলেকট্রিক হর্ণ বাজায়—তাহার শব্দও সে শুনিতে পায়

সাধারণ গ্রামবাসীদের কাছে এ শব্দগুলো—শব্দবৈচিত্র্যের মধ্যে হারাইয়া যায়, তাহার কাছে এ শব্দ হারায় না।

সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, একটু নড়িয়া চড়িয়া বসে।

তাহার পরই বলে—ধু—র্। ভা—গ্!

মধ্যে মধ্যে শোভা দিদিকে মনে পড়ে। মনে মনে প্রণাম জানাইয়া বলে—তোমাকে প্রণাম—শত কোটী প্রণাম। তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছ। তোমার ছায়া আর আমি মাড়াব না। সে অস্থির হইয়া উঠে। শোভা দিদি! অকৃতজ্ঞ শোভা দিদি! বুকটা কখনও কখনও ফুলিয়া উঠে তাহার। আজও ফুলিয়া উঠিল।

—দুলাল!

ভিক্ষা হইতে মা ফিরিল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—গোবিন্দ! গোবিন্দ! তারপর উঠিয়া বাহিরের আগড় খুলিয়া দিয়া বলিল—আজ এত সকালে ফিরলে মা?

সে অবাক হইয়া গেল, ব্রজদাসীর সঙ্গে একটি বিধবা ও একটি কিশোরী। ভোলাদাসী ও তাঁহার কন্যা। মা বলিল—এঁরা আখড়া দেখতে এসেছিল। ব'স ভাই,—ব'স। এইটি আমার ছেলে।

—বাঃ, এ যে চমৎকার ছেলে গো! লোকে যে বলে কালো!

সত্য কথা—বৈষ্ণব হইয়া ব্রজদাসীর প্রত্যাশা মত একটি মিষ্ট শান্ত শ্রী দেখা দিয়াছে দুলালের সর্ব্বাঙ্গে। সে কালো—কিন্তু সে শান্ত স্নিগ্ধ।

দুলাল লজ্জিত হইয়া একটু হাসিল।

মেয়েটিও মুখ ফিরাইয়া হাসিল। বেশ মেয়েটি। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের মত ধূলিমলিন নয়, দীপ্তি আছে। তবে দুলালের চোখ এড়াইল না, এ দীপ্তি সূর্য্যের দেশের মেয়ের নয়। এ মেয়েকে—চাঁদের দেশের বলা চলে। দুলাল ছেলেবেলায় পড়িয়াছিল—চাঁদের নিজস্ব কোন দীপ্তি

নাই, সূর্য্যের আলো চাঁদের উপর পড়ে, তাহাতেই প্রতিফলিত হইয়া উঠে চাঁদের দীপ্তি। মেয়েটি নকল করিয়াছে। তবুও ভাল লাগিল।

দেখিয়া শুনিয়া অনেক পান চিবাইয়া ভোলাদাসী মেয়েকে লইয়া চলিয়া গেল। ব্রজদাসী বলিল—তোকে মেয়ে দেখাতে এনেছিল; আমি নিজে কিছু বলি নি বাবা। ওরা নিজেই এসেছিল।

দুলাল হাসিয়া বলিল—মেয়ে ভাল।

—বিয়ে করবি?

—দেখি ভেবে।

আকাশে মেঘ জমিয়াছে। বর্ষা নামিবার লক্ষণ চারিদিকে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। বৈশাখের প্রখর প্রদীপ্ত নয়, বর্ষার অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল ক্ষীণ। কিছুক্ষণ পর ঘন গম্ভীর গুরু-গুরু ধ্বনি আকাশ ছাইয়া বাজিয়া উঠিল। খালে ব্যাঙ ডাকিতেছে। অনেক ব্যাঙ এক সঙ্গে ডাকিতেছে। কোন ঝোপে বসিয়া বনকাক ডাকিতেছে—কুক্—কুক্—কুক্—কুক্। ছোট চাতক পাখীগুলা শূন্য-মণ্ডলে নাচিয়া নাচিয়া উড়িয়া যাইতেছে।

গুর-গুর-গুর-গুর-গুর-গুর ধ্বনির আর বিরাম নাই।

মেঘের ডাক নয়। এরোপ্লেন। একখানা এরোপ্লেন উড়িয়া বেড়াইতেছে। দুলালের মনে পড়িল যুদ্ধ চলিতেছে।

আখড়ায় বসিয়া সব হারাইয়া গিয়াছে। সন তারিখও হারাইয়া গিয়াছে। ইংরাজী বিয়াল্লিশ সাল এটা। মাসে শ্রাবণ। ইংরাজী কোন্ মাস সে জানে না।

প্লেনখানা চলিয়া গেল।

এরোপ্লেন লুঠ করিয়া বোমা ফেলিয়া ইংরাজের সঙ্গে লড়াইয়ের সা[illegible] ছিল এক সময়।

—গোবিন্দ! গোবিন্দ!

তারপর ডাকিল —মা!

—কি?

—কি করছ?

আজকাল দুলাল আর তুই-তুকারি করে না। ভাষাকে সে সংযত সংস্কৃত করিয়াছে।

—যাই।

—আসতে হবে না। তুমি কর বিয়ের সম্বন্ধ—

—করব?

হ্যাঁ, কর। বলিয়া দুলাল বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

আকাশের প্লেনটা যেন অনেকটা নীচে নামিয়া পড়িয়াছে—ওই—ওই—ওইখানে। ওই মাঠের ওপারে—ময়ূরাক্ষীর তীরের জঙ্গলের মাথায় ওই—ওই লাট খাইতেছে। হ্যাঁ, লাট খাইতেছে।

থাক। সে আর যাইবে না।

তাহার অন্তরের সমস্ত তৃষ্ণাকে সে অবরুদ্ধ করিয়াছে। ও বড় পাজী নেশা। দুনিয়াকে আর এক রকম করিয়া দেয়। ছুটিয়া চলে, স্থির মাটি। যে মাটি, ক্ষেত-খামার গাছ-পালা বুকে লইয়া শান্ত স্থির ধরিত্রী লাগাম-কষা, চাবুক-খাওয়া ঘোড়ার মত ছুটিয়া চলে, থামে না। বাসের পাশের ডাণ্ডা ধরিয়া এক হাত বাড়াইয়া পৃথিবীর মুখের লাগাম ধরিয়া সে অনেক ছুটাইয়াছে, নিজেও ছুটিয়াছে। আর না। মা যাহা চায় সে তাই করিবে। নইলে—সে—সেই বিরিজনন্দন ডাণ্ডা লইয়া বনে গিয়া বাঘ মারিয়া—হাতীর দাঁত উপড়াইয়া—বনকে ভয়শূন্য করিয়া বন কাটিয়া নগর গড়িতে পারিত। নগরে গিয়া রাজাকে মারিয়া কোতোয়ালকে বাঁধিয়া রাজকন্যাকে লুটিয়া লইয়া পলাইতে পারিত।

চল, বাড়ী ফিরিয়া চল।

জোর বাতাস উঠিয়াছে। বাতাস নয়, ঝড়। আকাশে কালো মেঘের পুঞ্জগুলা ফুলিয়া বড় হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত বেগে নৈর্ঋৎ কোণ হইতে অগ্নিকোণের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। বর্ষার ঝড়-বাতাসে মাথার লম্বা বাবরীচুলগুলা চোখে কপালে আছাড় খাইতেছে। রাত্রে নিশ্চয় মুষলধারে বর্ষা নামিবে। পাতা খড় উড়িয়া মুখে চোখে সর্ব্বাঙ্গে লাগিতেছে। খান কয়েক কাগজ আসিয়া তাহার বুকে আটকাইয়া গেল। বাতাসের বেগে যেন আঁটিয়া লাগিয়া গিয়াছে। হাত দিয়া ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিতে গিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

লাল হরফে মোটা অক্ষরে ছাপা কাগজ।

মাথায় লেখা—বিপ্লব—বিপ্লব—বিপ্লব।

আরও অনেক কথা। নীচে নাম রহিয়াছে শোভা সেন।

দুলাল থমকিয়া দাঁড়াইল। বুকখানার ভিতর মেঘের ডাকের প্রতিধ্বনি উঠিল। একটা বিপুল শক্তি প্রচণ্ড আলোড়নে যেন আবর্ত্তিত হইয়া উঠিল।

* * *

ব্রজদাসী চারিদিকে খুঁজিয়া অধীর হইয়া উঠিল। রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইয়াছে, দুলাল ফেরে নাই। সেই 'আসি' বলিয়া বাহির হইয়াছে। আকাশ ভাঙিয়া বর্ষণ সুরু হইয়াছে। কোথায় দুলাল?

কেহই কোন সন্ধান বলিতে পারে না।

এক প্রহর রাত্রে সংবাদ আনিল মহেশ মণ্ডল। মানগোবিন্দপুর হইতে সে ছুটিয়া আসিতেছে। বৃষ্টিতে ভিজিয়া সে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে।

দুলালকে সে মানগোবিন্দপুরে দেখিয়াছে। মাথার চুল উড়িতেছে,

চোখে আবার সেই আগের দৃষ্টি ফুটিয়াছে। শোভাকে পুলিশ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে—তাহারই প্রতিবাদে সভা হইতেছিল, সেই সভায় সে দুলালকে দেখিয়াছে। পুলিশ আসিয়া লাঠি মারিয়া সভা ভাঙিয়া দিয়াছে, কতক লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে, অনেক জনের মাথা ফাটিয়াছে। মহেশ দুলালকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল; তাহার হাত ধরিয়া, বলিয়াছিল—দুলাল!

মুহূর্তে হাতখানা হেঁচকা টানে ছাড়াইয়া লইয়া সে চীৎকার করিয়াছিল—এ্যা—র্ত।

তারপর তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া তাহাকে চিনিয়া ছুটিয়া পলাইয়াছে বলিয়াছে—নেহি যায়েঙ্গা—যাও।

ব্রজদাসী পাংশু বিবর্ণ মুখে মোড়লের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল যেন, আকাশে বাজ ডাকিয়া গেল যেন। প্রায় সম্পূর্ণ মন্দিরের উপরেই বোধ হয় বাজ পড়িল।

সারারাত্রি সে জাগিয়া বসিয়া রহিল। জানে, সে ফিরিবে না। তবু বসিয়া রহিল।

দিন ছয়েক পর—মহেশ আবার ছুটিয়া আসিল।

—এক দল এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। শুনছি, রেলের লাইন তুলে ফেলে দিচ্ছে। থানা পোড়াচ্ছে। পুলিশ এসেছে কলকাতা থেকে ট্রেন বোঝাই। কাল নাকি বোলপুরে গুলী চলেছে।

—গুলী?

—হ্যাঁ।

দুরন্ত দুর্দ্দান্ত দুলাল—মানুষের জীবনের সকল বন্যায় সে প্রথম ঢেউ—সেই তো সকলের আগে ছিল? ব্রজ মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—মরেছে? কিন্তু উত্তরের প্রতীক্ষা করিল না,

প্রয়োজন ছিল না, সে চোখে যে দেখিতে পাইতেছে—রক্তাক্ত ধূলি-ধূসরিত দুলাল অসুরের মত দেহ প্রসারিত করিয়া দিয়া পড়িয়া আছে। ব্রজ পাগলের মত ছুটিল। বোলপুর সে চেনে। অজয়ের তীরবর্ত্তী অঞ্চল সে দীর্ঘকাল পায়ে হাঁটিয়া ঘুরিয়াছে। কিছুক্ষণ পর সে শুনিল—দাঁড়া ব্রজ।

ব্রজ পিছন ফিরিয়া চাহিল না, সে বুঝিল—মহেশ মণ্ডলই আসিতেছে। ভালই হইয়াছে, সে দুলালের দেহ মণ্ডলকে ফিরাইয়া দিবে, বলিবে—নাও, আমি একদিন তোমার হাত থেকে নিয়েছিলাম। আমি ফিরিয়ে দিলাম। যা তুমি করতে চেয়েছিলে—তাই হয়েছিলে—তাই হয়েছে। সকল কলঙ্কের চিহ্ন তোমার মুছে গেল।

ট্রেন বন্ধ। পায়ে হাঁটিয়া ধূলি-ধূসরিত দেহ—লাল ধূলায় লালচে কাপড়, রুক্ষ চুল, চোখে প্রখর চঞ্চল দৃষ্টি লইয়া সে আসিয়া বোলপুর পৌঁছিল। সামনে যাহাকে পাইল তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল—বলতে পারেন প্রভু, কোথায়—কোন্ জায়গায়? হাঁপাইতে লাগিল সে।

—কি?

—গুলি করেছে?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে ব্রজর দিকে চাহিয়া বলিল—কেন? তোমার—

—আমার ছেলে। দুলাল। ব্রজদুলাল দাস।

—তোমার ছেলে? কিন্তু—

—কোথায় বাবা? কোন্ জায়গায় গেলে তার দেহখানা পাব?

—কি জানি? কিন্তু—কই—

—বলুন বাবা—বলুন।

লোকটি আর কথা বাড়াইল না—আঙুল দেখাইয়া বলিল—ষ্টেশনের ওখানে গুলী চলেছিল, কিন্তু কই—ব্রজদুলাল দাস—কই—? না—তো।

ব্রজ আর শুনিল না—ছুটিল।

লোকটি মিথ্যা বলে নাই—যাহারা মরিয়াছে তাহাদের মধ্যে ব্রজদুলাল দাস বলিয়া কেহ ছিল না। লোকে বলিল—থানায় বলিল—ডাক্তার বলিল। ব্রজ বিশ্বাস করিল না-কি কে জানে—কোন একজনের বুকের ঝরিয়া-পড়া রক্তে ভিজা মাটির পাশে বসিয়া রহিল।

*　　　　*　　　　*

মল্লারপুরের ওদিকে রেল-লাইন তুলিয়া দিয়াছে।

ব্রজ অন্ধকার রাত্রে কাহাকেও না-বলিয়া এক দিন মল্লারপুরের দিকে রওনা হইল। রামপুরহাটে অনেক লোককে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। ব্রজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

লোহার শিক দেওয়া খাঁচার মত ঘরের মধ্যে হাতে-পায়ে বেড়ীতে আবদ্ধ দুলাল পড়িয়া আছে—শিঙে-নাকে-গলায় বাঁধা মহিষের মত। লালচে চোখ মেলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে? ব্রজকে দেখিয়া কথা সে বলিবে না, একটু নিঃশব্দ হাসি ফুটিয়া উঠিবে মুখে—দু'ফোঁটা জলও গড়াইয়া পড়িবে চোখের কোণ হইতে।

এবার ব্রজর মায়ের মনের অনুমান মিথ্যা হইল না।

মল্লারপুর পৌঁছিয়া শুনিল—ব্রজদুলাল নয়, বিরিজনন্দন একজন আছে। ধরা পড়িয়াছে। অল্প বয়স—দুর্দ্দান্ত ছেলে—বুনো মহিষের মত গোঁ—তেমনি আকৃতি! ব্রজর সন্দেহ রহিল না।

—কি হবে?

—কে জানে? ফাঁসী—দ্বীপান্তর—যা খুসী ওদের। আবার বলছে—জেলের মধ্যে দাঁড় করিয়ে গুলী ক'রে মেরে দেবে।

ব্রজ আবার ছুটিল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, লোকে বারণ করিল—পৃথিবী আর সে পৃথিবী নাই, এ রাত্রে তুমি যেয়ো না। প্রচণ্ড বর্ষা—

বন্যায় দিগ্‌দিগন্তর ভাসিয়াছে। পথে নদী—দারকা—এখানে দারকাকে নদ বলে; বর্ষায় প্রচণ্ড স্রোত, সেই দারকার দুকূল পাথার।

ব্রজ মানিল না।

বর্ষণ সুরু হইল পথে। আকাশ-পৃথিবী একাকার হইয়া গেল—বৃষ্টির ধারায় ধারায় মেঘ ও মাটির মধ্যে শূন্যলোক পরিপূর্ণ করিয়া একসঙ্গে জুড়িয়া দিল। অন্ধকার—এমন অন্ধকার ব্রজদাসী কখনও দেখে নাই। ব্রজ তাহারই মধ্য দিয়া চলিল। বর্ষণ এক সময় থামিল। ব্রজ একটু জোরেই চলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু দারকা নদীর ঘাটে আসিয়া আটকাইয়া গেল। নদীর জল স্পষ্ট দেখা যায় না—শুধু একটা বিস্তীর্ণ শুভ্র আস্তরণ বিছানো রহিয়াছে বলিয়া মনে হইল—কিন্তু অন্ধকার রাত্রিতে হাসির মত, খল-খল কল-কল শব্দে বন্যা বহিয়া চলিয়াছে—সেখানে অস্পষ্ট কিছু নাই। খেয়া নাই। এপারে-ওপারে কোথাও একটি ক্ষীণ আলোকরশ্মিও দেখা যায় না, গ্রাম চেনা যায় না; ব্রজ তবু চীৎকার করিল—মাঝি—মাঝি!

তাহার কণ্ঠস্বর নদীর বুকে ছড়াইয়া পড়িল—ভাসিয়া চলিয়া গেল—কিন্তু সাড়া কেহ দিল না।

একা সে একটা গাছতলায় বসিয়া রহিল।

ভোর হইলে দেখিল— ঘাট কোথায়? সে একটা আঘাটায় বসিয়া আছে।

আরও খানিকটা ঘুরিয়া ঘাটে গিয়া দেখিল—খেয়া বন্ধ। সরকারী হুকুমে খেয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই মাত্র পুলিশ আসিয়া ওপারে বসিয়াছে।

রেলের পুল আছে। লোহার কড়ির উপর কাঠের স্লিপার পাতা পুল। সাহস থাকিলে সন্তর্পণে পার হওয়া যায়। ব্রজ ফিরিল—সেই পুলের উপর দিয়াই পার হইবে সে!

রেলের পুলের উপরেও পাহারা ! ইহারা পুলিশ নয়, গোরা পল্টন বন্দুক লইয়া পাহারা দিতেছে।

দূরে দূরে লোক জমিয়া আছে। বিচিত্র দৃষ্টিতে চাহিয়া এই পাহারা দেওয়াই দেখিতেছে। তাহারাই ব্রজকে আটকাইল।—যেয়ো না, গুলী ক'রে দেবে। ক্ষেপে গিয়েছে বেটারা। কাল রাত্রে জল-ঝড়ের মধ্যে জেল থেকে ছ'জন কয়েদী পালিয়েছে।

—জেল থেকে পালিয়েছে ?

—হাঁ। বাহাদুর ছোকরা সব !

—বিরিজনন্দন—

—সেও পালিয়েছে। হাতকড়ি খুলে—জানলার শিক বেঁকিয়ে—কাপড় বেঁধে—পাঁচিল টপকে—বাইরে লাফিয়ে পড়েছে। জন দু-তিন ডাকাত আর এরা তিন-চারজন।

*　　　*　　　*

ব্রজ দিনে ঘুমায়—রাত্রে ঘরে আলো জ্বালিয়া জানালা খুলিয়া দিয়া তাহারই পাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

নিজে কাটারী লইয়া জানালার সামনের কতকগুলি গাছের ডাল কাটিয়া দিয়াছে।

কাহাকেও সে এ কথা বলে নাই। বাবাজীকে না, মহেশকেও না। বলিতে তাহার সাহস নাই। শুধু বলিয়াছে—দেবতা গোপালকে বলিয়াছে—একটি রাত্রে একটি বারের জন্য তাহাকে এখানে আসিবার মতি দাও !

রাত্রে বসিয়া থাকে। খুট করিয়া শব্দ হইলে বাহির হইয়া চাপা-গলায় ডাকে, দুলাল !

সাড়া পায় না। তবু দাঁড়াইয়া থাকে। চারি পাশ ঘুরিয়া-ফিরিয়া

দেখে। তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘরে ফিরিয়া আপন মনে আপনাকে শুনাইয়াই বোধ হয় গায়—"মনে ছিল আশা—হ'লে বৃদ্ধ দশা—গোপাল পুষিবে শেষে।"

মাত্র ওই একটা কলিই গুন-গুন করে। গান তো সে গায় না, ওইটুকুই মনে পড়িয়া যায়—আপনিই বিলাপ-গুঞ্জনের মত বাহির হইয়া আসে।

মধ্যে মধ্যে মহেশের কাছে যায়। খবরের কাগজে দুলালের ফাঁসি বা দ্বীপান্তরের খবর উঠিয়াছে কি না জানতে যায়। থাকিলে মহেশ গোপন করিবে না—সে কথা সে জানে। করিতে পারিবে না। চোখ দিয়া তাহার বন্যা বহিয়া যাইবে।

মহেশ বলে—আর নিজেকে মিথ্যে মায়ায় জড়িয়ে রাখবেন না মা-জী। চ'লে যান। পথে বেরিয়ে—ছলনায় বাঁধা প'ড়ে আটকে রয়েছেন। আমি তার জন্যে দায়ী। আর না। অনেক দুঃখ ভোগ করলেন। এইবার সময় এসেছে, বেরিয়ে পড়ুন, চ'লে যান। গুরুদেবকে লিখেছিলাম, তিনি লিখেছেন—

ব্রজ বলে—যাব। তাই যাব। চিঠি শুনব না।

ব্রজ উদ্যোগ-আয়োজন করে। কিন্তু সে আয়োজন তার শেষ কোন দিন হয় না। বাঁধে আর খোলে। এটা লইতে ভুল হইয়াছে। আবার খোলে—ছি, এ-সবে তার প্রয়োজন কি? এত বড় পোঁটলা বহিয়া কি পথ চলা যায়!

নিজের ছলনা এক-এক সময়ে নিজেই ধরিয়া ফেলে, কিন্তু তাহাতে সে লজ্জিত হয় না। বলে—আমার যদি নিজের সন্তান হ'ত তবে কোন্ দিন—কোন্ দিন আমি চ'লে যেতাম। এ যে পরের! সেখানে গিয়ে যদি শুনি—পরের ব'লেই এটা তুমি পেরেছিলে, নিজের হ'লে কি পারতে?

শাস্তিকে তো ভয় করি না, অনেক শেকল-বেড়ি ব'য়ে বেড়াচ্ছি, এর চেয়ে আর কোন্ বড় শক্তিশেল ভগবানের আছে? শাস্তি নয়, লজ্জা; নিজের কাছেই যে-লজ্জায় ম'রে যায়। শুধু একটা সংবাদের প্রতীক্ষা!

সাত-আট মাস হইল দুলাল চলিয়া গিয়াছে। জেল হইতে পলাইয়া—আবার হয়তো কোথায় ধরা পড়িয়াছে। কিম্বা ঝড় আছে, ঝঞ্ঝা আছে, বন্যা আছে, বজ্রপাত আছে, রোগ আছে, জন্তু-জানোয়ার আছে, সাপ আছে—মৃত্যু তো বহুরূপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মানুষের চারি পাশে ঘিরিয়া পাকে-পাকে ফিরিতেছে, সে শুধু খোঁজে সুযোগ। দুলালের দুর্দ্দান্তপনা—দুরন্তপনার মধ্যে সুযোগ যে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুকে ডাকে!

শুধু সেই সংবাদটার প্রতীক্ষা সে করিয়া আছে। সংবাদ আসিলেই সে চলিয়া যাইবে। তাহার সকল আয়োজন এইখানে বসিয়াই করিতে আরম্ভ করিল। সে এক তপস্যা!

আর তাহার প্রতীক্ষার লাভ নাই। সে চলিয়াই যাইবে। প্রাণ-মন সমস্ত কিছুকে সে একত্রিত করিয়া দেবতার সেবায় ঢালিয়া দিল আখড়াকে সে উৎসব-মুখর করিয়া তুলিবার চেষ্টায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল সব মিথ্যা—তুমি সত্য। তুমি যখন রহিয়াছ—মূর্ত্তি ধরিয়া ব্রজর আখড়ার সিংহাসনে বসিয়াছ—তখন ব্রজর তো সব আছে। কিসের দুঃখ সে স্নান করিয়া পবিত্র বস্ত্র পরিয়া বাল্যভোগ সাজায়, মালা গাঁথিয়া পরায় গোপালকে, চন্দনের অলকাবিন্দু তিলক-রেখা আঁকিয়া দেয়—হাতে একটি নাড়ু তুলিয়া দেয়, মৃদুস্বরে গান গায়—

'একবার তেমনি-তেমনি-তেমনি ক'রে নাচ রে
চাঁদের কোণা!
চরণে চরণ দিয়ে—তেমনি ক'রে!

তোর মুরলী গড়ায়ে দিব যত লাগে সোনা,
নাচ রে চাঁদের কোণা!

এমনি একটি মুহূর্ত্তে সেদিন ভারী জুতার শব্দ করিয়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। একজন বিচিত্র পোষাকপরা লোক। সিপাহীর মত পোষাক। পিছনে এক পাল ছেলে—এক দল লোক।

দুলালের বন্ধু শিউচা। সে বলিল—ধেৎ—আমার নাম শিবদাস। আমি বাঙালী রে বাবা! শিউচা তো পুলিশের গুলী খেয়ে মরেছে। হা-হা করিয়া হাসে। সে বিচিত্র সংবাদ আনিয়াছে।

দুলালের বন্ধু। একসঙ্গে বাসে চাকরী করিত। একসঙ্গেই পলাইয়াছিল। বিচিত্র সংবাদ আনিয়াছে।

দুলাল যুদ্ধে চাকরী করিতেছে।

সে কি? তোমরা যে সব—লাইন তুলে—

হা-হা করিয়া হাসিয়া সে বলিল—পাগল সব। আস্ত পাগল। লাইন তুলতে কে গিয়েছিল—সে মা-গঙ্গা জানে—আমরা তিন জন যুদ্ধের চাকরীতে মোটা মাইনে ব'লে চ'লে গেলাম কলকাতা। সেখানে হ'ল না, চ'লে গেলাম পানাগড়। সেখানে চাকরী মিলে গেল। ডেরাইবিংয়ের পরীক্ষা নিলে—আরও শেখালে, লাইসেন্ ক'রে দিলে—ব্যাস্—বড় বড় গাড়ী নিয়ে চ'লে গেলাম। আমি বাড়ী এলাম ছুটি নিয়ে—কাঁধে বোমার টুকরো লেগেছিল। আবার যাব। দুলাল খুব গাড়ী চালাচ্ছে—সে-ই চাটগাঁয়ের ওধার—জঙ্গল-পাহাড়—সে দিকে আছে এখন।

কে একজন বলিল—আঃ, বাছা রে! কোন্ দিন কি হবে—কেউ খবরও পাবে না।

সে বলিল—সেটির জো নাই। দুলাল মায়ের নাম-ঠিকানা দিয়েছে

।মি আমারে দিয়েছি ; যে যার আপন লোকের ঠিকানা দিয়ে রেখেছে। কছু হ'লে রেজেষ্টারী চিঠি আসবে—কিছু দিয়ে গেলে, তা আসবে। রকার ডেকে ক্ষতিপূরণ দেবে—টাকা দেবে। সে সব পাবে। সৈ সব বন্দোবস্ত পাকা।

তার পর বলিল—তুলাল একটু কথা ব'লে দিয়েছে। তোমরা সব যাও বাপু! যাও—যাও। কারও সামনে আমি বলব না।—ব্যাগো! শেষে সে 'ব্যাগো' বলিয়া একটা হাঁক মারিয়া উঠিল। সকলে চমকিয়া উঠিয়া পলাইয়া গেল।

শিউচা হাসিয়া বলিল—ওদের ছামনে ঝুট বলতে হ'ল। আমার নাম শিউচা। নাম আমরা ভাঁড়িয়েছি তো! লাইন তুলতে আমরা গিয়েছিলাম। বিরিজনন্দন ভিজে গায়ে বাসের গ্যারেজে হাঁক মারলে মায়ী—সে কি বলব তোমাকে! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! মারো ডাণ্ডা। আরে বাপ রে! তারপর বললে—শিউচা, দে আমাকে একটা হাপপ্যাণ্ট আর একটা শার্ট, আর একটা চাদর। পাগড়ী বেঁধে ডাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে বললে—চল্। পহেলে লাইন উখাড় দেব, তারপর চল্—জেল তোড়কে ছিনিয়ে আনব শোভা দিদিকে। বেরিয়ে সে হয়ে গেল অন্য রকম কাণ্ড! ধরা পড়লাম, জেলে ভরলে, বিরিজনন্দন শলা ক'রে সাহস ক'রে জেল থেকে পালাবার ব্যবস্থা করলে। আরে বাপ রে! সে এক কাণ্ড! আজও দেখ না—গায়ের রোঁয়া সব খাড়া হয়ে উঠেছে!

তারপর হাসিয়া বলিল—নাম আমাদের কেউ জানত না। সব নাম ভাঁড়িয়েছিলাম। পুলিশ এখানে কোন খোঁজ-খবর করে নি?

ব্রজদাসীর কণ্ঠস্বর শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, দেহ মন পঙ্গু হইয়া গিয়াছে, সমস্ত আকাশ পৃথিবী যেন দোল খাইতেছে, সে চোখ বন্ধ করিয়া যেন তলাইয়া যাইতেছে গাঢ়তম অন্ধকারের মধ্যে।—ওরে দুরন্ত—ওরে দুর্দান্ত!

তবু তাহার আক্ষেপ—এ বুক হইতে তাহার রক্তকে ক্ষীর করিয়া তাঁহার বুক ভরিয়া দিতে পারি নাই। ওরে দুলাল, মাতৃস্তন্যবঞ্চিত ছেলে তুই—। চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইয়া পড়িল।

শিউচা আবার প্রশ্ন করিল—পুলিশ এসেছিল নাকি?

ব্রজদাসী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

সে বলিল—ঠিক হ্যায়। তার পর জেল থেকে পালিয়ে অনেক ঘুরে শেষে পানাগড়ে গিয়ে আসল নাম লিখিয়ে যুদ্ধের কাজ নিলাম।

ব্রজ এবার বলিল—সে কি বলেছে?

—বলে নাই কিছু। তবে আমি গোপনে খোঁজটা নিলাম। এ যদি প্রকাশ হয় তবে একেবারে গুলী ক'রে মেরে দেবে তো; তাই জন্যে। আচ্ছা, চললাম। যুদ্ধ শেষ হ'লেই আসবে সে। যদি—। হাসিয়া বলিল—তা হ'লে খবর পাবে। রেজেষ্টারী চিঠি আসবে, কিছু যদি দেয় সে—তাও পাবে। তুমি একটা মাদুলী দিয়েছিলে—সেটা সে ঠিক রেখেছে—বলেছে—তা যদি হয়, তবে মাদুলীটা পাঠিয়ে দিতে বলবে! আর সরকার যা দেয়—তা পাবে।

স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল ব্রজদাসী।

কিছু বলিয়া দেয় নাই দুলাল?

মাদুলীটা সে সযত্নে রাখিয়াছে?

সে যদি—। তাহা হইলে সেইটা ফেরত আসিবে?

দোল-পর্ব্ব চলিয়া গেল।

মহেশ আসিয়া বলিল—মা-জী—

—মোড়ল!

—কি ঠিক করলেন?

—ঠিক আর কি করব? আর ক'টা দিন দেখি। রেজেষ্টারী তে আসবে—

না। না। তা কেন? সে হয়তো ফিরেই আসবে।

—দেখি।

বৈষ্ণবী উঠিয়া চলিয়া যায় পোষ্ট-আপিসে।—আমার কি কোন রেজেষ্টারী আছে বাবা?

নাই।

দিন যায়—মাস যায়—বছর যায়—। যুদ্ধ হঠাৎ শেষ হইয়া গেল। রেজেষ্টারী আসিল না। দুলালের সঙ্গী শিউচা ফিরিল। বলিল—কলকাতায় এল। এসে বললে, যা তুই বাড়ী। আমি এখন যাব না। সে শোভা দিদির খোঁজ করছে। দুদিন তাকে রাস্তায় দেখেও ধরতে পারে নি। তা ছাড়া—আবার কোন নতুন হাঙ্গামাতে মাতব্বার ফিকিরে আছে সে। হাসিয়া বলিল—সে একটা হাল ফেশানের মেয়ে বিয়ে করবে। তারপর তার একটা না একটা হাঙ্গামা চাই-ই।

হা-হা করিয়া সে হাসিতে লাগিল।—সে হায় বিরিজনন্দন। মারে ডাণ্ডা দনাদন্। যাঁহা ডাণ্ডা গাড়তা হুই রাজ বানাতা! সে আসবে না।

এবার ব্রজ একদিন সব বন্ধন একটানে ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। নাকে রসকলি কাটিল—গলায় নূতন কণ্ঠী পরিল, গৈরিকে কাপড় ছোপাইয়া লইল, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইল, চূড়া করিয়া চুল বাঁধিল, হাতে খঞ্জনী লইয়া বাবাজীকে গোপালের ভার বুঝাইয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

দীর্ঘকাল পরে সে গান ধরিল—

কবে আমি ব্রজে যাব,
মাধুকরি মেগে খাব—
পথের ধূলায় ধূসর হয়ে—

এবার সে পথ হাঁটিবে না ট্রেনে চড়িয়া—চোখ মুদিয়া বসিবে। একেবারে বাংলা দেশ পার হইয়া সেই এক বড় জংসনে নামিবে—তাহার পর বৃন্দাবন।

শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দ গোবিন্দ নন্দ-নন্দন!

ষ্টেশনে আসিয়া সে গান আরম্ভ করিল। ভিক্ষা সুরু করিল।

আর সে সে-কালের সে নয়। বিরহিণী রূপসী বৈষ্ণবী নয়। আজ সে দুঃখিনী, দুলালের মা, প্রৌঢ়া ব্রজদাসী বৈষ্ণবী। কেহ আর আজ ইঙ্গিত করিল না, হাসিল না, রসিকতা করিবার চেষ্টা করিল না। আজ তাহাকে কেহ করিল শ্রদ্ধা—কেহ করিল স্নেহ—কেহ বলিল মা। কেহ বলিল মেয়ে। কিন্তু সকলেই তাহার গান শুনিয়া কাঁদিল।

গান শেষ করিয়া সে একজনকে বলিল—আমাকে একখানা টিকিট কেটে দেবেন বাবা?

—কোথাকার টিকিট? দাও।

খুঁট খুলিয়া সে এক মুঠা টাকা তাহার হাতে দিয়া বলিল—কলকাতার।

—কলকাতার তো এত টাকা কেন?

—ও! আমি বৃন্দাবনের ভাড়া খুঁটে বেঁধে রেখেছিলাম কি না। তাই দিয়েছি। কলকাতা হয়ে আমি বৃন্দাবন যাব বাবা, সেই টিকিট একখানি কেটে দাও।

লোকটি হাসিয়া বলিল—তা তো হয় না। কলকাতা পূবে, বৃন্দাবন পশ্চিমে। কলকাতা গেলে—সেখান থেকে আবার নতুন টিকিট কিনতে হবে। এখান থেকে কলকাতার যা ভাড়া—সেই ভাড়াটা আবার বেশী লাগবে।

ব্রজবাসী একটু ভাবিয়া বলিল—তবে কলকাতার টিকিটই কিনে দাও। কি করব।

কি করিবে সে? কলকাতা যে তাহাকে যাইতেই হইবে।

এই কিছুক্ষণ আগে একজন খবরের কাগজ পড়িয়া গল্প করিতেছিল—একজন এ-দেশী পল্টনের সিপাহী এবং একজন নিগ্রো সিপাহী—পরস্পরের মধ্যে গালি-গালাজ করিয়া ছুরি লইয়া মারামারি করিয়াছে। ঐ দেশী লোকটি নিগ্রো সিপাহীটিকে খুন করিয়া ফেলিয়াছে। আহত অবস্থায় দেশী সিপাইটিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ব্রজ জানে—এ তাহার দুরন্ত দুর্দ্দান্ত দুলাল ছাড়া আর কেহ নয়।

সে জানে—। টপ-টপ করিয়া চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতে লাগিল। সে জানে—এবার তাহার নিষ্কৃতি নাই। ফাঁসী কাঠে—সে তাহার পূর্ব্বে একবার তাহাকে দেখিবে। দুলালকে লইয়া কত কথা না সে ভাবিয়াছে, কত প্রশ্ন জাগিয়াছে—কতজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উত্তর সে সংগ্রহ করিয়াছে। ফাঁসীর পূর্ব্বে দরখাস্ত করিলে বাপ-স্ত্রী-পুত্র—ইহাদের দেখিতে অবশ্যই অনুমতি মিলিবে।

তাহাকে দেখিয়া—সকল খেদের সকল ভাবনার শেষ করিয়া সে এবার বৃন্দাবনের পথে রওনা হইবে। গিয়া তাঁহার চরণাশ্রয়ে গড়াইয়া পড়িয়া বলিবে—সব শেষ করিয়া আসিয়াছি। এইবার তুমি দয়া কর।

তাহার পূর্ব্বে দুলালকে একবার—

ট্রেনখানা দুরন্ত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল। ব্রজ জানালার বাহিরে মুখ বাহির করিয়া সকলের অগোচরে কাঁদিতে লাগিল।

ঝর-ঝর করিয়া সে জল পৃথিবীর বুকে পড়িতেছিল। পৃথিবী তৃপ্ত হইল—ধন্য হইল। পৃথিবী বলিল—আরও কাঁদ তুমি। তোমার সন্তানেরা তোমার কোল ছাড়িয়া ছুটিয়া চলে ভবিষ্যৎ-বধূর হাতছানিতে। প্রৌঢ়া তুমি,

অনুসরণ করিতে পার না, এমনি করিয়া চিরকাল কাঁদিয়া আসিয়াছ আজও কাঁদিতেছ; সেই অশ্রুর একটি বিন্দু সিন্ধু হইয়া আমাকে স্নান করায়; সেই স্নানে ওই দুরন্ত অস্ত্রাঘাতে ক্ষরিত আমার বুকে সকল রক্ত কলঙ্ক—সকল উত্তাপ মুছিয়া যায়, শীতল হয়! আমি তৃপ্ত হইলাম।

প্রতিটি অশ্রুবিন্দু মাটিতে পড়িবা মাত্র শুকাইয়া যাইতেছিল। দুরন্ত তৃষ্ণায় পৃথিবী পান করিতেছিল।

—শেষ—